2.5

সমন্বয়।

মধ্যভাগ।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ রায় (চৌধুরী) বি-এল্,
বিদ্যানিধি বেদান্তবিনোদ

প্রণীত

এবং

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বহরমপুর হইতে
প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

PRINTED BY DEB PROSAD MITRA,
At THE ELM PRESS,
63, BEADON STREET, CALCUTTA.

নিবেদন

সমন্বয়ের আদ্যভাগ দৃষ্টি করিয়া, বঙ্গদেশ ও বারাণসী ক্ষেত্রের যে সকল বিচক্ষণ পণ্ডিত গ্রন্থকারকে মূল্যবান্ উপাধি ভূষণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি গ্রন্থকারের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। উপাধি দাতৃগণ মধ্যে, কাশীধামের পণ্ডিত প্রবর শিবানন্দ তর্কপঞ্চানন মহোদয় গত ভাদ্র মাসে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তর্ক পঞ্চানন মহাশয় যে কেবল একজন প্রবীণ নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা নহে; অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তথাপি, তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান ছিলনা। তিনি নিরহঙ্কার ও অমায়িক ছিলেন এবং চরিত্রগত বিনয় ও সৌজন্যে সকলকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে কাশীধামের পণ্ডিতমণ্ডল একটী উজ্জলরত্ন বিচ্যুত হইয়াছে। পরলোকে যে তিনি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল কৃতবিদ্য সমালোচক সমন্বয় সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতাভাজন। সমন্বয়ের আদ্যভাগের ন্যায়, ইহার মধ্যভাগ বিদ্বজ্জনগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইলে, গ্রন্থকারের সকলশ্রম সার্থক হইবে। ইতি

বহরমপুর
৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৭

গ্রন্থকারস্য।

2.5

সমন্বয়।

পারিভাষিক নামা।

প্রথম অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাম ও বস্তু।

শারীরিক যে সমস্ত যন্ত্র দ্বারা বস্তুর গ্রহণ-বর্জ্জন নিষ্পন্ন হয়, তাহারা ইন্দ্রিয় পদবাচ্য। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয়ের প্রত্যেকেই, বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়া, কোনও না কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। শরীরে এরূপ কোনও অঙ্গ নাই, যাহা অনাবশ্যকীয় বা অব্যবহার্য্য বিবেচিত হইতে পারে। চক্ষু দ্বারা দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এজন্য চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয়; কর্ণদ্বারা শ্রবণ হয়, এজন্য কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয়; নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ লওয়া যায়, এজন্য নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়; জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা যায়, এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয়; এবং ত্বক্ দ্বারা স্পর্শবোধ হয়, এনিমিত্ত ত্বক্‌কে স্পর্শেন্দ্রিয় বলা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা যথা ক্রমে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শবোধ জন্মে বলিয়া, সাংখ্যকার প্রসিদ্ধ কপিল মুনি এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বক্ত্র বা মুখ দিয়া কথা কহিয়া থাকি, পাণি বা হস্ত দ্বারা দৈনিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করি; পদ দ্বারা ইতস্ততঃ গমনাগমন করি; পায়ু দ্বারা জীর্ণী ভূত ভুক্তদ্রব্যের অসারভাগ পরিত্যাগ করি; এবং উপস্থ দ্বারা গৃহীত তরল পদার্থের অনাবশ্যকীয় ভাগ বর্জ্জন করিয়া থাকি; এজন্য সাংখ্যকার, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, কথিত ইন্দ্রিয় নিচয় দ্বারা, আরও অনেক প্রকার শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইন্দ্রিয় দ্বারা শারীরিক কার্য্যাবলী সমাহিত হয় বলিয়া, হিন্দু দার্শনিকগণ ইহার 'করণ' সংজ্ঞান্তর প্রদান করিয়াছেন। উপস্থকে জননেন্দ্রিয়ও বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম বহিরবয়বে অবস্থিত বলিয়া, উহারা সকলেই বাহ্যেন্দ্রিয়। এতদ্ব্যতীত, কপিলাদি হিন্দু দার্শনিকগণ, মনঃকে ইন্দ্রিয় সংজ্ঞায়

আখ্যাত এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। এমন কি, মনঃ অন্তঃস্থিত বলিয়া, তাঁহারা উহার অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় নাম প্রদান করিয়াছেন।

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণ পরিণাম বিশেষান্নানাত্বং বাহ্য ভেদাশ্চ॥" ২৭॥ সাঙ্খ্যদর্শন।

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তৎকৃত সাঙ্খ্যদর্শন নামক গ্রন্থে, উপরোক্ত শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। "মনে ইন্দ্রিয় ধর্ম্মও আছে। সেইজন্য মন উভয়াত্মক। অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ও (বুদ্ধীন্দ্রিয়) বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া কার্য্য করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন সংকল্পক। [সংকল্প অর্থাৎ বিবেচনা করা মনেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, পরে মন তাহার বিশেষাকার নির্দ্ধারণ করে। সত্ব গুণের পরিণাম অনেক প্রকার। সেই কারণে কোনও এক বিশেষ পরিণামে কথিত প্রকার মনের জন্ম।] যেমন গুণত্রয় হইতে নানা বাহ্যিক (বাহ্য) বিকারের (পদার্থের) জন্ম, তেমনি গুণ ত্রয় হইতে আধ্যাত্মিক নানা পদার্থের ও জন্ম।" অধুনা বঙ্গ ভাষায় মনঃ শব্দ বিসর্গহীন লিখিত হইয়া থাকে। সুবিধাজন্য, এ পুস্তকেও ঐ পন্থা অবলম্বন করা যাইবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মনকে ইন্দ্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন না। তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মনে বস্তুবোধ হইয়া থাকে। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় নহে। যেমন কোনও জলাশয়ে জলাগম-নির্গম জন্য ভিন্ন ভিন্ন পয়োপ্রণালী থাকিলেও ঐ জলাশয়কে প্রণালী বলা যায় না, কিম্বা কোনও স্থানে যাতায়াত করিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকিলেও, ঐ স্থানকে পথ বলা যায়না, তেমনি মনোগৃহে ভাবাগমনিগম জন্য ইন্দ্রিয় রূপ দ্বার গবাক্ষনিচয় বিদ্যমান আছে বলিয়া, মনকে ইন্দ্রিয় বলা যায়না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় মনকে যাহা প্রদান করে, মন তাহাই গ্রহণ করে; তদতিরিক্ত কোনও বিষয় ধারণা করিতে পারে না। বাহ্য জগতের সংস্পর্শে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বোধ জন্মে, মনে তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। এজন্য ইন্দ্রিয়োপলব্ধ বস্তুর আধার ইন্দ্রিয় সাক্ষাতে বিদ্যমান না থাকিলেও ভাব-সংঘাত নিয়মে (By the Law of association of ideas) তাহার স্মৃতি মনে জাগরূক হইয়া উঠে। আমরা বেল টগরাদি পুষ্প, দুগ্ধ, চাখড়ি,

শ্বেতবস্ত্র প্রভৃতি অনেক শুভ্র পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি; এজন্য ঐ সকল দ্রব্য সমক্ষে না থাকিলেও 'শুভ্রত্ব' এই বস্তুর আলোচনায় ঐ সমস্ত পদার্থ আমাদের মানসে বা স্মৃতি-পটে উদিত হয়। যিনি কখনও টগর ফুল দেখেন নাই, শুভ্রত্বের ধারণায় টগরফুল আদৌ তাঁহার মনে উদিত হয় না। এইরূপে পূর্ব্ব-বর্ণিত যে কোনও ইন্দ্রিয় গৃহীত বস্তুর আধার ইন্দ্রিয় সমক্ষে না থাকিলেও, মনে তত্তৎ বস্তু অনুভব করা যায়। সাধারণ অভিজ্ঞতানুসারে, ঘণ্টাবাদিত না হইলেও তাহার শব্দ, গোলাব পুষ্প আঘ্রাণ না করিয়াও তাহার সুমিষ্ট গন্ধ, শর্করা না খাইয়াও তাহার আস্বাদন, অগ্নিস্পর্শ না করিয়াও তাহার স্পর্শবোধ আমরা মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারি। আবার, কোনও দ্রব্যের একটী লক্ষণা মনে হইবা মাত্র, তাহার যত কিছু লক্ষণা আছে, তৎসমস্তই যুগপৎ মানস পটে উদিত হয়। এমন কি, তৎসংশ্লিষ্ট স্থান ও অপরাপর দ্রব্যাদিও মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পদ্ম পুষ্পের বিষয় ভাবিতে গেলে, শুদ্ধ যে তাহার শ্বেত বা লোহিতাভ বর্ণ মনে পড়ে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকার, কোরক এবং স্ফুরণাবস্থা, দল বা পাপড়ি, মধ্যস্থ কোষ এবং বৃন্ত বা মৃণালাদির বিষয়ও মনে জাগ্রত হয়। পরন্তু যে স্থলে পদ্ম ফুল দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, তাহা এবং সেই স্থানের অন্যান্য দ্রব্যের স্মৃতিও উদ্দীপিতা হইয়া উঠে। একই নিয়মে, পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় গৃহীত দুই বা ততোধিক বস্তুর ভাব একত্রিত করিয়া, আমরা মনে মনে অনেক নূতন বস্তুর গঠন করিয়া থাকি। আমরা সুবর্ণ ও পর্ব্বত এতদুভয় পদার্থই দৃষ্টি গোচর করিয়াছি; এজন্য, সুবর্ণ পর্ব্বতের অস্তিত্ব না থাকিলেও, তাহা কল্পনায় আনিতে পারি। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন তত্ত্ব-মীমাংসায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানবের সুপ্তাবস্থায় অধিকাংশ স্থলে মন স্বল্পচেতন (Subconscious) থাকে, এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়োপলব্ধ বস্তু সকলের স্মৃতি মনে জাগরূক হয়। এইরূপ দুই বা ততোধিক স্মৃতি মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র স্বপ্ন পরম্পরা সৃজন করে। অতএব জাগ্রত বা নিদ্রিত যে অবস্থাই হউক, মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত কোনও বস্তুর ধারণা করিতে পারেনা। অথবা, মনের বস্তুবোধ সর্ব্বথা বাহ্যেন্দ্রিয়-সাহায্য-সাপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ পরোক্ষ।

মনের নিম্ন স্তর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিনা সংশ্রবে মনের নিম্নস্তরে কোনও ভাব সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু মনের উচ্চস্তরের কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণের যুক্তি ও মীমাংসা প্রযোজ্য হইতে পারে না। মন সম্পূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্ত হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে,তদগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম বিষয় সকল গ্রহণ বর্জ্জন করিয়া থাকে। যদিও বিনা অভ্যাসে এ বিষয় সম্যক্ অনুভূতি করিবার উপায় নাই, তথাপি মনের নিম্নস্তরের ক্রিয়া-কলাপ আলোচনায়, ইহা কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করা যায়। মনের নিম্নস্তরে, মনন, ইচ্ছা ও বোধ প্রভৃতি কার্য্যে মন যে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে, তাহা নহে ; পরন্তু স্বীয় বিকাশানুযায়ী ইন্দ্রিয়াগত বস্তুর গ্রহণ বর্জ্জন করে। একই বস্তু, একভাবে, কতিপয় ব্যক্তির বাহ্যেন্দ্রিয় সমক্ষে থাকিলেও, কেহ কেহ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এবং কেহ কেহ পারেন না। অধ্যাপক ছাত্রবৃন্দকে কোনও জটিল গণিত বা জ্যামিতি বা ব্যাকরণ তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। উহা কোনও কোনও ছাত্র সম্পূর্ণ বুঝিল ; কেহ কেহ কিছু কিছু বুঝিল ; আবার অপর কেহ কেহ আদৌ বুঝিল না। এ স্থলে যাহার বাহ্যেন্দ্রিয় যত প্রখর, আলোচ্য বস্তু সে যে তত অধিক পরিমাণে বোধগম্য করিতেছে, তাহা নহে। সুতরাং মনই তাহার স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে, প্রত্যক্ষ ভাবে, আলোচ্য বস্তু গ্রহণ বা বোধগম্য করিতেছে। দেশে কোনও প্রকার কিম্বদন্তী প্রচারিত হইলে, কেহ কেহ তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং কেহ কেহ ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিক বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেও বিচার বা বুদ্ধি-শক্তির পরিচালনা দ্বারা, মন প্রত্যক্ষ ভাবে, প্রচারিত বস্তুর গ্রহণ বা বর্জ্জন করে। শারীরিক সামর্থ্য থাকিলেও, দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিগণ বিপৎপাতে অধৈর্য্য হন ; আবার দৈহিক দৌর্ব্বল্য স্বত্বেও মনোবল-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধীরভাবে বিপদভার বহন করেন। অপরিপক্ক-বুদ্ধি মানব হর্ষ, বিষাদ বা কোনও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনায়, হঠাৎ উতলা হইয়া উঠে ; যাঁহাদের বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে, তাঁহারা সহসা কোনও বিষয়ে উত্তেজিত হন না। এ সমস্ত স্থলেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্ররোচনা ব্যতীত, মন স্বীয় রুচি অনুসারে বস্তুর গ্রহণ বা বর্জ্জন করিয়া তৎ কর্তৃক অভিভূত বা তাহা হইতে বিরত হয়। মনের আরও উচ্চস্তরের বিকাশ হইলে, তথায় সূক্ষ্মতর বিষয় সকল, প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞানগোচরিত হয়, অথবা বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত বস্তু সকল মনে প্রতিফলিত হয়। কোনও সূক্ষ্ম বিদ্যাতত্ত্ব নিরূপণ কল্পে, মনকে একাগ্র করিতে হইলে, তত্ত্বদর্শিগণ দর্শনশ্রবণাদি বহিরিন্দ্রিয় ক্রিয়ার নিরোধ করিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা সে সময়ে এরূপ চিন্তানিমগ্ন হন যে, বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া, অন্তর্জগতে নিবসতি

করিতে থাকেন, এরূপ প্রতীয়মান হয়। সে সময়ে, তাঁহাদের বাহ্যদেহ-বোধ লয় প্রাপ্ত হয়; আহার, নিদ্রা, বা পরিধেয় বস্ত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি কোনও বিষয়ে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন না; সমক্ষে আসিয়া কেহ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হয় না। বুদ্ধিগম্য বিষয়ের চিন্তায়, পণ্ডিতগণ যদি ক্ষণিক বাহ্যসংজ্ঞাহারাবস্থা প্রাপ্ত হন,তাহা হইলে, অব্যক্ত পরমতত্ত্বচিন্তায় প্রাচীন ঋষিগণ যে সুদীর্ঘকাল স্থূলদেহ-হারা হইয়া থাকিতেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে এবং তাহা অবিশ্বাস করিবারই বা হেতু কি? পুরাকালে মুনিগণ তপশ্চর্য্যাদ্বারা মনের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া, পবিত্র বিমল জ্ঞানলাভ করিতেন। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা অনুভব করা যায় না, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে মনে অনুভূতি করিতেন। সংসারে বহুদর্শী মানবগণ অপরের মন জানিতে পারেন, এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই প্রবাদ-বাক্য অমূলক নহে। সাংসারিক অভিজ্ঞতাবলে কাহারও মনো-বিকাশ হইলে, তিনি মন দ্বারা মানবচরিত্রের মূলানুধাবন করিতে পারেন। কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা যেমন স্বল্প পরিমাণে মনের বিকাশ সাধন করিতে পারে, তেমনি এই অভিজ্ঞতাজনিত অন্তর্দৃষ্টি, বহিরিন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূতা হই-লেও, স্বল্পদূর প্রসারিণী। ঋষিগণের ন্যায়, যাঁহাদের মনের সর্ব্বোচ্চস্তর বিকসিত হয়, তাঁহারা মনদ্বারা বিশ্বের সমস্ত বস্তুই দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। জীবের অন্তর ও বাহির এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনা-নিচয় সমভাবে তাঁহাদের মনে প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত কারণে হিন্দুদার্শনিকগণ মনকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মনকে প্রধানতঃ ক্রমোচ্চ তিনস্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা :—"মানস" "বুদ্ধি" এবং "চিত্ত"। এতদ্ব্যতীত,মহাত্মা কপিল 'অহঙ্কার' নামে মনের অপর একটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা বোধসৌকার্য্যার্থ, 'অহঙ্কার'কে মনের স্তর না বলিয়া, উহার শক্তি বলিয়া অভিহিত করিব। কেন না, মনের বিকাশ অনুসারে, অহঙ্কারের ভাবান্তর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ 'অহঙ্কার' শব্দে সাংসারিক মানবগণ 'গর্ব্ব' বা 'আপনাকে বড় জ্ঞান করা' এইরূপ অর্থবোধ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মলিন মানসে মানবের এইরূপ অহঙ্কার উদিত হয়। সংসারাবদ্ধ অন্ধ ব্যক্তি আপনাকে জগতের অপর সমস্ত দ্রব্য হইতে পৃথক্‌বোধ করিয়া, সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার কামনা করে। দার্শনিকগণ 'অহঙ্কার' শব্দের যে অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাহা কেবল বিমল মনে বা পবিত্র চিত্তে সমুদিত

হইয়া থাকে। নির্ম্মলচেতা ব্যক্তি আপনাকে জগৎ ও জগজ্জনকের সহিত একীভূত দেখিতে পান।

'মানস' মনের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তর। এই স্তরই বাসনার লীলাভূমি। বাঞ্ছা, কামনা ও কল্পনার তরঙ্গে মানস সমুদ্র সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। 'মানস' স্তরের উপরিভাগে 'বুদ্ধিস্তর'। কোন্ বাসনাকে কতদূর প্রসারিতা বা সঙ্কুচিতা করিতে হইবে, বুদ্ধিস্তর তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। বুদ্ধিস্তরই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। ফলতঃ বুদ্ধিস্তর বিকসিত না হইলে, জীব বাসনার স্রোতে ভাসিয়া যায়। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণ, মনের বুদ্ধিস্তর পর্য্যন্ত লইয়া, মানসিক ক্রিয়া কলাপের আলোচনা এবং মনোবিজ্ঞান, চরিত্র নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। সাধারণতঃ সাংসারিক মানবের সর্ব্বোচ্চ মনোবিকাশ বুদ্ধিস্তরের শেষসীমাতিক্রম করিতে পারেনা। হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখাদিবোধ, নানারূপ-চিন্তা শক্তির পরিচালনা, নূতন নূতন চিন্তার আবির্ভাব ও তিরোভাব, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, চাঞ্চল্য, বৈচিত্র্য, নৈপুণ্য, বিলাসিতা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, বিজয়বাসনা, সম্ভ্রম লাভেচ্ছা, যশোলিপ্সা, মানাপমানবোধ,গোপন বা প্রচারপরতা,স্থূল পদার্থের গুণাগুণ বিচার-পরতা প্রভৃতি ঐহিক প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই সাংসারিকগণ চরমবুদ্ধিমত্তা বিবেচনা করেন। খ্যাতনামা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,ভাষাবিদ্, বৈয়াকরণিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধি প্রভাবে এই দ্বিতীয়স্তরের উচ্চসীমা পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে সমর্থ হন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞানপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, কেবল সেই সমস্ত দার্শনিকগণ এই স্তরের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন।

বুদ্ধি স্তরের সীমালঙ্ঘন করিতে পারিলেই, প্রশান্তচিত্তস্তরে আগমন করা যায়। এই সর্ব্বোচ্চস্তর বিকসিত হইলে, মানবের বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানে পর্য্যবসিতা হয়। কিরূপে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য, ইন্দ্রিয় নিচয়ের প্রকৃত কার্য্য কি, জগৎ কি, এবং জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি, স্রষ্টার স্বরূপ কি, এবং স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির কিরূপ সম্বন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পূতবিষয় সকল হৃদ্‌গত করিয়া, মানব তখন বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। এই স্তর বিকাশের সহিত ক্রমশঃ একদিকে মানবের বাসনা লয় ও কর্ম্মক্ষয় হইতে থাকে এবং অন্য দিকে ঈশ্বরে অনুরাগ, ভক্তি, ভাব ও মহাভাব বা প্রেম সমুদিত হয়। পরিশেষে চিত্তের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, মানব ঈশ্বরে লীন হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। এই স্তর আয়ত্ত করিতে পারিলে, বিশ্বের কোনও রহস্য ইন্দ্রিয়াগোচর থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী স্তরের প্রত্যেকেরই অনুস্তর আছে। ক্রমনিম্নতানুসারে স্তর নিচয়ের অনুস্তর বাহুল্য প্রতীয়মান হয়। মানস স্তরে যত অনুস্তর আছে, বুদ্ধি স্তরের অনুস্তর সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অল্প। পরন্তু চিত্তস্তর কেবল মাত্র দুইভাগে বিভক্ত। বুদ্ধিস্তরের অনুস্তররাজীর বিকাশানুসারে মানব অল্পাধিক বুদ্ধিমান বিবেচিত হন। কিন্তু চিত্তস্তরের প্রথমার্দ্ধের বিকাশ মানবকে জ্ঞানী এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের বিকাশ মানবকে বিজ্ঞানী করিয়া তুলে। উপমাস্থলে মনকে আকাশ স্বরূপ কল্পনা করিলে, মানস-স্তরের অনুস্তর সকল উহার নক্ষত্রমালা বুদ্ধিস্তর চন্দ্র এবং চিত্তস্তর সূর্য্য স্বরূপ প্রতিভাত হয়। মানস স্তরের অসংখ্য নক্ষত্ররাজী স্বত্বেও মন আলোকিত হয় না। বুদ্ধি চন্দ্র সমুদিত হইলে মন কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত হয় বটে; কিন্তু সর্ব্ব স্থান স্পষ্ট রূপে বিভাসিত হয় না। চিত্ত সূর্য্য সম্যক্ উদিত হইলে; মনের অন্ধকার একবারে অপসারিত হইয়া যায়; মনের আর স্তর-ভেদ থাকে না; সমস্তই একাকার আলোকময় হইয়া উঠে।

স্থূল শরীর যেরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র, আকর বা শরীর, সেইরূপ মানস, বুদ্ধি এবং চিত্ত, এই তিনের ক্ষেত্র মন। অতএব, মানস-বুদ্ধি-চিত্ত ময় মন সূক্ষ্ম শরীর। যেমন দর্শন বা শ্রবণ যন্ত্রের অবয়ব চক্ষু বা কর্ণের চর্ম্মাকৃতি বিদ্যমান থাকিলেও অন্ধ বা বধির ব্যক্তি দেখিতে বা শুনিতে পায়না, সেই রূপ মনে বুদ্ধি ও চিত্তস্তর থাকা স্বত্তেও, তাহাদের উন্মেষ না হইলে, মনুষ্য বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী হইতে পারে না। বুদ্ধি ও চিত্ত সুপ্ত অবস্থায় মনোক্ষেত্রে বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগকে জাগরিত করিতে পারিলেই মনের বিকাশ হয়।

হিন্দু পণ্ডিতগণ রমণী সতীত্বের যে অবস্থা বর্ণন করেন, তদ্বারা সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের বিষয় সুস্পষ্টীকৃত হয়। সতীনারী কেবল যে বাহ্যাবয়ব দ্বারা কুভাবে পরপুরুষ স্পর্শ করেন না, তাহা নহে, পরন্তু স্বামী ব্যতীত পুরুষান্তর বিষয়িনী কুচিন্তা দ্বারা স্বীয় সূক্ষ্ম শরীরকেও পরপুরুষ স্পৃষ্ট হইতে দেননা।

সংক্ষেপতঃ, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইল। এক্ষণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা সাধারণতঃ তদগ্রাহ্য বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক। এরূপ অনেক দ্রব্য আছে, যাহা আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই বা যাহার অস্তিত্বের বিষয় আমরা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। পরে ঐ দ্রব্য দেখিয়া বা তদ্বিষয় বিদিত হইয়া, আমরা জানিতে পারি, উহার সত্বা আছে। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয় গৃহীত হইবার

পূর্ব্বেও ঐ দ্রব্য যেরূপ বর্ত্তমান ছিল, ইন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াও উহা সেইরূপ বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিষয়, নিউটনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, সাধারণে বিদিত ছিল না। কিন্তু ঐ আবিষ্কারের পর, এক্ষণে, আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি, বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয় গৃহীত না হইলেও, মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে বিদ্যমান আছে। নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইবার জন্য উহা তৎকালে সৃষ্ট হয় নাই। আবার আবিষ্কৃত এবং পরীক্ষিত বিষয় সকলও, ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সহিত, ক্রমশঃ, আমাদের বোধগম্য হয়। বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণ, উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় সকল বোধগম্য করিতে পারেনা; যদিও শিক্ষকগণ ঐ সকল বিষয় সম্পূর্ণ রূপে বিদিত আছেন এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবর্গ অধ্যয়ন দ্বারা উহা বিদিত হইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণ উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া এবং পরে পাঠ করিয়া, ঐ সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, বিষয় গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বা পরিণতির উপর নির্ভর করে। বস্তু ও বিষয় যেমন সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনই আছে; আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ শক্তি অনুসারে, আমরা কোনও বিষয় সরল, কোনও বিষয় জটিল, আবার কোনও কোনও বিষয় এককালীন ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিবেচনা করি।

সৃষ্টিরহস্য অলোচনা করিলে স্বতঃই মনে উদিত হয়, বস্তু বা বিষয় গ্রহণ নিমিত্ত যেমন ইন্দ্রিয়নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবার জন্যই যাবতীয় দ্রব্য সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবে বস্তু ও ইন্দ্রিয়ের সত্বা এবং তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-জাত কার্য্যাবলী দ্বারাই জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় অবগত হইতে পারি, অথবা, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রহণ জন্য ঐ সকল দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। যদিও আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ইন্দ্রিয়নিচয় সর্ব্বস্থলে সমভাবে বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না, তথাপি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবার জন্যই বস্তুময় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি যাহা গ্রহণ করিতে না পারি, আমা অপেক্ষা উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে, সাধারণ আমরা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র মাত্র। যাঁহারা জগৎ দেখিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ঈদৃশ শিক্ষকগণের উপদেশবাণী গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র যাঁহারা, তাঁহারাই বা জগতের কতদূর দেখিয়াছেন? জগতের কয়টা রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিয়াছেন? মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার জন্য, নিউ-

টন সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় আরও কত আকর্ষণ এবং আরও কত তত্ত্ব জগতে আছে, তাহা কয় জনে বলিতে পারেন? উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরাই বলিয়া থাকেন, কত কত তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-গৃহীত না হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা বলিতে পারি, সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হউক বা না হউক, যাহা আছে, তাহা বস্তু (বস্, বাসকরা + তু, সংজ্ঞার্থে, যে ইতস্ততঃ বাস করে)।

যে সকল বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অথবা স্থূল ভাবে আমরা যাহার অর্থবোধ কিম্বা ধারণা করিতে পারি, তাহা 'পদার্থ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দু দার্শনিক-গণ, শব্দ বা বস্তুর প্রতিপাদ্য পদার্থকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথাঃ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব। "দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং। সমবায় স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।" কোনও কোনও পণ্ডিত, স্থূলতঃ, ত্রিবিধ পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথাঃ—জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি। "জাত্যাকৃতি ব্যক্তয়স্তু পদার্থাঃ।" অধুনা, পদার্থ বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের অনেকে, বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলতর পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথাঃ—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্।

যাহা বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা স্বভাবতঃ অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। কেননা মন বোধশক্তির ক্ষেত্র, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে সকল বিষয় অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তৎসমস্তই বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে।

যে সকল বস্তু কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং সূক্ষ্ম ভাবে যাহাদের ভাব গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে 'বিষয়' বলা যায়। (বি—সি, বন্ধন করা + অ, যাহা ইন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয়কে বন্ধন করে)। যাঁহার মন যত বিষয়ের ধারণা করিতে পারে, তিনি তত মনস্বী। 'পরলোক' বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তথাপি, অকৃত্রিম হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ, অল্পাধিক পরিমাণে, 'পরলোক' বিষয় ধারণা করিতে পারেন।

যে সমস্ত বস্তুকে আমরা, সাধারণতঃ, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিবেচনা করি, তাহাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা, সুতরাং, অত্যন্ত দুরূহ। 'তাহারা তাহাই' এই অর্থে ঐ সকল বস্তুকে 'তত্ত্ব' বলা যায়। ফলতঃ, পুণ্যচেতা প্রাচীন ঋষিগণ সূক্ষ্মতম বিষয় নিচয়কে তত্ত্বাখ্যায় অভিহিত করিতেন। কিন্তু, আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, বস্তু মাত্রেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। বিজ্ঞানী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াগোচর কোনও বস্তু নাই।

উল্লিখিত প্রকারে ইন্দ্রিয় ও বস্তুর বিভাগ নিষ্পাদন এবং প্রত্যেক বিভাগের সীমানির্দ্দেশ ও সংজ্ঞা-নিরূপণ বিশুদ্ধ দার্শনিক বিধিসঙ্গত প্রতীয়মান হয়। পুরাকালে সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণ বিশ্বের সমস্ত বস্তু এবং তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিয়া, গুণ ধর্ম্ম লক্ষণানুসারে, তাহাদিগকে যথাতথ নাম চিহ্নিত করিতেন। ক্রমশঃ, চলিত ভাষায় স্থূলে সূক্ষ্মের স্বরূপ আরোপে, অথবা প্রতি-বিম্বে প্রকৃতের গুণাধ্যাসে, বস্তুর সংজ্ঞা বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি, তত্বজ্ঞ কপিল, সাধারণের হৃদ্গম্য করিবার জন্য, স্থূল বস্তুবোধে জ্ঞানের অর্থ সন্নিবেশ করিয়া, চক্ষুশ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। আত্মজ্ঞানীগণ, বোধ বা বুদ্ধি ও জ্ঞান এতদুভয়ের যে পার্থক্য ইঙ্গিত করেন, পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা, ঐহিক বস্তুর অবগতিকে বুদ্ধি বা বোধ, পরমতত্বের অবগতিকে জ্ঞান এবং পরম তত্বের বিশেষাবগমকে বিজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলিত বিদ্যায়, পণ্ডিতগণ, কলাবিদ্যাদি অঙ্গভূত স্থূল পদার্থের সম্যক্ বোধকে বিজ্ঞান আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ ঐশীভক্তি, পরম ভাব ও ভগবদ্ প্রেমের ছায়াবলম্বনে সাংসারিক ভাষায়, গুরুজনাসক্তি, পরস্পর মিলন বা সম্পৃক্ততা ও লৌকিক সুপ্রণয় যথাক্রমে ভক্তি, ভাব ও প্রেম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা সচরাচর, 'পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি,' 'রামের সহিত শ্যামের ভাব,' 'দাম্পত্য প্রেম' প্রভৃতি শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকি। অর্থসহ বাক্য সর্ব্বদা সম্পৃক্ত বলিয়া, চলিত ভাষায় 'অর্থ, মর্ম্ম বা তাৎপর্য্যার্থে ভাব শব্দের প্রয়োগ হয়। বিদ্যা চর্চ্চায়, প্রায়শঃ কঠিন বাক্যের ভাবার্থ লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়। চলিত ভাষায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্রকেই বিষয় বলিতে যেমন কোনও বাধা বিবেচিত হয় না, তেমনি, 'পদার্থ' 'বিষয়' ও 'তত্ব' এই শব্দত্রিতয় মধ্যে, পূর্ব্বোল্লিখিত দার্শনিক বিধি অনুযায়ী কোনও অর্থগত পার্থক্য অনুভূত হয় না। সাহিত্য ব্যাকরণাদি অন্তরিন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিদ্যা এবং বিত্ত, সম্পত্তি প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, সমস্তই বিষয় নামে অভিহিত হয়। আবার ধর্ম্ম যদিও ব্রহ্মাণ্ড-স্থিতিকাল-স্থায়ী, তথাপি অপরাপর বস্তুর তুলনায় ইহার দীর্ঘ-স্থায়িত্ব প্রদর্শনোদ্দেশ্যে, পণ্ডিতগণ ইহার সনাতন আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই নিয়মানুসারে, যদিও, বিকাশ মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিধায় স্থূল, তথাপি স্থূলত্বের তারতম্য প্রদর্শনার্থ উর্দ্ধতন বিকাশের "সূক্ষ্ম বিকাশ" সংজ্ঞা দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ভাষায় এক শব্দ বহুঅর্থে ব্যবহৃত হওয়া নিবন্ধন, পরিচ্ছন্ন দার্শনিক সংজ্ঞা নিরূপণ অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়াছে। অভিধান-

কারগণ, যেমন 'ভাব' শব্দের স্থিতি, ভূতি, আশয়, উৎপত্তি, চিত্ত, আত্মা, মনোবিকার, ক্রিয়া, বিলাস, শারীরিক-অবস্থা, পদার্থ, বস্তু, জগৎ, বাক্য, মর্ম্ম, উপদেশ, বিদ্বান্, পূজ্য প্রভৃতি অর্থ প্রদান করেন, সেইরূপ 'ধর্ম্ম' শব্দের পুণ্য, রীতি, ভাব, কর্ত্তব্য, গুণ, সৎকর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট, শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার ইত্যাদি অভিধা নির্ণয় করেন। যেখানে মৌলিক শব্দ তাহার অর্থনিচয় মধ্যে একাধিকের মিলিত শক্তি দ্যোতনা করে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ব্যবহার না করিয়া মৌলিক শব্দ প্রয়োগ, সুতরাং, সুখকর।

সীমাবদ্ধ ভাষার চলিতরীতি অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। সুতরাং, এ পুস্তকে দার্শনিক-সংজ্ঞা-বিশেষত্ব সম্যক্ রূপে রক্ষিত হয় নাই। প্রকৃত দার্শনিকগণ, যদিও জাতীয়ত্বের অতীত, তথাপি ভারতীয় দার্শনিকগণ হিন্দু জাতিভুক্ত আখ্যাত হন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'হিন্দু দার্শনিক' বলা হইয়াছে। আবার প্রসঙ্গ ক্রমে, ইহাতে সূক্ষ্ম বিকাশ, সমাজ-ধর্ম্ম, রাজ-ধর্ম্ম, সমর-ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দার্শনিক উপায়ে প্রত্যেক তথ্যের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক। বস্তুর যোগ বিয়োগে মনের স্তরত্রিতয়ে যে অনুভূতি উৎপন্না হয়, আমরা মানসিক স্তরের পর্য্যায়ানুযায়ী তাহার পাবিত্র্য বা পরিমাণ-ক্রম লক্ষ্য না করিয়া সাধারণতঃ, যোগজাতানুভূতির সুখ, আহ্লাদ, পুলক, আনন্দ, সম্পদ্, উপকার, হিত, মঙ্গল প্রভৃতি এবং বিয়োগজাতানুভূতির দুঃখ, সন্তাপ, বিষাদ, বিপদ, অনুপকার, অশুভ, অমঙ্গল ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করি। যোগজাতানুভূতি ভাবিকী (positive); বিয়োগজাতানুভূতি আভাবিকী (negative)। বস্তুতঃ,ভাবিকী ও আভাবিকী উভয়ানুভূতিই মানসিক স্তরের ক্রমনিম্নতানুসারে, অল্পা ও মলিনা হয়। জ্ঞানীগণ ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণ করিয়া যে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হন, পণ্ডিতগণ কোনও গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মীমাংসা বা আবিষ্কার করিয়া তদপেক্ষা অনেক অল্প ও স্থূল বা অপবিত্র আমোদ প্রাপ্ত হন। রম্যবস্তু দর্শন, স্বাদুদ্রব্য পান ভোজন, সুবাস গ্রহণ বা পরিচ্ছদাড়ম্বরাদি দ্বারা মানস স্তরে যে আহ্লাদ হয়, তাহা বৌধসুখ অপেক্ষাও হীন ও অপকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাধার মান, পরদারগত স্বামী বিচ্ছেদে রমণীর আত্মবেদন এবং পতির নিকট হইতে সুশোভন বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রাপ্ত না হওয়ায় নারীর অভিমান, পরিমাণ এবং পাবিত্র্যে, ক্রমশঃ হীন। যেহেতু, ক্রমোচ্চ মানসিক স্তরের বিকাশানুসারে মনে বিশুদ্ধতরা অনুভূতির সঞ্চার হয়, অতএব, মনের উচ্চস্তরে যে অনুভূতি হয়, তন্নিম্ন

স্তরে তাহা হয় না। জ্ঞানীগণ পরমতত্ত্বালোচনায় যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, পণ্ডিতগণ বিদ্যা তত্ত্বালোচনায় তাহা অনুভব করিতে পারেন না। আবার পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম বিদ্যা তত্ত্ব চর্চ্চায় যে সুখ বোধ করেন, সাধারণ মানবগণ অর্থ বিত্তাদি চিন্তায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ভগবানের অবতার-তত্ত্ব বোধগম্য করিবার চেষ্টা না করিয়া, উহা অসম্ভব বিবেচনায়, অনেকে, বিশেষতঃ, মুসলমানগণ, নিম্নলিখিত রূপে উহার প্রতিবাদ করেন :—প্রথমতঃ, যদি পূর্ণব্রহ্ম অবতার রূপে আবির্ভূত হন, তাহা হইলে, এই অবতার স্থিতিকাল যাবৎ ঈশ্বরের আসন, ইহা যেরূপই হউক বা যেখানেই থাকুক, শূন্য পড়িয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যদি ঈশ্বরের অংশ অবতার রূপে আবির্ভূত হন, তাহা হইলে, ঈশ্বর তদ্দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হন, এবং যত কাল অংশাবতারের বিদ্যমানতা থাকে, তত কাল দুই ঈশ্বরের বিদ্যমানতা থাকে। অথচ, ঈশ্বর এক ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অপিচ, ঈশ্বর অসীম হইলেও, গাণিতিক নিয়মে, অংশবিচ্যুতি দ্বারা, তাঁহার ঈশ্বরত্বের লাঘব হয়। তৃতীয়তঃ, হিন্দু ধর্ম্মানুসারেই, ঈশ্বরাবতারের অসম্ভবত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, উপনিষদে ঈশ্বর 'অজ' সংজ্ঞিত হইয়াছেন। দার্শনিকগণ ঈশ্বরের যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এস্থলে তৎসকলের অবতারণা না করিলেও, কেবল ঈশ্বরের সর্ব্ববাদীসম্মত বিভূতি দ্বারা এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়। ঈশ্বর অক্ষয়, অসীম এবং সর্ব্বশক্তিমান্,ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রথমতঃ, অক্ষয় অসীম ঈশ্বর হইতে যতই পূর্ণাবতার হউন, তাঁহার কোনও রূপ ক্ষয় হয় না; তিনি তাঁহার স্বভাবেই থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরাবতারে ঈশ্বরাসন শূন্য হওয়ার কোনও আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাকে অংশাবতার বলা হয়, তদ্রূপ আবির্ভাব নিবন্ধন ঈশ্বর দুইভাগে বিভক্ত হন না। ইহাতেও ঈশ্বরের একত্ব বিদ্যমান থাকে। মানবগণ যাহাতে এ বিষয় বুঝিতে পারে, করুণাময় তজ্জন্য সৃষ্টি প্রকরণে ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বাস্প জলে কিম্বা জল বাস্পে পরিণত হইলে, বাস্প কিম্বা জল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় না। দুইই এক পদার্থ থাকে; অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় মাত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান যে তাঁহার স্বকীয় রূপ-বহুত্ব সমাধান করিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তথাপি মানবগণ সহজে ধারণা করিবার জন্য, যদি অবতারে ঈশ্বরের দ্বৈত কল্পনা করেন, তাহাতেও হানি নাই। মানবগণ নিজ নিজ ধারণা বশতঃ ভগবানের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। অপিচ, যতই গাণিতিক নিয়ম থাকুক, অংশাবতারে

অক্ষয় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের অণুমাত্রও লাঘব হয় না। তৃতীয়তঃ, 'অজ' শব্দের অর্থ জন্মরহিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপনিষদে 'যিনি আদি জন্মরহিত বা অনাদি' এই অর্থে ঈশ্বরকে 'অজ' বলা হইয়াছে। অভিধানকারগণ, নঞ্ পূর্ব্বক উৎপন্ন হওয়ার্থক 'জন্' ধাতু নিষ্পন্ন 'অজ' শব্দের 'যিনি কাহারও গর্ভে জন্মেন নাই' এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দ্দেশ করেন এবং উহার ঈশ্বর-বোধক 'ব্রহ্মা, 'বিষ্ণু' ও 'শিব' এই তিন প্রতিশব্দ প্রদান করেন। অভিধানকারগণ কৃত এ অর্থ যে স্বাভাবিক, তাহা বলা বাহুল্য। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, যিনি কাহারও গর্ভে জন্মেন নাই, তিনি যে কখন ও কাহারও গর্ভে জন্মিতে পারেন না বা জন্মেন না, এরূপ সিদ্ধান্ত বালকোচিত। আবার, নিজমত পোষণ কল্পে, শাস্ত্রোক্ত কোনও শব্দ একবিধ অর্থে গ্রহণ করিয়া, বিরুদ্ধ মত-পোষক তাহার অন্যান্য স্বাভাবিক অর্থ বর্জ্জন করাও অসমীচীন। ঈশ্বরের অস্তিত্বই যখন মানব কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হয়, তখন ভগবান স্বমুখে নিজাবতারবাদ প্রচার করা স্বত্বেও* যে তৎসম্বন্ধে মানব কর্ত্তৃক সংশয় পোষিত হইবে, তাহা আর অধিক আশ্চর্য্য কি? বিশ্ব বিরাট ও বিচিত্র এবং পরমেশ্বরই ইহা এরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। যাঁহারা কর্ম্মনিপুণ, তাঁহারা জগতের উদ্দাম কোলাহল ও উদ্গাঢ় বিভ্রান্তি মধ্যে আপন আপন কার্য্যোদ্ধার করেন।

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়-বিরচিত সমন্বয় গ্রন্থে পারিভাষিক নামা

প্রথম অধ্যায়।

---

* অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

আমি অজ, অব্যয়াত্মা এবং সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর হইয়াও, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, মায়াবলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে-
ব্যাকরবাণীতি ॥২॥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ প্রপাঠক, ৩য় খণ্ড।

সৎ সূক্ষ্মরূপে ব্যাপক এবং সদ্‌রচিত শরীরে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, আমি নাম ও রূপের ব্যাখ্যা করি।

অপিচ — "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২য় বল্লী, ৬ষ্ঠ অনুবাক।

পরমেশ্বর উক্ত জগৎ এবং শরীরের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতেই স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছেন। (এ মন্ত্র হইতে জীবব্রহ্মের একত্বও সূচিত হয়)।

ভাবাঙ্কুর নামা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরবাদ এবং বিশ্বাস-ভিত্তি।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখে দণ্ডায়মান মানব সৃষ্টি মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া যায়! সূর্য্য-চন্দ্র-পৃথ্বী-তারা প্রভৃতি অগণ্য গ্রহ উপগ্রহগণ বিনা সূত্রে গ্রথিতা লোলায়মানা মালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত প্রকাণ্ড পিণ্ডরাজী, কিরূপে, বিনা আস্থায় শূন্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে ইহারা গ্রথিত আছে এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে না। এ আবিষ্ক্রিয়া সত্য, সন্দেহ নাই। দৃশ্যতঃ অনন্ত কাল হইতে এই সৌর জগৎ একই ভাবে বিদ্যমান আছে। আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে সাধারণে, হয়ত, এই আকর্ষণী তত্ত্ব বিদিত ছিল না। তাই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ উক্ত বিষয় প্রকট করিয়া, সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু পরস্পর মধ্যে এই আকর্ষণী শক্তি কেন হইল? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। আকর্ষণী শক্তির বিদ্যমানতা পর্য্যন্ত তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-গৃহীতা হইয়াছে; তদূর্দ্ধে তাঁহাদের উন্নত মস্তিষ্ক আর উত্থিত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ কোনও সদুত্তর প্রদান না করিলেও, অন্তরের অন্তস্তল হইতে, কে যেন নিঃশব্দে অথচ অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে বলিয়া দেয়, এমন একজন আছেন, যিনি এই আকর্ষণী শক্তি দিয়াছেন এবং যিনি এই সৌরজগৎ এরূপ ভাবে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

কেবল মাত্র ধরাতলে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিলেও, কত শত পবিত্র ভাব, যুগপৎ হৃদয়-পটে জাগরূক হইয়া উঠে। গগনস্পর্শী শৈলশ্রেণী যেমন একদিকে মহান্ উন্নতভাবের মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে অতল অসীম জলধি তেমনি অপরিমেয় উদারতার জীবন্ত উদাহরণ। শোভার আকর হ্রদ, নদ, নদী, কানন, প্রান্তর, গিরি-উপত্যকা, বিটপীকুল কেমন মনোহর ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে! বিবিধ বর্ণে চিত্রিত কত প্রকার প্রাণী—ভূচর, খেচর, জলচর, উভচর,—চতুষ্পদ, দ্বিপদ, নিষ্পদ। কত প্রকার, কে গণনা করে? এক প্রকারে কত, তাহাইবা কে গণনা করে? জগৎ চৈতন্যময়—আবায়ুমণ্ডল জীবকুল কর্ত্তৃক অধ্যাসিত। জগৎ

আনন্দময়—প্রাণীগণের ঐকতান সঙ্গীতে অহর্নিশি মুখরিত। চৈতন্যের সম্ভোগ নিমিত্তই এত আনন্দ। জগতের চৈতন্য আছে, তাই আনন্দও আছে। কুসুমের হাসি ও সৌরভ, জীমূত মন্দ্র এবং বিজলীচাপল্য, সমুদ্রের গর্জ্জন এবং গাম্ভীর্য্য, সকলই চেতন জগৎকে আনন্দ প্রদান করিতেছে। ছয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইয়া, জীবের কত আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। প্রাত্যহিক দিবারাত্রি জীবের কি পুলক ও শান্তি বিধান করিতেছে। এ আনন্দনিকেতন কে সৃজন করিয়াছেন? তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে কোটী কোটী নমস্কার!

জীবের আনন্দ সম্ভোগ জন্যই কি জগতের সৃষ্টি হইয়াছে? জগৎ এরূপ আনন্দময়, তথাপি, ভীষণ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সুখের পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে কেন? জীবকুল সর্ব্বদা জরা ও ব্যাধি ভয়ে ত্রাসিত কেন এবং মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হয় কেন? আনন্দকোলাহলের সহিত বার্দ্ধক্য ও ব্যাধি যন্ত্রণার হাহাকার রব এবং শোকের ভয়াবহ আর্ত্তনাদ উত্থিত হয় কেন? আনন্দ স্রোতের সহিত দুঃখস্রোত প্রবাহিত হইতেছে কেন? বিমল মনেও এই বিষাদ দৃশ্য কেমন এক বিষম সন্দেহ মেঘ জমাইয়া দেয়। অন্তঃকরণ ঘোর ধন্ধে আবরিত করিয়া ফেলে। যতক্ষণ এই মেঘ থাকে, ততক্ষণ ধন্ধ ঘুচেনা, সমস্যারও মীমাংসা হয় না। কিন্তু মেঘ অপসারিত হইলেই, মন স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। জগৎ শিক্ষাস্থল। জগৎ ক্ষেত্রে জীবকুলের শিক্ষাকার্য্য সমাহিত হয়। যতদিন জীবের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়, অথবা জীব যতদিন শিক্ষাধীন থাকে, ততদিন জগৎকে নীরস দুঃখময় বিবেচনা করে; জগতে শান্তি নাই, এইরূপ উপলব্ধি করে, জগৎ যে শিক্ষাস্থল, ইহাও ধারণা করিতে পারে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলেই, জীব জগৎকে শিক্ষাস্থল বলিয়া বুঝিতে পারে এবং আনন্দময় দেখে। এ আদর্শ শিক্ষাগার কাহার এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাগুরুই বা কে? তিনি যিনিই হউন, তাঁহার তুল্য গুরু আর হইতে পারে না; তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়াও শেষ করা যায় না। তাঁহার চরণে অসংখ্য প্রণাম!

আমরা নরপতিবৃন্দের রাজ্য, দুর্গ, কোষাগার, পারিষদ্ ও সৈন্যবলাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী বিবেচনা করি; কোনও রাজকীয় বা ধনাঢ্য ব্যক্তির সুযত্ন-রক্ষিত উদ্যান বা পশুশালা কিম্বা পক্ষীশালা অবলোকন করিয়া সে সকলের কত সুখ্যাতি করিয়া থাকি; উদ্যানের শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষনিচয়, কুসুমোপবন, কৃত্রিমশৈল এবং প্রস্রবণ প্রভৃতি দেখিয়া, অধিকারীর

সৌন্দর্য্য-রুচি এবং পশুপক্ষী-শালায় নানাপ্রকারের বহু পশু পক্ষী সংগৃহীত দেখিয়া, অধিকারীর চেষ্টা ও আয়াস স্বীকারের কত ব্যাখ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই; নগরে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত রাজপ্রাসাদ বা ধনীজনগণ-হর্ম্ম্যরাজী পুলকিত নয়নে বিলোকন করিয়া, শিল্পীগণের শিল্পবিদ্যার কত প্রশংসা করিয়া থাকি; ঘড়ি, এঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া এবং আবয়বিক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিয়া, আবিষ্কর্ত্তা-গণের উদ্ভাবনী শক্তি ও যন্ত্র-নির্ম্মাতাগণের সুচারু-কারু-ক্রিয়া-কুশলতার কত গৌরব করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি সমুদয় রাজগণের রাজ্যসমষ্টি-পরিমিতা অবনীও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর অগণ্য গ্রহোপগ্রহ-সমন্বিত সৌরজগৎরূপ বিরাট সাম্রাজ্য সুনিয়মে শাসন করিতেছেন, তিনি পার্থিব নৃপতিগণ অপেক্ষা কতগুণ অধিক ক্ষমতাশালী? ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ভাণ্ডার, তাঁহার কত ঐশ্বর্য্য? এই বিশ্বোদ্যান, এই ভূমণ্ডলরূপ জীবশালা যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার কিরূপ সৌন্দর্য্যরুচি এবং যিনি অহরহঃ এই সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন, তিনি কতগুণ অধিক আয়াস স্বীকার করিতেছেন? যাঁহার কৃত একটীমাত্র তরুপত্রের শিল্পনৈপুণ্য মানবের অননুকরণীয়, তিনি কত বড় শিল্পী? যিনি অস্থি-মাংস শিরা-পেশী-ধমনী-কৈশিক-সমন্বিত দেহ-যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়া, ভুক্ত পরিপাক এবং রক্তসঞ্চালনক্রিয়া নির্ব্বাহ করাইতেছেন, তিনি কত বড় যন্ত্রনির্ম্মাতা এবং তাঁহার কতদূর উদ্ভাবনী শক্তি? কোনও দিকেই, তাঁহার ক্ষমতার সীমা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কিম্বা তাঁহার শক্তিরও পরিমাণ করা যায় না। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং প্রত্যেক লোমকূপ হইতে ঐকতান মধুরস্বরে এক পবিত্রধ্বনি নির্গত হয়, তিনি অসীম, তিনি অতুলনীয়, তিনি ঈশ্বর। ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে, তিনি ঈশ্বর, যেহেতু, তিনি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, ইহাতে আধিপত্য করিতেছেন। মন উধাও হইয়া সেই অনন্ত পানে ছুটিয়া যায়। সেই অসীম অব্যক্ত সত্য প্রশান্ত মঙ্গল চিরন্তনে সর্ব্বদা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত!

অতএব সর্ব্বশক্তিমান জগৎকারণ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বিষয়—ইহা প্রামাণ্য নহে। এই জাগ্রত বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্যই পবিত্র বিশ্বাস-বীজ জীবের অন্তরে নিহিত হইয়াছে। যাঁহাদের মনঃক্ষেত্রে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, বিশ্বাসতরু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা এবং সৃষ্টিরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। যাহাদের বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহারা ঘোর মোহান্ধকারে আবৃত থাকিয়া 'ঈশ্বর নাই' এইরূপ মনে করে। তাহারা এরূপ অন্ধ যে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ চর্ম্ম চক্ষু সমীপে উদ্ভাসিত

থাকা স্বত্বেও, তৎসমস্ত যে ঈশ্বরকৃত, তাহা অনুভব করিতে পারে না। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাহারা, সৌরজগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-সমূহ আপনা হইতে আচম্বিতে সম্ভূত হইয়াছে, এইরূপ মনে করে। যাহা অকস্মাৎ সম্ভূত হয়, তাহার কোনও নিয়ম বা ব্যবস্থা নাই, অথচ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এরূপ সুনিয়মে চলিতেছে এবং সুব্যবস্থায় রহিয়াছে; গ্রহোপগ্রহগণের গতিবিধি এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফলাফল, দিবারাত্রি ও শুক্লকৃষ্ণ-পক্ষভেদ, ঋতুপর্য্যায়, জীবের জাতীয়ভাব এবং ধর্ম্ম, পদার্থনিচয়ের গুণাগুণ দৃশ্যতঃ অনন্তকাল হইতে একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে; ধরা এরূপ সুসজ্জিতা—জলস্থল বৃক্ষ যেখানে যাহার আবশ্যকতা, ঠিক সেইখানেই তাহার বিদ্যমানতা; একজন সুদক্ষ ব্যবস্থাকারীর হস্তকৃত ভিন্ন কখনই এরূপ হইতে পারিত না, প্রভৃতি সমস্ত সুস্পষ্ট বিষয় নিচয় তাহারা ধারণা করিতে পারে না। আবার একপ্রকার সৃষ্টি যদি অকস্মাৎ হইতে পারে, তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন সৃষ্টিও সেইরূপ অকস্মাৎ হওয়া সম্ভব; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাহা কেহ কখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। হঠাৎ কখনও সূর্য্যোদয় বন্ধ হয় নাই, কখনও ছয় মাসব্যাপী শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষ কিম্বা বৎসরব্যাপী গ্রীষ্ম বা অন্য ঋতু দেখা যায় নাই, কখনও কোনও জীব অমর হয় নাই, কখনও কোনও ব্যাঘ্র ঘোটক হয় নাই বা ঘোটকীর গর্ভে ব্যাঘ্রের জন্ম হয় নাই, ইত্যাদি বহুতর বিষয়, যদিও সহজবোধ্য, তথাপি, তাহাদের অন্তঃকরণে উদ্ভাসিত হয় না।

যাহাদের বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর, কোমল বিশ্বাসতরু অনবরত সন্দেহ-বায়ুভরে দোদুল্যমান হইতেছে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াও, সেই পরমপুরুষকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর মানব সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত উত্তম ও অধম শ্রেণীর অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত, সমস্ত মনুষ্যই এই মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্গত। সংসার-ক্ষেত্রে কঠোর জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া, ইহারা বিভ্রম-জনিত অহঙ্কার বশতঃ সর্ব্ববিষয়ে স্ব স্ব প্রধান বা কর্ত্তা, এইরূপ মনে করে। নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী, অদৃষ্ট নিয়মিত হইতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, ইহারা ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বিবেচনা করে এবং ঈশ্বরের নিকট ধন, মান, যশঃ ও ভোগ-সুখ প্রার্থনা করে। এই বিরাট শ্রেণীর মধ্যেও স্থান-ক্রম আছে। যাঁহারা এই শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত সম্মুখবর্ত্তী ভাগে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়াও, অবসরমত মধ্যে মধ্যে কোমল বিশ্বাস-তরুমূলে ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের

৩

বিশ্বাসতরু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, যখন পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন ইঁহারা উত্তম বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। তখন সন্দেহ বায়ু বা রিপুকীট এইতরুর আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। যাহারা এই মধ্যম শ্রেণীর নিম্নভাগে থাকিয়া, কোমল বিশ্বাস-তরুর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহাদের বিশ্বাসতরু রিপুকীট দষ্ট হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন এই সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি অধম শ্রেণীভুক্ত নাস্তি-বাদীগণের মতাবলম্বী হইয়া পড়ে; জগৎসৃজন বা শাসন বিষয়ে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া গিয়া, জগৎ কোনও অবোধগম্য শক্তিপ্রসূত, এইরূপ মনে করে; কিন্তু শক্তি, বল প্রভৃতি যে ঈশ্বরেরই নামান্তর মাত্র এবং ইহারা যে প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছে, মোহ বশতঃ, তাহা বুঝিতে পারে না। ইহাদের সন্দেহাপনোদন এবং চৈতন্যোৎপাদন জন্য পরম কারুণিক মঙ্গলময় ধাতা কত ইঙ্গিত করেন। যাহারা ঐ ইঙ্গিত ধরিতে পারে, তাহারাই ভাগ্যবান্; তাহাদের বিশ্বাস-বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। কেননা, বিশ্বাস-বীজ একাঙ্কুরী নহে; চেষ্টা করিলেই, যতবার ইচ্ছা, ইহা হইতে অঙ্কুরোৎপাদন করা যায়। যাহারা ইঙ্গিত স্বত্বেও তাহা ধরিতে পারে না, তাহারা যুগ যুগান্তর মোহান্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফলতঃ, যে সমস্ত বদ্ধ জীব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ না বুঝিয়া, প্রমাণ্য বিষয় বলিয়া বোধ করে, কেবল তাহাদেরই জন্য, ভগবান নিম্নলিখিত জাজ্বল্যমান প্রমাণাবলী উপস্থাপিত রাখিয়াছেন।

১। অবতারাবির্ভাব :—জীবের চাক্ষুষ সংস্পর্শে আসিয়া, ধর্ম্ম সংস্থাপন, সাধুগণের পরিত্রাণ, এবং দুষ্কৃত-বিনাশ-জাত জীব-শিক্ষার নিমিত্ত, ভগবান জীবদেহ ধারণ করিয়া, ভূতলে লীলা করেন। সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ভবতারাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল মাত্র মানবসমাজগত ধর্ম্ম রক্ষা বা তৎ সংস্থাপন কল্পে অবতারাবির্ভাব বিষয় আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, তগবান (ক) শ্রীরামচন্দ্র, (খ) শ্রীকৃষ্ণ, (গ) শ্রীবুদ্ধ, (ঘ) শ্রীযীশুখ্রীষ্ট, (ঙ) শ্রীমোহম্মদ, (চ) শ্রীচৈতন্য, (ছ) শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতিরূপে জীবের বাহ্যেন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছেন। অবতারে ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

২। ঈশ্বর-বাণী :—ভগবান এমন কতকগুলি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, যেখানে মনুষ্য পবিত্র অন্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর বাণী শুনিতে পায়। ভারতবর্ষে বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর প্রভৃতি এইরূপ স্থান। গ্রীস-দেশীয় ডেল্ফি পর্ব্বত ঐরূপ একটী স্থান ছিল। শুদ্ধাত্মা গ্রীকগণ তথায় অনেক ঈশ্বর বাণী

শুনিতে পাইতেন। পুরোহিতগণের কৃত্রিম ব্যবহারে এবং গ্রীসদেশবাসীগণের বিশ্বাসহীনতায়, ডেল্‌ফি পর্ব্বতের দৈববাণী বিলুপ্ত হয়।

৩। নির্ভরে কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ ঃ—অল্পকাল জন্যও ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, কেহ মঙ্গলেচ্ছা প্রণোদিত কোনও বস্তুর কামনা করিলে, আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার সেই বস্তু লাভ হয়। উপরোক্ত বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, প্রভৃতি স্থানে একাগ্র মনে উপাসনা করিয়া, বহু সংখ্যক ব্যক্তি, অভাবনীয়রূপে, অনেক অচিকিৎস্য রোগের ঔষধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; কত স্নেহময়ী জননী পুত্রের এবং কত পতিব্রতা রমণী স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আবার কত লোক একমনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, স্বপ্নে দুরারোগ্য রোগের ঔষধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ সুদূর বিদেশবাসী আত্মীয় বা বন্ধুর দর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে আহ্বান করায়, আশাতীত রূপে তত্তৎ আত্মীয় বা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

৪। দর্পে পতন ঃ—ঐশী ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়া, আত্মশক্তির গর্ব্ব করিলে মানবের দর্পচূর্ণ হইয়া যায়। পুরাণ-মালায় এরূপ অনেক বিবরণ আছে, যে-খানে মানবগণ গর্ব্ব সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহার বিষময় ফল স্বরূপ ঘোর মনস্তাপ ও অপমান পরম্পরা সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু, আধুনিক ঘটনাবলীর দৃষ্টান্তে এ বিষয় অধিকতর স্পষ্টরূপে মনোগ্রাহ্য হইতে পারে। বৃটন রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে, স্পেন-রাজ ফিলিপ ইংলণ্ড জয় কল্পে এক বিপুল সমর তরণিশ্রেণী বিনির্ম্মাণ এবং উহা সমৃদ্ধ রূপে সৈন্য-সজ্জিত করেন। ভূম-ণ্ডলে, তৎকালে, আর কোনও দেশে উহার সমকক্ষ রণপোত-সঙ্ঘ বিদ্যমান ছিল না। দাম্ভিক ফিলিপ এই বিরাট রণতরী সমাবেশ বলে ইংলণ্ড জয়ের নিশ্চিত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সগর্ব্বে উহার 'অজেয়' নামকরণ করিলেন। ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বলদৃপ্ত সমরপোত সঙ্ঘের ইংলণ্ড-যাত্রার অব্যব-হিত পরে যে প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হয়, তাহাতে ইহার অনেক তরণী সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিতা হয়। অবশিষ্ট যে অল্প সংখ্যক পোত ইংলণ্ড সমীপে উপনীত হইয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডবাসীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত বা বিধ্বস্ত হয়। এই ভীষণ ব্যাপার ইয়ুরোপবাসীগণের নয়নে, মদগর্ব্বী ফিলিপের প্রতি ঈশ্বরের কঠোর দণ্ড স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল। সম্প্রতি যে টাইটানিক নামক অর্ণবযান জলনিমজ্জিত হইয়াছে, টাইটানিক স্বত্বাধিকারীগণের মদমত্ততাই তাহার কারণ। তাঁহাদের এরূপ গর্ব্বজ ধারণা ছিল যে, টাইটানিক যেরূপ দৃঢ় ভাবে বিনির্ম্মিত,

তাহাতে, উহা অনিমজ্জনীয় এবং তাঁহারা দর্পভরে উহার ঐ প্রকার আখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম সমুদ্র যাত্রায়, অর্দ্ধপথে টাইটানিক জলনিমগ্ন হয়।

৫। অশুভ ঘটনার পূর্ব্বাভাব :—কোনও অশুভ বা আকস্মিক বিপজ্জনক ঘটনা সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এরূপ কতকগুলি চিহ্ন প্রকটিত হয় যে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের ইঙ্গিত স্বরূপ গণ্য করা যায়। ভূবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন, ভূমিকম্প হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ বায়ু বন্ধ হয় বা প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, সূর্য্য রক্তাভ হয়, পশুপক্ষীগণ ভীত হয় এবং মনুষ্যের বমন চেষ্টা হয়। আকস্মিক মৃত্যু বা অপর কোনও গুরুবিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত থাকিলেও, মনুষ্যের অমঙ্গল সূচক হৃৎকম্পন উপস্থিত হয়। সাধারণ মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগী প্রবৃত্তি অনুসারে সুদর্শন বা ভয়াবহ দৃশ্য সকল দেখিতে পায় এবং কোনও কোনও স্থলে মৃত আত্মীয় বা বন্ধুর প্রেতাত্মা পূর্ব্ব-দেহ ধারণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে, এইরূপ উপলব্ধি করে। সময়ে সময়ে রোগীর শুশ্রূষাকারীগণও এইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পান। বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে গৃহপালিত পশুগণ সকরুণ ক্রন্দন করিতে থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অনেক কাল্পনিক দৃশ্য দেখিতে পায়; সে সমস্ত প্রকৃত নহে। কিন্তু রোগীর পার্শ্ববর্ত্তী অনেক অরোগী ব্যক্তি যদি যুগপৎ সেই এক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর করেন, তাহা হইলে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই।

৬। ঈশ্বর প্রত্যয়-জনক ঘটনাবলী :—এরূপ কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনা মানবের চক্ষু-গোচর হয়, যাহার মুখ্য বা গৌণ কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট অন্তঃকরণে, তাহাদিগকে অমানুষিক বা ঐশ্বরিক ঘটনা বলিয়া থাকি। ব্যাঘ্রের সহিত 'ফেউ' নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রায়তন পশু অনবরত বাস করে। কোনও বনে ব্যাঘ্র আছে না জানিয়া, যদি কোনও পথিক ঐ বনের ধার দিয়া যাইতে থাকে, ফেউপশু তাহার স্বভাবদত্ত 'ফেউ ফেউ' রব করিয়া, পথিককে সতর্ক করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যরূপে তাহার জীবন রক্ষা হওয়ায়, পথিক নিরাপদ স্থানে আসিয়া, নতজানু-হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মেসিনাদেশে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক অট্টালিকা ভূমিসাৎ এবং বহু লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তিন দিবস পরে কোনও ভূপতিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ স্থানান্তরিত করিয়া কয়েকটী মৃতদেহ

পাওয়া যায়; কিন্তু একটী দেড় বৎসর বয়স্ক শিশুকে জীবিত পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহার গাত্রে কোনও আঘাত চিহ্ন ছিল না। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ঐ শিশুর দ্বারা জগতের কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে বলিয়া ঈশ্বর কর্তৃক আশ্চর্য্য রূপে উহার জীবন রক্ষিত হইয়াছে। প্রাত্যহিক সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধেও, যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না এবং সাধারণে যাহা ঘটিবে বলিয়া কখনও আশা করে নাই, তাহা অনায়াসে ঘটিতে দেখিয়া মানবগণ উহা ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্ত দ্বারা সংঘটিত হইল, এইরূপ বিবেচনা করেন। পাছে কেহ গ্রন্থকারের স্বকপোল কল্পিত-বিবেচনা করিয়া বর্ণিত বিষয় উপেক্ষা করেন, এই ভয়ে, কেবল মাত্র ঐতিহাসিক অথবা অনেক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এবং বহুজন-বিদিত নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করা গেল।

(ক) স্কট্‌লণ্ডের অধিপতি বিখ্যাত রবার্ট ব্রুস্ (Robert the Bruce) একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং সদ্বিবেচক পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন। ফলতঃ তিনি অভিজ্ঞতালোকে সূক্ষ্ম ব্যাপার নিচয়ে ঈশ্বরের লীলামহিমা দর্শন করিতে পারিতেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, মতিমান ব্রুসের বহুবিধ উৎকট ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিশেষ চেষ্টা স্বত্ত্বেও নিজোদ্দেশ্য সাধনে উপর্য্যুপরি ছয় বার অকৃতকার্য্য হইয়া, একদা তিনি কোনও নিভৃত পর্ব্বতগুহায় উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় অদৃষ্ট-দুর্ব্বিপাক চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অদূরে একটী ঊর্ণনাভ কোনও নির্দ্দিষ্ট পদার্থে তন্তু সংলগ্ন করিয়া জাল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লূতিকার লক্ষ্য পদার্থ তাহার অবস্থিতিস্থল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। ব্রুস্ দেখিলেন, ঊর্ণনাভ ক্রমান্বয়ে ছয় বার নির্দ্দিষ্টিকৃত লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়া, ব্যর্থকাম হইল; তথাপি সে নিবৃত্ত হইল না। পুনরায় চেষ্টা করিয়া সপ্তম বারে লূতিকা অভীষ্ট পদার্থে উপস্থিত হইল এবং তাহাতে সূত্র যোজনা করিয়া তদবলম্বনে জাল প্রস্তুত করিতে লাগিল। লূতিকা-চেষ্টিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া পরমেশ্বর তাঁহাকে যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তত্ত্বদর্শী ব্রুস্ তৎক্ষণাৎ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, এবং ভগবদাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, গাঢ় কৃতজ্ঞতা সহকারে সর্ব্বনিয়ন্তার উপাসনা করিলেন। এই ঘটনার পর, সপ্তমবার চেষ্টা করিয়া সুমতি ব্রুস্ যে স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইতিহাস তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(খ) পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামান্তরে, কোনও দূর-সম্পর্কীয় কুটুম্বের বাটীতে, দুই তিন দিবস পরে একটী বিবাহ হইবে বলিয়া, একটী সদ্বংশজাত যুবক কোনও ভদ্রলোকের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল। ভদ্রলোক এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে অভ্যাগত যুবকের যথোচিত অতিথি সৎকার করিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নিরূপিত দিবসে, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক পরিবার-গত অপর দুই একজন সমভিব্যাহারে, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কুটুম্বের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কুটুম্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া, তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিয়া, ত্রুটী প্রযুক্ত, তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আগন্তুকগণ কুটুম্ব-বাক্যের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা 'অমুক' কর্ত্তৃক ২।৩ দিবস পূর্ব্বে শিষ্টাচারের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কুটুম্ব অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ইহা বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ; যেহেতু পাঁচমাস হইল, 'অমুকের মৃত্যু হইয়াছে।" এই ঘটনা পরলোকের প্রতি, সুতরাং, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়।

(গ) কোনও ভদ্রমহিলা ২।৩টী শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে স্বামী গৃহ হইতে গোযানে পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন। শকটবান, যদিও পরিচিত, তথাপি মহিলার স্বর্ণালঙ্কার-গ্রহণ-লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না এবং গন্তব্য পথে না গিয়া, নিজ-জ্ঞাত কোনও একটী বনাভিমুখে গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পথের নূতনত্ব দর্শনে মহিলার সন্দেহসূচক প্রশ্ন বাহুল্যস্বত্বেও, শকটবান সেই বনে গাড়ী লইয়া গেল এবং স্বর্ণাভরণ লাভান্তে নিরাপদ হইবার দুরাশায়, মহিলা এবং তাঁহার শিশু সন্তান গুলির জীবন নাশে কৃতসংকল্প হইল। শকট-বান প্রথমে, পরিধান বস্ত্র দ্বারা মহিলাকে কোনও একটী বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; এমন সময়ে, একটী বৃহদায়তন অজগর অলক্ষিত ভাবে বনাভ্যন্তর হইতে আসিয়া, শকটবানের কটিদেশ এবং একত্রীকৃত বাহু-দ্বয় বেষ্টন করিল। সে যৎপারানাস্তি ভীতি প্রযুক্ত মহিলাকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি শিশু সন্তানগণ সহ বনের বাহিরে আসিয়া উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করায়, অনেক লোক তথায় সমবেত হইয়া, সর্পবেষ্টিত শকটবানকে অবলোকন করিয়াছিলেন। অজগর শকটবানকে দংশন না করিয়া এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বন মধ্যে চলিয়া গেল ; কিন্তু সমবেত ব্যক্তিগণ দুর্বৃত্ত শকটচালককে পুলিশের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন এবং আদালতের বিচারে এই গুরুতর অপরাধের জন্য,

সে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ঘটনাদ্বারা আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি যে, মহিলা ও তাঁহার শিশু সন্তানগণের সাহায্যার্থ ভগবান অজগরকে সঙ্কটস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন অথবা স্বয়ং সর্পরূপে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জড় পদার্থে অত্যাসক্তি হেতু অধিকাংশ মনুষ্যের মন কঠোর হওয়ায়, এক্ষণে মানব-সমাজে ঈশ্বরের কার্য্যাবলী আর সতত বাহ্যেন্দ্রিয়-গোচরীভূত হয় না। নির্জ্জন স্থানে অদ্যাপি কতশত অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিংহ ঋক্ষ শার্দ্দুলাদি আরণ্য হিংস্রপশু-সমাকীর্ণ গহন কাননে যাহারা মধু আহরণ বা মূল্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহ জন্য যাতায়াত করে, তাঁহারা বনদেবতাগণের মহিমার বিষয় অবগত আছে। কোন্ দেবতা কোন্ বনের অধিষ্ঠাতা, তাহা জানিয়া এবং অধিষ্ঠাতা দেবগণের শরণাপন্ন হইয়া, তাহারা শুদ্ধ মনে নির্ভয়ে বনে বিচরণ ও স্বকার্য্য সাধন করে। শ্বাপদকুল তাহাদিগকে হিংসা করে না। অকূল বারিধির কোন্ অংশ কোন্ জলদেবতার এবং কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ জলদৈত্য বাস করে, তাহা তত্ত্বজ্ঞ নাবিকগণ বিশেষ রূপে অবগত আছেন। পোতাধ্যক্ষ এবং নাবিকগণ যদি জলদেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন, জলদানবগণের কি সাধ্য, তাঁহাদের তরণী ধ্বংস করে? নাবিকগণ জলদেবতাকে অবহেলা করিলে, জল দৈত্যগণ নিশ্চয়ই তাহাদের অর্ণবপোত কোনও ভীষণ ঘূর্ণীপাকে নিক্ষিপ্ত বা পয়োধি-শৈলে আহত করিবে। নির্জ্জন গিরিকন্দরে অদ্যাপি অনেক মহাত্মা পুরাকালের মুনিঋষিগণের ন্যায় সারাৎসারে মনঃলীন করিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাদের তপোপ্রভাবে তত্তৎ দেশে কি প্রশান্ত ভাব বিরাজ করিতেছে। ভয়াল সিংহ ব্যাঘ্রগণ হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, তথায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে। পুণ্যময় স্বর্ণযুগে, যখন মানবের মন কোমল এবং সরল ছিল, ভগবান মনুষ্য সমাজে আবির্ভূত হইয়া ব্যক্তি বিশেষের সহিত কথোপকথন এবং লোক শিক্ষা প্রদান করিতেন, ইহার অনেক পরিচয় পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রনিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত ঘটনা সত্য হইলেও, বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণ, ভ্রান্তজনের কুসংস্কার প্রণোদিত উক্তি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, এ সকল তত্ত্বে আদৌ আস্থা স্থাপন করেনা এবং তাহাদের নিজ নিজ মত ভ্রান্তি-রহিত এইরূপ বিবেচনা করে।

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত সমন্বয় গ্রন্থে
ভাবাঙ্কুর নামা দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিশ্বোৎপত্তি নামা

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

পুরাকালে মহাসত্ত্ব মনীষিগণ সৃষ্টিতত্ত্বের যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে, আমরা পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যেই, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিষয়ক পুরাণ-গ্রন্থ (cosmogony) অথবা কিম্বদন্তী প্রচলিত দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয় সংহিতা, পুরাণ ও উপপুরাণরাজী বিরচিত হওয়ার পরে, মিসর, ফিনিসীয়া ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও সৃষ্টিরহস্যোদ্ঘাটনপরতা বিষয়ে বহুল গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পৌরাণিক গ্রন্থ সমুদ্র যদিও, দৃশ্যতঃ, মতবিভিন্নতারূপ অগণনতরঙ্গবিক্ষোভিত প্রতীয়মান হয়, তথাপি এই বিশাল সাগরে একই মূলস্রোত প্রবহমান আছে। বিশ্বোৎপত্তির সময় এবং সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যদিও বিভিন্ন দেশীয় পুরাণ বা প্রবাদনিচয় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে, তথাপি, জগতের প্রসূতি প্রণালী সম্বন্ধে পরস্পর মধ্যে কোনও মত-বিরোধ নাই। হিন্দু পুরাণে যেমন ঘোর তিমিরাবৃত একার্ণব হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিবৃত হইয়াছে, অন্যান্য পুরাণেও সেইরূপ কেয়স্ (chaos) বা ব্যবস্থাহীন অন্ধকারাবৃত সাগরগর্ভ হইতে কস্‌মস্ (cosmos) বা বিশ্বোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য, ভাষাভেদে কেয়স্ (chaos) শব্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

পুরাণ গ্রন্থ নিচয়ের ভাষা ঈদৃশী রূপকময়ী, যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপাধিধারী পণ্ডিতগণের প্রমাণ-পিপাসু চক্ষে গ্রন্থ নিবদ্ধ বিষয়-সকল যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদেশীয় পুরাণ-তত্ত্ব কবিকল্পনার ন্যায় সারহীন বিবেচনা করেন। অতএব তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয় ও পুরাণ-তত্ত্ব মধ্যে কতদূর পার্থক্য, তাহা ক্ষণকাল আলোচনা করা আবশ্যক।

স্থিরভাবে আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, অনুমান ও কল্পনা উভয়ই একবিধ ভিন্ননামা বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, কল্পনা যেরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ, অনুমানও সেইরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ। অনুমান যতক্ষণ প্রমাণীকৃত

না হয়, ততক্ষণ, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। পরীক্ষিত বিষয় সকল লইয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ গর্ব্ব করিয়া থাকেন। অতএব, তাঁহাদের উক্তি অনুসারে বিষয় সকল আদৌ অনুমিত, পশ্চাৎ প্রমাণীকৃত হয়। প্রথমতঃ বলা যাউক, যে সমস্ত অনুমিত বা কল্পিত বিষয় আছে, কিন্তু আমাদের গোচরতঃ পরীক্ষিত হয় নাই, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তাহারা যে পরীক্ষাপেক্ষ হইয়া আমাদের জন্য অনুমিত বা কল্পিত হইয়া আছে, ইহাই যথেষ্ট। অন্ততঃ, এক্ষণে আমাদের ঐসকল গুরুতর বিষয় অনুমান বা কল্পনা করিবার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। অতএব, আমরা যে সমস্ত অনুমিত বা কল্পিত বিষয় পাই, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি পরীক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে বিষয় সারহীন বলা অপেক্ষা, বরং, আমাদের শক্তির অভাব, এইরূপ বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত অনুমিত বা কল্পিত বিষয় আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে কখনও পরীক্ষিত হয় নাই এরূপ বোধ করাও উচিত নহে। যাঁহারা এরূপ প্রতিভাশালী যে ঐসকল কূটতত্ত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে তৎসমস্ত পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত কত কত জ্ঞান-ভাণ্ডার কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এখনও লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকলাপের উদ্ধারীকৃত অণুবিলোকন করিয়া আমরা প্রাচীন সভ্যতা ও পৌরাণিক জ্ঞানবীরগণের অর্জ্জিত জ্ঞানরাশির কত ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এখনও অস্তমিত জ্ঞানসূর্য্যের ক্ষীণ ছটায় আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। বিধ্বংসী কালের করাল করপ্রভাব স্বত্বেও, প্রাচীন জ্ঞানের চূর্ণাবশেষ অদ্যাপি যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার জ্যোতিঃ আধুনিক বিদ্যাদীপ্তি অপেক্ষা কত উজ্জ্বল! এই সমস্ত কারণে পৌরাণিক বিবরণ সারহীন বিবেচনা না করিয়া, আমাদের তাহা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখাই উচিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গর্ব্ব মোহ-প্রণোদিত।

অধুনাতন, সভ্যজগতে ফরাসী পণ্ডিত লাপ্লাসের নেবুলার হাইপথেসিস্ (Nebular hypothesis) বা নীহারিকা-সংক্রান্ত অনুমান সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। লাপ্লাসের মতে বিশ্বসংসার আদৌ বাষ্পময় সূক্ষ্মভূতে বিলীন ছিল; তাপ বিকীরণ দ্বারা ক্রমশঃ পৃথিব্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে। সংহিতাকার মনু, বহুপূর্ব্বে, সৃষ্টিতত্ত্বের ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর আভাষ দিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বোৎপত্তি নামা

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

পুরাকালে মহাসত্ত্ব মনীষিগণ সৃষ্টিতত্ত্বের যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে, আমরা পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যেই, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিষয়ক পুরাণ-গ্রন্থ (cosmogony) অথবা কিম্বদন্তী প্রচলিত দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয় সংহিতা, পুরাণ ও উপপুরাণরাজী বিরচিত হওয়ার পরে, মিসর, ফিনিসীয়া ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও সৃষ্টিরহস্যোদ্ঘাটনপরতা বিষয়ে বহুল গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পৌরাণিক গ্রন্থ সমুদ্র যদিও, দৃশ্যতঃ, মতবিভিন্নতারূপ অগণনতরঙ্গবিক্ষোভিত প্রতীয়মান হয়, তথাপি এই বিশাল সাগরে একই মূলস্রোত প্রবহমান আছে। বিশ্বোৎপত্তির সময় এবং সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যদিও বিভিন্ন দেশীয় পুরাণ বা প্রবাদনিচয় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে, তথাপি, জগতের প্রসূতি প্রণালী সম্বন্ধে পরস্পর মধ্যে কোনও মত-বিরোধ নাই। হিন্দু পুরাণে যেমন ঘোর তিমিরাবৃত একার্ণব হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিবৃত হইয়াছে, অন্যান্য পুরাণেও সেইরূপ কেয়স্ (chaos) বা ব্যবস্থাহীন অন্ধকারাবৃত সাগরগর্ভ হইতে কস্‌মস্ (cosmos) বা বিশ্বোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য, ভাষাভেদে কেয়স্ (chaos) শব্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

পুরাণ গ্রন্থ নিচয়ের ভাষা ঈদৃশী রূপকময়ী, যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপাধিধারী পণ্ডিতগণের প্রমাণ-পিপাসু চক্ষে গ্রন্থ নিবদ্ধ বিষয়-সকল যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদেশীয় পুরাণ-তত্ত্ব কবিকল্পনার ন্যায় সারহীন বিবেচনা করেন। অতএব তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয় ও পুরাণ-তত্ত্ব মধ্যে কতদূর পার্থক্য, তাহা ক্ষণকাল আলোচনা করা আবশ্যক।

স্থিরভাবে আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, অনুমান ও কল্পনা উভয়ই একবিধ ভিন্ননামা বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, কল্পনা যেরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ, অনুমানও সেইরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ। অনুমান যতক্ষণ প্রমাণীকৃত

না হয়, ততক্ষণ, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। পরীক্ষিত বিষয় সকল লইয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ গর্ব্ব করিয়া থাকেন। অতএব, তাঁহাদের উক্তি অনুসারে বিষয় সকল আদৌ অনুমিত, পশ্চাৎ প্রমাণীকৃত হয়। প্রথমতঃ বলা যাউক, যে সমস্ত অনুমিত বা কল্পিত বিষয় আছে, কিন্তু আমাদের গোচরতঃ পরীক্ষিত হয় নাই, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তাহারা যে পরীক্ষাপেক্ষ হইয়া আমাদের জন্য অনুমিত বা কল্পিত হইয়া আছে, ইহাই যথেষ্ট। অন্ততঃ, এক্ষণে আমাদের ঐসকল গুরুতর বিষয় অনুমান বা কল্পনা করিবার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। অতএব, আমরা যে সমস্ত অনুমিত বা কল্পিত বিষয় পাই, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি পরীক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে বিষয় সারহীন বলা অপেক্ষা, বরং, আমাদের শক্তির অভাব, এইরূপ বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত অনুমিত বা কল্পিত বিষয় আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে কখনও পরীক্ষিত হয় নাই এরূপ বোধ করাও উচিত নহে। যাঁহারা এরূপ প্রতিভাশালী যে ঐসকল কূটতত্ত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে তৎসমস্ত পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত কত কত জ্ঞান-ভাণ্ডার কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এখনও লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকলাপের উদ্ধারীকৃত অণুবিলোকন করিয়া আমরা প্রাচীন সভ্যতা ও পৌরাণিক জ্ঞানবীরগণের অর্জ্জিত জ্ঞানরাশির কত ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এখনও অস্তমিত জ্ঞানসূর্য্যের ক্ষীণ ছটায় আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। বিধ্বংসী কালের করাল করপ্রভাব স্বত্বেও, প্রাচীন জ্ঞানের চূর্ণাবশেষ অদ্যাপি যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার জ্যোতিঃ আধুনিক বিদ্যাদীপ্তি অপেক্ষা কত উজ্জ্বল! এই সমস্ত কারণে পৌরাণিক বিবরণ সারহীন বিবেচনা না করিয়া, আমাদের তাহা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখাই উচিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গর্ব্ব মোহ-প্রণোদিত।

অধুনাতন, সভ্যজগতে ফরাসী পণ্ডিত লাপ্লাসের নেবুলার হাইপথেসিস্ (Nebular hypothesis) বা নীহারিকা-সংক্রান্ত অনুমান সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। লাপ্লাসের মতে বিশ্বসংসার আদৌ বাষ্পময় সূক্ষ্মভূতে বিলীন ছিল; তাপ বিকীরণ দ্বারা ক্রমশঃ পৃথিব্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে। সংহিতাকার মনু, বহুপূর্ব্বে, সৃষ্টিতত্ত্বের ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর আভাব দিয়া গিয়াছেন।

ভারতের অন্যান্য পুরাণকারগণও সৃষ্টি-রহস্যের একই মীমাংসা করিয়াছেন।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, যে সকল উপাদানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মৌলিক এক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। হিন্দুদার্শনিকগণ এই পঞ্চ পদার্থকে পঞ্চ মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা মূল পদার্থই (elements) হউক বা যৌগিক পদার্থই হউক, এই পঞ্চভূত যে বাহ্যজগতের উপাদান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, আকাশস্থিত বায়ুরাশিতে জল উত্তাপ সাহায্যে অদৃশ্যমান ভাবে বিলীন থাকে। বায়ু শৈত্যসংযোগে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া, বৃষ্টিরূপে জলে পরিণত হয়। জল জমিয়া বরফ হয় এবং জল হইতেই মৃত্তিকা সঞ্জাত হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে মৃত্তিকার অনেক রূপ আছে। বালুকা, চাখড়ি, ধাতু, প্রস্তর এ সমস্তই মৃত্তিকা। বাষ্প হইতে বৃষ্টি পতিত হইয়া যেমন জলের উৎপাদন ও পোষণ করে, তেমনি জল হইতে অনবরত বাষ্প উৎপন্ন এবং তদ্দ্বারা পুষ্ট হইতেছে! পদার্থবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন, বায়ু মণ্ডলের উপরিভাগে বায়ু অপেক্ষা লঘুতর একটী পদার্থ বিদ্যমান আছে এবং তাঁহারা এই পদার্থের 'ইথার' নামকরণ করিয়াছেন। এই ইথার, অবশ্য রূপহীন এবং বায়ুর ন্যায় ইহার স্পর্শগুণ আছে। এই স্পর্শগুণ বশতঃই, ইহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এজন্য ইথারকে আকাশ না বলিয়া, লঘুতম বায়ু বলাই উচিত। ইথারকে আকাশ বলিলে, আকাশের স্বরূপ নির্ণীত হয় না; যেহেতু আকাশের স্পর্শগুণ নাই। বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা কোনও নলাকার পাত্রবিশেষের বায়ু-নিষ্কাশিত করিলে, ঐ পাত্রের বায়ু বহিষ্কৃত হয় বটে; কিন্তু ঐ পাত্রাভ্যন্তরে আকাশ বিদ্যমান থাকে; উহা ইথার নহে। আকাশ ইথার অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এবং জড়পদার্থ দ্বারা নিষ্কাশিত হয় না। আমরা 'বস্তুহীন' এই অর্থে 'শূন্য' শব্দের যে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা ভ্রান্তি। ফলতঃ, বায়ু নিষ্কাশনের পর উপরোক্ত পাত্রাভ্যন্তরে যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহাই আকাশের স্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী আকাশ বেড়াপরিবৃত স্থানের ন্যায় পাত্রাবরণ-বেষ্টিত হইয়া পাত্র মধ্যে থাকিয়া যায়। যাহা হউক, যদিও আকাশ ও বায়ু উভয়ই রূপহীন, হিন্দুদার্শনিকগণ বায়ুকেই আকাশের ঠিক পরবর্ত্তী স্থূলতর বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অথবা, আকাশ

ঘনীভূত হইলে, যখন তাহাতে স্পর্শগুণের সঞ্চার হয়, তখন তাহাকে বায়ু বলা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, আকাশ ক্রমশঃ স্থূল বা ঘনীভূত হইয়া কঠিন মৃত্তিকা, এমন কি, কঠিনতম ধাতু ও প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। অনুলোম বিলোম ভাবে প্রকাশ করিতে গেলে, আকাশের স্থূল বায়ু, বায়ুর স্থূল তেজঃ, তেজের স্থূল জল, জলের স্থূল মৃত্তিকা—

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ ॥ ৭৫ ॥
আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শ গুণোমতঃ ॥ ৭৬ ॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাদ্বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বত্তদ্রূপ গুণমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যোগন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ ॥ ৭৮ ॥

মনুসংহিতা। প্রথম অধ্যায়।

এবং মৃত্তিকার সূক্ষ্মজল, জলের সূক্ষ্ম তেজঃ, তেজের সূক্ষ্ম বায়ু, বায়ুর সূক্ষ্ম আকাশ এইরূপ বলিতে হয়। এজন্য পণ্ডিতগণ সৃষ্টি উপাদানের ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এইরূপ পর্য্যায় নির্ণয় করিয়াছেন।

পুরাণ ও সংহিতাকারগণ যদিও সলিল হইতে বিশ্বোৎপত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি, সলিলের পূর্ব্বে যে আকাশ, বায়ু ও তেজঃ পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন। কোনও কোনও পণ্ডিত অপ্ হইতে বিশ্বোৎপত্তির বিবরণে, 'অপ্' শব্দের সাধারণ 'সলিল' অর্থ না করিয়া, উহার 'জগৎকারণ' বা 'জগতের মূলীভূত বস্তু' এইরূপ অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অর্থ যদিও অতিশয় গম্ভীর এবং সমীচীন, তথাপি, সাধারণের বোধ-সৌকার্য্যার্থ আমরা 'অপ্' শব্দের 'সলিল' অর্থ গ্রহণ করিব। এই অর্থগ্রহণ করিয়াও, পুরাণকারগণের বর্ণনা হইতে সৃষ্টিরহস্য অনায়াসে বোধগম্য করা যায়। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়গত ষষ্ঠ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই, পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চভূত ও মহদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে প্রকাশ করিয়া আপনিই প্রকাশিত হইলেন। তৎপরে মনু আবার বলিতেছেন—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধা প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবা সৃজৎ ॥ ৮ ॥

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৯ ॥

মনুসংহিতা। প্রথম অধ্যায়।

টীকাকার কুল্লুক ভট্ট, তাঁহার মন্বর্থ মুক্তাবলী নাম্নী টীকায় 'অপএব সসর্জ্জাদৌ' ইহার 'অপাং সৃষ্টিশ্চেয়ং মহদহঙ্কার তন্মাত্র ক্রমেন বোদ্ধব্যা' এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অর্থাৎ, পরমেশ্বর প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া, আকাশাদিক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলেও, এই ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য প্রতীয়মান হয়। পরেই মনু বলিতেছেন—

আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্ গুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥

মনুসংহিতা। প্রথম অধ্যায়।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস, পৃথিবীর গুণ গন্ধ। প্রথম ভিন্ন, প্রত্যেকে স্ব স্ব গুণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে। যে যত সংখ্যায় গণিত, তাহার তত গুণ হয়। অর্থাৎ আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ হয়।

অতএব আকাশ দৃশ্যমান জগতের সারভূত বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চভূতের এই বিচিত্র পর্য্যায় অনুভব করিয়া, আরও একটী সূক্ষ্মতর কৌতুহলিক ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। প্রায়শঃ অবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশ যদি কঠিনতম জড়প্রস্তরের সূক্ষ্ম শরীর হয়, তাহা হইলে আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর কোনও অবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বিদ্যমানতা সম্ভবপর কিনা? পরমেশ্বর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবান ও আকাশ এই উভয়ের মধ্যে আর কোনও বস্তু আছে কিনা? ঈশ্বর ব্যক্ত হইবার জন্য একবারে স্থূল আকাশরূপে প্রকাশিত হইলেন, কিম্বা, আয়োজন স্বরূপ, আকাশ সৃষ্টির প্রাক্ আকাশ অপেক্ষাও কোনও সূক্ষ্মতর বস্তু হইয়াছেন? তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই সৃষ্ট; তবে আমরা সৃষ্ট দেখিতে পাই, কিন্তু স্রষ্টা দেখিতে পাইনা কেন? নিশ্চয়ই স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে এমন কোনও অন্ধকারময় বস্তু আছে, যাহা স্রষ্ট আমাদের দৃষ্টি রোধ করে। সূর্য্য ও আমাদের দৃষ্টি মধ্যে মেঘ থাকিলে, আমরা যেমন সূর্য্য দেখিতে পাই না, সেইরূপ ঐ ব্যবহিত অন্তরায় বশতঃই

আমাদের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না। আবার মঙ্গলময় জগদীশ স্বয়ং সৃষ্ট হইয়াছেন; তিনিই জগৎ; তবে জগতে এরূপ বিকার ও বৈষম্য কেন? ইহার কারণও ঐ অন্তরাল। সূর্য্যকিরণ মেঘমধ্য দিয়া আসিলে, তাহার স্বাভাবিক চাকচিক্য যেমন মলিন হইয়া যায়, ঈশ্বরের যে দীপ্তি ঐ অন্তরাল মধ্য দিয়া আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রভাও সেইরূপ উক্ত অন্তরাল-মালিন্যে ভূয়সী ক্ষীণা হইয়াছে এবং ভগবানই সৃষ্টিকল্পে তাহা ঐরূপ ক্ষীণা করাইয়াছেন। এই মধ্যবর্ত্তী বস্তুই সৃষ্টিপ্রকরণের আভাষ বা পাণ্ডুলেখ্য। ফটোগ্রাফার ফটো প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে যেমন ক্যামেরা-যন্ত্রমধ্যে কাচোপরি তাহার দাগ তুলিয়া লয়, কিম্বা চিত্রকর যেরূপ চিত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে পেন্সিল দ্বারা আভাসচিত্র অঙ্কন করে, এই বস্তুও সেইরূপ সৃষ্ট জগতের কল্পনা-অঙ্কন। ইহা সৃষ্টিবীজ নিচয়ের অপরিস্ফুট আধার, সুতরাং, বহিরিন্দ্রিয় গ্রহণাতীত; ইহাই ক্রমান্বয়ে ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ এবং মৃত্তিকায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মৌলিক বস্তু হইতেই বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত উপাদান উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে এই মূল বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

হিন্দুদার্শনিকগণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অক্ষর সচ্চিদানন্দ। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা; যেহেতু বাক্যদ্বারা ঈশ্বরকে ইহা অপেক্ষা আর উত্তম রূপে ব্যক্ত করা যায় না। ঈশ্বর অনন্ত এবং অসীম; সুতরাং ভাষায় তাঁহাকে বিশেষণ বা উপমাদ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। সারাৎ-সার, পরম পবিত্র, পরম কারুণিক, ন্যায়বান, সর্ব্বশক্তিমান, শ্রেষ্ঠ বীজ, সর্ব্বৈ-শ্বর্য্যশালী, আদর্শপিতা, আদর্শ বন্ধু ইত্যাদি জীব বা জড় ধর্ম্মোপমিত গুণবাচক বাক্যদ্বারা, আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী চরমভাব তাঁহাতে আরোপ করি বটে, কিন্তু তিনি তদতিরিক্ত। ঈশ্বরকে ভাষায় প্রকাশ বা মনে অনুভূতি করিবার যত কিছু প্রকার আছে, 'অক্ষর সচ্চিদানন্দ' বাক্য তৎসকলেরই সারভূত। ঈশ্বরের ক্ষরণ নাই; তিনি অবিনশ্বর সুতরাং অক্ষর। যেমন ভাষার বীজ অক্ষর, তেমনি সৃষ্টির বীজ ঈশ্বর। অনেক ভাষা বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু ভাষার মূলবীজ অক্ষর বিনষ্ট হয় না। ধ্বনি-প্রকাশক অক্ষর সাহায্যে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও ঈশ্বর বিদ্যমান থাকেন এবং আবার তিনি নূতন সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর সৎ অর্থাৎ নিত্য, তিনি সনাতন। ঈশ্বর চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান। ঈশ্বর আনন্দ অর্থাৎ সুখ। আবার তিনি এ সকলের সমষ্টি বা আধার।

অক্ষর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিবার এবং যে প্রকারে ইহার সৃষ্টি হইবে, তাহার যুগপৎ কল্পনা করিলেন। 'একোহম্, বহুস্যাম্।' শ্রুতি। সাধারণ জীব মনে কল্পনা করিয়া, সাধ্যানুযায়ী স্থূল শরীর দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করে। কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামাত্র তাঁহার কল্পনা ফলবতী হয়। ইচ্ছাময় ইচ্ছা করিবামাত্র নিরাকারা বিস্মৃতির সৃষ্টি হইল এবং পরমেশ্বর স্বীয় অক্ষর সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃ ও শক্তি তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে এক অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র যৌগিক মিশ্রণ সঞ্জাত হইল এবং ইহাতে অসংখ্য সৃষ্টিবীজ নিহিত হইয়া গেল। এইসকল বীজের পরিস্ফুটনে দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বোপলব্ধি হয়।

সৃষ্টিবীজধারিণী সচ্চিদানন্দ ভাবময়ী বিস্মৃতিই প্রকৃতি দেবী। ইঁহাতে ঈশ্বর শক্তি ও জ্যোতিঃ সঞ্চারিতা হওয়ায় ইনি অসীম শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালিনী। প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া আমরা তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মূলস্রষ্টা বিস্মৃতির গুণ সচ্চিদানন্দ ভাবের ঠিক বিপরীত এবং ঈশ্বর, সৃষ্টি বৈচিত্র্যরূপ লীলা করিবার জন্যই বিস্মৃতিকে বিপরীত গুণ সম্পন্না করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ব্রহ্মের যেমন অক্ষর ভাব, বিশুদ্ধ নিত্যভাব, পূর্ণ চৈতন্যভাব এবং পরমানন্দ ভাব, বিস্মৃতি তেমনি ক্ষয়কারিণী, পরিবর্ত্তন-কারিণী, সুষুপ্তিময়ী এবং বিষাদময়ী। অক্ষর সচ্চিদানন্দ প্রকৃত (Positive or real;) বিস্মৃতি অপ্রকৃত (negative or unreal)। সচ্চিদানন্দ ভাব অবিনশ্বর; এজন্য বিস্মৃতি বিরুদ্ধ-গুণস-ম্পন্না হইয়াও তাহা ধ্বংস করিতে পারে না। কিন্তু, দৃশ্যতঃ তাহার রূপান্তর এবং দৌর্ব্বল্য সাধন করে। বিস্মৃতি প্রভাবেই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই ইহার নাম জগৎ হইয়াছে। অন্তর্বাহ্যোভয় জগতেই অনবরত বস্তুর ভাব ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিস্মৃতি সচ্চিদানন্দ ভাবের আবরণ স্বরূপা এবং সচ্চিদানন্দের রূপ গুণ মগ্নমানা হইয়া, সচ্চিদানন্দ ভাবের উপর ভাসমানা রহিয়াছে। বিস্মৃতি সতত নিজ অঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে এবং আবরণের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমরা বিভ্রম বশতঃ, সচ্চিদানন্দের রূপ, গুণ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন বিবেচনা করি। বিস্মৃতি জীবের ঈদৃশ বিভ্রমোৎপাদন করিতেছে বলিয়া, জ্ঞানীগণ বিস্মৃতিকে 'মায়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্মৃতিই মৌলিক মিশ্রণের ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্, মৃত্তিকা অবস্থা বা রূপ উপলব্ধি করাইতেছে।

ভূবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ জড় পদার্থের রূপ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কত রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ভূগর্ভে কত কত বস্তু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া রূপান্তরে অবস্থিতি করিতেছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধরাতলে যে স্থান বিটপীনিচয় বা জীবকুল সমাক্রান্ত ছিল, এক্ষণে তাহা ভূগর্ভগত চাখড়ি স্তরে পরিণত হইয়াছে; যথায় মহাসমুদ্র ছিল, তথায় মরুভূমি বা মহাদেশ হইয়াছে। পূর্ব্বে সময়োপযোগী যে যে প্রকারের জীব বা উদ্ভিদ্ ছিল, তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া, এক্ষণে, কালধর্ম্ম বশে, নূতন নূতন প্রকারের জীব বা উদ্ভিদের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন বস্তুর সংযোগে কত কঠিন, তরল এবং বাষ্পীয় পদার্থ সঞ্জাত হইতেছে। ক্রম-পরিণতি অনু-যায়ী দৃশ্যমান জীব বা উদ্ভিদেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা জীবের গর্ভস্থ, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও জরা, এই সাত প্রকার অবস্থাভেদ দেখিতে পাই। আবার জীবের বাহ্যাবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত মান-সিক ভাবেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। জীবের এক রূপের অবসান হওয়া মৃত্যু এবং অন্যরূপ গ্রহণ জন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ঈশ্বর-শক্তি-প্রণোদিতা হইয়া, এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য, প্রকৃতি দেবী স্বীয় অবয়বভূত পঞ্চ-মহাভূত লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন; পঞ্চভূতের বীজরাজি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের যোগ, বিয়োগ, হরণ, পূরণ ইত্যাদি দ্বারা অসংখ্য ভাব, অসংখ্য রূপ, অসংখ্য অবস্থা এবং অসংখ্য আকৃতির গঠন করিতেছেন। এত পরিবর্ত্তন স্বত্বেও, কোনও বস্তু বিনষ্ট হয় না; ঐ সকল পরিবর্ত্তন মধ্যদিয়া বস্তু গমন করে মাত্র। আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তুর ভাব, অবস্থা বা আকারের বিলোপ দেখিলে, ঐ বস্তু বিনষ্ট হইল বলিয়া মনে করি। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখি-লেই প্রতীতি হয়, নৈসর্গিক নিয়মে ঐ বস্তু অন্য ভাব, অবস্থা বা আকারে নীত হইয়াছে।

অন্যপ্রকারে আলোচনা করিয়া দেখিলেও আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত ভাব এবং বিস্মৃতির অপ্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ব্রহ্ম সনাতন; তাঁহার কথ-নও লয় হইবে না; এজন্য তিনি প্রকৃত বা সত্য। ঈশ্বর বিস্মৃতির মধ্য দিয়া স্বীয় জ্যোতিঃ ও শক্তি চালনা করিয়া, সৃষ্টি-লীলা সম্পাদন করিবেন বলিয়া বিস্মৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার লীলা সম্পূর্ণ হইলেই তিনি বিস্মৃতির লয় করিবেন। অতএব বিস্মৃতি সনাতনী নহে; কল্পকাল-স্থায়িনী। এজন্য বিস্মৃতি অপ্রকৃত। তথাপি বিস্মৃতি 'অবস্তু' পদবাচ্যা নহে। ঈশ্বর বিস্মৃতির মধ্য দিয়া স্বীয় শক্তি চালনে সৃষ্টিলীলা সমাধান করিতেছেন বলিয়া, সৃষ্টজগৎ বিস্মৃতিময় এবং সৃষ্টের বিস্মৃতিকে 'অবস্তু' বলিবার অধিকার নাই। যতকাল সৃষ্টি আছে,

ততকাল বিস্মৃতিরও বিদ্যমানতা আছে। অক্ষর সচ্চিদানন্দ শক্তি সার বস্তু এবং তদ্বিপরীত গুণ-সম্পন্না বিস্মৃতি অসার বস্তু। ফলতঃ, জ্ঞানীগণ 'সারহীন' অর্থে বিস্মৃতিকে 'অবস্তু' বলেন। এই দুই বিপরীত বস্তুর সম্মিলনে প্রকৃতির সৃষ্টি হওয়ায়, একদিকে যেমন সৃষ্টি সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে তেমনি ভেদ ভাবের অনুভূতি হয়। বিস্মৃতির বিপরীত গুণ সচ্চিদানন্দ ভাবে মিশ্রিত হওয়ায়, উভয় গুণের আতিশয্য প্রশমিত হইয়া প্রকৃতির সাম্যভাব সমাধান হইয়াছে এবং সৃষ্টিলীলা এরূপ সুচারুভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে। ভগবানের অত্যুজ্জ্বল সচ্চিদানন্দভাব বিস্মৃতি বিলেপনে বিমলিন না হইলে, সৃষ্টজীব তাহা সহ্য করিতে পারিত না। এরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে, যে যে স্থলে ঐশীশক্তি বিস্মৃতি বিমুক্তা হইয়া জীব সমক্ষে সমুদিতা হইয়াছেন, তত্তৎস্থলেই জীব তাহা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারে নাই। বীর অর্জ্জুন ক্ষণিক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াই, ভগবানকে ঐ মূর্ত্তির প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত নিকেতনে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটাবস্থায় ভক্তবৃন্দকে কিয়ৎক্ষণ পবিত্র আনন্দ সুধা বিতরণ করিলে, ভক্তগণ তাহা সহ্য করিতে অপারক হইয়া ভগবানকে তাঁহার মৌলিক ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে উপরোধ করেন। আবার ঐশীশক্তির সহিত মিলিতা না হইলে, ধরাতলে বিস্মৃতি প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারিত না। আমরা কেবল মাত্র বিস্মৃতিগ্রস্ত কোনও জীবিত প্রাণীর কল্পনা করিতে পারি না।

বিস্মৃতি বিপরীত গুণময়ী হইয়াও, সৃষ্টিরক্ষা বিষয়ে, সচ্চিদানন্দ ভাবের বিরুদ্ধাচারিণী নহে; প্রত্যুত সহায়তাকারিণী। সচ্চিদানন্দভাব ও বিস্মৃতির মিশ্রণের অনুপাতসর্ব্বত্র সমান নহে। ফলতঃ, যখন যেখানে যে পরিমাণে মিলিতা হওয়া আবশ্যক, বিস্মৃতি তখন সেখানে ঠিক সেই পরিমাণে সচ্চিদানন্দ ভাবের সহিত মিলিতা হইয়াছে। এজন্য, এই মিশ্রণে কোথাও সচ্চিদানন্দ ভাবের প্রাখর্য্য এবং কোথাও বা বিস্মৃতির প্রাখর্য্য উপলব্ধি হয়। যদিও বিস্মৃতি-কবল হইতে সূক্ষ্ম শরীরের উদ্ধার সাধন করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তথাপি বাহ্য জগতে, এই অনুপাত-বৈষম্যই প্রকৃতির সুব্যবস্থার কারণ। সৃষ্ট বস্তু নিচয়ের কোনও কোনওটী অধিক পরিমাণে প্রকৃত ভাবাপন্ন এবং কোনও কোনওটী অধিক পরিমাণে অপ্রকৃত ভাবাপন্ন হওয়ায়, জগৎ এরূপ সুখময় হইয়াছে। জগতে প্রত্যেক বস্তুরই বিপরীত বস্তু আছে এবং যতক্ষণ এই দুই বিপরীত ভাবাপন্ন বস্তুর মিলন না হয়, ততক্ষণ নৈসর্গিক সাম্যবিকার পরিলক্ষিত

হয়। শরীরে রোগ উপস্থিত হইলে জীব আকুল হইয়া পড়ে ; কিন্তু রোগের বিপরীত গুণ ঔষধ সেবন দ্বারা জীব পুনরায় প্রশান্ত হয়। বাহ্য-জগতে যত প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অনুমিত হয়। পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বৈদ্যুতিক শক্তি মধ্যে দুই প্রকার প্রবাহ বিদ্যমান আছে। একটী প্রকৃত বা যোগাত্মক (positive) এবং অপরটী তদ্বিপরীত ও অপ্রকৃত বা বিয়োগাত্মক (Negative)। প্রকৃত বা যোগাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তি, অপ্রকৃত বা বিয়োগাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত মিলিত হইবার জন্য এরূপ বলে প্রবহমান হয় যে, মিলন পথে যে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হউক না কেন, তাহা অপসারিত করিয়া ফেলিবে এবং দুই বৈদ্যুতিক শক্তির যতক্ষণ মিলন না হয়, ততক্ষণ নৈসর্গিক সাম্য সংস্থাপন হয় না। আমরা, সাধারণতঃ, কত নিত্য ব্যবহার্য্য বিপরীত গুণাবলম্বী বস্তু দ্বারা শরীর পোষণ করিতেছি। অগ্নি জলে নির্ব্বাপিত হয়, লবণ অম্লে শমিত হয়, ইহা আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এমন কি, পরস্পর বিপরীত গুণাবলম্বী পদার্থ নিচয় দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে কত শত বৈপরীত্যদ্যোতক পদার্থের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের অগণন বস্তু নিচয় মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মানবের স্থূলজ্ঞান গোচরীভূত হয়। প্রকৃতির এই ধর্ম্মানুসারে জীবের স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদ হইয়াছে। পুরুষের প্রকৃত ভাব ও স্ত্রীর অপ্রকৃত ভাব সম্মিলনে জীব-সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। দিবা-রাত্রি, শ্রম-নিদ্রা, শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষ-ভেদ, ঋতু-পর্য্যায় প্রভৃতি যাবতীয় নৈসর্গিক সুব্যবস্থা ভগবৎ প্রদত্ত উল্লিখিত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইতে সঞ্জাত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃ ও বিস্মৃতির সংমিশ্রণে জীবান্তঃকরণ গঠিত হওয়ায়, জীব সৎ বা যোগাত্মিকা (positive) ও অসৎ বা বিয়োগাত্মিকা (negative) প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবগণ যোগাত্মিকা প্রবৃত্তি বশে, যাহাতে সংসারের উপকার হয়, এরূপ সুকার্য্য সাধন করে এবং বিয়োগাত্মিকা প্রবৃত্তি বশে সংসারের অনিষ্টকর দুষ্কর্ম্মে রত হয়। সুতরাং জীবক্রিয়া দ্বারা অন্তর্জগত পরস্পর বিপরীত দুই ভাবে বাহ্যজগতে প্রতিফলিত হয়। সংসারে সুক্রিয়া প্রবাহ পার্শ্বে দুক্রিয়া প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া, মানব হিতাহিত, পাপপুণ্য, বিনয় কার্কশ্য, দয়াপারুষ্য, সারল্য কাপট্য, ঔচিত্যানৌচিত্য প্রভৃতি বিচার দ্বারা ঈশ্বর ও তৎপ্রেরিত ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ, মানসিক উন্নতি সহকারে, মানব

যখন আত্মস্বরূপ ও বিস্মৃতিরস্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন, তখন বিস্মৃতির পাশ হইতে আত্মবিমোচন করিয়া, স্বয়ং যে পরম বস্তুর অংশ, তাঁহাতে মিলিত হইবার চেষ্টা করেন। যিনি সৃষ্ট জগতের বিধান কর্ত্তা, সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত পরমেশ্বর কেবল মঙ্গলময় এবং স্বপ্রণীত বিধানাবলীর অনধীন। তিনি হিতাহিত, পাপপুণ্য এবং এমন কি, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত এবং তৎ সমস্ত দ্বারা আবিষ্ট হন না। জীবের মঙ্গলোদ্দেশ্যে করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা যে সকল পবিত্র কার্য্য সাধন করেন, তাঁহার পূতাভিপ্রায় বিদিত না হইয়া, মানবগণ মোহবশে যে তাহাতে কাপট্য, পক্ষপাতিত্ব, অযথার্থত্ব, প্রভৃতি দোষারোপ করে, তাহা তাহাদের ভ্রান্তি, পাপ ও ধৃষ্টতা।

—:০:—

স্থূল বিকাশ।

কালসৃষ্টি—সৃষ্টিকাল।

বহির্জ্জগতে আকাশাদি ক্রমে, পূর্ব্বোল্লিখিত মূল যৌগিক বস্তুর যে বিকাশ হইয়াছে, তাহাই সৃষ্টির স্থূল বিকাশ। এই বিকাশ পর্য্যায়ে, বিস্মৃতি যেমন ক্রমশঃ গাঢ়তরা হইয়া আসিয়াছে, অন্তরস্থ সচ্চিদানন্দ ভাব তেমনি ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া, অবশেষে সুষুপ্তাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ক্রমশঃ, সচ্চিদানন্দের নিত্যত্ব অস্তিত্বে এবং চৈতন্য ও আনন্দভাব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ নিচয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপে নিত্যত্ব ও অস্তিত্বের বিভিন্নতা হইয়াছে। নিত্যত্ব চিরবিদ্যমানতা এবং অস্তিত্ব নিরূপিত সময় ব্যাপী বিদ্যমানতা। আবার এই প্রভেদ নির্ণয়ের জন্য কাল বা সময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কাল গণনা দ্বারা আমরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও সৃষ্ট-জগতের অস্তিত্বের পার্থক্য অনুভব করি। কারণ, সাময়িক পার্থক্য ভিন্ন এই দুই অস্তিত্বে আর কোনও প্রভেদ নাই। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান আছেন এবং জগতের লয় হইলেও, তিনি চিরতরে থাকিবেন, ইহা আমরা কালের মধ্য দিয়া বোধগম্য করিতে পারি বলিয়া, ঈশ্বরকে নিত্য বিবেচনা করি। সৃষ্টকালের ভ্রান্তি বিস্মৃতি নিবন্ধন, স্থূল জ্ঞানে, ঈশ্বরের নিত্যত্ব বোধের সহিত আমাদের কালের নিত্যত্বানুভূতি অর্থাৎ যাবৎ ঈশ্বর আছেন, তাবৎ কালও আছে, এইরূপ প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ, ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানগম্য কালের পার। ঈশ্বর যেমন

জগতের অপরাপর বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি যুগপৎ, কালেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কাল, সৃষ্ট-জগতের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যজগতের অপরাপর বস্তু যেমন অন্তর্জগৎ গ্রাহ্য হইবার জন্য মূল যৌগিক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কালও সেইরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইবার জন্যই, মূল বস্তু হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। যখন বিরাট পুরুষ সৃষ্টিবীজ স্বীয়াভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কালেরও অবসান হইবে। কোনও কোনও দার্শনিক সৃষ্টকালের 'খণ্ডকাল' এই আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মহাকাল ঈশ্বর হইতে জগদ্‌গ্রাহ্য খণ্ডকাল সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং জগতের অবসানে পুনরায় সেই নিত্যকালে বিলীন হইবে। যদিও ইহা দ্বারা ঈশ্বরের নিত্যত্ব এবং সৃষ্টকালের অস্তিত্বের পার্থক্য সূচিত হইতেছে, তথাপি 'খণ্ড' এই শব্দের প্রয়োগ সুখকর নহে। 'খণ্ড' শব্দ বৈচ্ছিন্ন্যদ্যোতক এবং 'খণ্ডকাল' বাক্য 'কাল ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জগতে পৃথক্ রূপে অবস্থিতি করিতেছে' মনে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের আনয়ন করে। ঈশ্বর হইতে সমস্ত বস্তুই সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি যেমন কালের মহাকাল, তেমনি সমস্ত বস্তুরই মহাবস্তু। তিনি জগতের আদি কারণ। তাঁহার জ্যোতিঃ ও শক্তি হইতে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহাতে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং জগৎ তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। এজন্য সৃষ্টি উদ্যোগে ঈশ্বর কাল সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন এবং তৎ কর্ত্তৃক কাল সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বলাই সঙ্গত।

আমরা গ্রহগতি-জনিত প্রাকৃতিক চিহ্ন দ্বারা, অব্দ, মাস, পক্ষ, অহঃ, পল, বিপল ইত্যাদি মানে পুরাপ্রবর্ত্তিত কাল-বিভাগ-প্রণালী অবলম্বনে, কালের পরিমাপ করিয়া থাকি। গণিত শাস্ত্রের অঙ্ক-গণন কৌশলে এই সকল বিভাগের যোগ বিয়োগাদির দ্বারা অপরাপর বিভাগেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর বিভাগ পরিমাণ জন্য আধুনিক সময়ে ঘড়ি নামক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড প্রভৃতি ক্রমে সময়ের মাপ করা যায়। সভ্যতা সূর্য্য যেমন সর্ব্ব প্রথমে হিন্দুগগনে উদিত হইয়াছে, তেমনি অন্যান্য গরীয়সী চিন্তার সহিত, কাল পরিমাণ চিন্তাও প্রথমে হিন্দু পণ্ডিত মণ্ডলীর মনে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অন্যান্য দেশীয় পুরাণ-নিচয়, যদিও; ভারতীয় পুরাণমালার অনেক পরে বিরচিত হইয়াছে, তথাপি, ঐ সকল পুরাণে ভারত পুরাণনিবদ্ধ সৃষ্টিকাল পর্য্যালোচনার ন্যায় কোনও সু-সংস্কৃত সৃষ্টিকাল

বিচারের অবতারণা দেখা যায় না। পৌরাণিক যুগের বহু পূর্ব্বে, চিন্তাশীল হিন্দুগণ যে বর্ষাদি ক্রমে সময় বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সু-প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, হিন্দু পুরাণকারগণ তত্তৎবিভাগমানাবলম্বনে, সৃষ্টিকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। অধুনাতন তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ, কোনও পুরাতন বস্তর আবিষ্কার সাধন করিয়া, তাহার উৎপত্তি সময়ের তুলনায় সৃষ্টি-কালাবধারণ প্রয়াসে কোনও এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন; কিন্তু তদ-পেক্ষা প্রত্নতর কোনও বস্তু আবিষ্কৃত হইবা মাত্র তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়। এইরূপে অবনীতলে যদিও, সৃষ্টিকাল নিরূপণোদ্দেশে বহু-তর মতের আবির্ভাব হইয়াছে, তথাপি ইহাদের একটীও জীবসৃষ্টিকালোর্দ্ধে উপনীত হইতে সমর্থ হয় নাই। আদি সৃষ্টিকাল লক্ষ্য করা দূরে থাক, আধুনিক মতাবলী ধরণী সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেও পরাঙ্মুখ। এই সমস্ত কারণে, সৃষ্টিকাল নির্ণয় কৌতূহল চরিতার্থ করণমানসে, ভারতীয় পুরাণের মুখাপেক্ষী হওয়া ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই।

হিন্দু পুরাণে আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মার এক দিবস আমাদের ৪৩২ কোটী বৎসরের সমান এবং ব্রহ্মার যামিনীও তৎপরিমিতা। সুতরাং ৮৬৪ কোটী বৎসরে ব্রহ্মার একদিন বা অহোরাত্র হয়। এইরূপ ৩০ দিনে মাস এবং বার মাসে বৎসর ধরিয়া আমাদের ৩১১০৪০০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক বৎসর; এইরূপ শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু অর্থাৎ এইরূপ শতবর্ষ ঈশ্বর ব্রহ্মাস্বরূপ বিরাজ করিয়া সৃষ্টিলীলা সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে ব্রহ্মা পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিয়া, একপঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতে ১৫৫৫২০০০০০০০০০০ বর্ষকাল অতীত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও প্রায় এতৎ-পরিমিত কাল সৌরজগৎ বর্ত্তমান থাকিয়া, অবশেষে ঈশ্বরে বিলীন্ হইয়া যাইবে। ঈশ্বর সৃষ্টি ঈশ্বরে বিলীন হওয়া 'প্রলয়' নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বেও সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টি পদ্ধতি অনুসারে জগদীশ্বর বর্ত্তমান সৃষ্টি করিয়াছেন, জ্ঞানীগণ এইরূপ আভাষ প্রদান করেন।

পঞ্জিকাকারগণের গণনানুযায়ী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের স্থিতিকাল অবলোকন করিয়া, কেহ কেহ, হয়ত, ব্রহ্মাণ্ডের উল্লিখিত স্থিতিকাল সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন। আমাদের দুইটী বিষয় মনে রাখা উচিত। প্রথমতঃ, মানব সৃষ্টির পর হইতে মানব কর্ত্তৃক যুগ পর্য্যায় গণিত হয়। তৎপূর্ব্বকাল মানব গণিত যুগান্তর্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, এক একটী যুগ

ভগবানের অভিপ্রায়ানুসারে নির্দ্দিষ্টকাল অবস্থিত থাকিয়া, লয়প্রাপ্ত হয় এবং ইহাই খণ্ড বা আংশিক প্রলয় স্বরূপ গণ্য হয়। ব্রহ্মাণ্ড স্থিতিকাল মধ্যে, মানব সৃষ্টির পর, যুগচতুষ্টয় আবর্ত্তন ক্রমে একাধিকবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে।

ব্যাপ্তি, স্থান ও দূরত্ব।

কালের সহিত ব্যাপ্তিরও সৃষ্টি হইয়াছে। কাল এবং ব্যাপ্তি ঈশ্বর শক্তির আদি উদ্দাম প্রসার। কাল এবং ব্যাপ্তি বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্র স্বরূপ। সৃষ্টজগৎ কাল এবং ব্যাপ্তি গাত্রে বিরাজ করিতেছে। সচ্চিদানন্দভাব বিস্মৃতি সংস্পর্শে আসিবা মাত্র, এই মূল যৌগিক বস্তু কাল ও আকাশময় শরীর ধারণ করিল এবং তাহাতে পর্য্যায় ক্রমে সৃষ্টির উদয় হইয়াছে। কালদ্বারা যেমন নিত্যত্বা-স্তিত্ব পার্থক্যোপলব্ধি হয়, ব্যাপ্তিদ্বারা সেইরূপ অনন্ত সান্তের বা অসীমত্ব এবং সসীমত্বের পার্থক্যোপলব্ধি হয়। কালের ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ডোদরা বিরাট্‌ব্যাপ্তি যদিও অনন্তা প্রতীয়মানা হয়, তথাপি ইহা সান্তা। কেননা, ঈশ্বর স্বীয় শক্তিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার জন্য স্রষ্টা ব্যাপ্তি স্বরূপ তাহার প্রসারণ করিয়াছেন। সৃষ্ট-কালের ন্যায় ইহা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগম্যা এবং পরিমেয়া। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যেমন কাল আয়ত্ত করিতে পারেন, তেমনি, ব্যাপ্তিও আয়ত্ত করিতে পারেন। যোগীগণ যে কোনও স্থানে থাকিয়া, পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাহা দেখিতে পান। অনেকে যোগবল পরীক্ষা করিবার জন্য, যোগীগণকে আমা-দের দেশের কোনও স্থানে রাখিয়া, তাঁহাদের দ্বারা সুদূর ইংল্যাণ্ড, এমেরিকা প্রভৃতি স্থানের সংবাদ আনয়ন করাইয়াছেন। আমাদের সাধ্যাতীত বিবেচিত হইলেও সুবিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর যেরূপ পরিমিত হইয়াছে, সেইরূপ, মহাত্মা-গণ, এই অনন্ত প্রতিম সর্ব্বব্যাপী প্রসারণের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে ব্যাপ্তি দুই প্রকার। ব্যাপ্তিগুণ ইহার সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থান দূর-ত্বাদি ইহার স্থূল শরীর। ব্যাপ্তিগুণে, কোনও স্থানে কোনও বিষয়ের আবির্ভাব হইলে, উহা সমন্ততঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ ব্যাপ্তি হইতেই আমাদের স্থান ও দূরত্ব বোধের সূত্রপাত হয়। বিন্দুসমষ্টি রেখা। আমরা গগনে রেখা কল্পনা করিতে পারি। রেখা সমষ্টিই স্থান; সুতরাং আকাশ পটে স্থানবোধও হইতে পারে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণের সৃষ্টিদ্বারা গগনে স্থানবোধ আরও স্পষ্টতর হইয়াছে।

আমরা আকাশে গ্রহ উপগ্রহগণের স্থিতিস্থান এবং পরস্পর হইতে পরস্পরের দূরত্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমরা, স্থূলতঃ, কোনও একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সীমাবিশিষ্টা ব্যাপ্তিকে 'দূরত্ব' নামে অভিহিত করি। সূর্য্য এতদূরে আছে বলিতে, আমরা দৃশ্যমান সূর্য্য এবং আমাদের অবস্থিতি স্থল এতন্মধ্য-বর্ত্তী ব্যাপ্তির ধারণা করি। কোনও প্রকার সীমা ব্যতীত দূরত্ব ধারণা অসম্ভব। দূরত্বের কল্পনা করিতে গেলে, অন্ততঃ, একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা আবশ্যক। পাশ্চাত্য ভাষায় মন হইতে কোনও বিষয় দূরে থাকার উক্তি আছে। এস্থলে যদিও, একদিকে সীমানির্দ্দেশ নাই, অন্যদিকে 'মন' নির্দ্দিষ্ট সীমা রহিয়াছে। সেইরূপ অনিশ্চিত দূরবর্ত্তী ধ্বনি বলিতেও, আমাদের অবস্থিতি স্থলরূপ নির্দ্দিষ্ট সীমা আমাদের মনে জাগরূক হয়। কতদূর নির্ণয় করিতে গেলে, উভয় সীমাই নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

আকাশ ক্রমশঃ, যত স্থূল হইয়া মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি হইয়াছে, স্থান ও দূরত্বানুভূতি তত গাঢ়তরা হইয়াছে। আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি বলিয়া, সলিল এবং মৃত্তিকা এই দুই পদার্থে, স্থূলভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে, আমাদের স্থান ও দূরত্ব বোধ হইয়া থাকে। আমরা সলিল ও মৃত্তিকাতল-ব্যাপ্তির যে কোনও অংশ যে কোনও আকারে সীমাবদ্ধ করিয়া, স্থান বোধ করিতে পারি, কিম্বা এক নির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে অপর নির্দ্দিষ্ট স্থলের দূরত্ব সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারি। মানব শিশুকাল হইতে ব্যাপ্তি মধ্যে হস্ত পদাদির সঞ্চালন দ্বারা স্থান ও দূরত্ব বোধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরিমাপের সুবিধার জন্য, আমরা স্বাভাবিক বা মানব গঠিত কৃত্রিমাকারবিশিষ্ট জড় পদার্থের ব্যাপ্তিকে দৈর্ঘ্য,বিস্তার, বেধ, তল বা পৃষ্ঠ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি এবং পদার্থ গত মোট বাহ্য ব্যাপ্তির পরিমাণ যাহা আমরা অবধারণ করিতে পারি, বর্গকালি, ঘনকালি, ইত্যাদি সংজ্ঞায় তাহার পরিচয় দিয়া থাকি।

মানব সমাজ সময়ের সহিত ব্যাপ্তি মিশ্রিত করিয়া, 'দূর অতীতকাল', 'দূর ভবিষ্যৎ কাল,' 'অনেক কাল' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুতরাং স্থূল ব্যাপ্তির দুই প্রকার ভাব আমাদের মনে উদিত হয়। যথা স্থানগতা ব্যাপ্তি এবং কালগতা ব্যাপ্তি। কালগতা ব্যাপ্তি কালের সহিত পরিমিতা হয়। পুরাকালে যেমন্ কাল পরিমাপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, সেইরূপ, স্থানগতা ব্যাপ্তি পরিমাপ প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি তাহা প্রচলিত আছে। আমরা হস্ত, পদ বা অঙ্গুলি পরিমাণ আদর্শ করিয়া, তাহার সঙ্কলন পূরণাদি

জনিত মানে, ইঞ্চ, অঙ্গুলি, বিঘৎ, ফুট, হস্ত, গজ, মাইল, ক্রোশ, যোজন, ইত্যাদি প্রকারে স্থান বা দূরত্বের পরিমাপ করিয়া থাকি।

ব্যাপ্তি বলের অপচয় করে। স্থূল উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, বায়ুপ্রবাহ কিম্বা জলপ্রবাহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, তাহার বেগবলের হ্রাস হইয়া যায়। জড় পদার্থের অণু সকল সংহতি প্রভাবে যেমন একত্রীকৃত হয়, ব্যাপ্তি প্রভাবে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন বা বিমুক্ত হয়। অণু সকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইলে, জড় পদার্থ যেমন দৃঢ় হয়, ব্যাপ্ত বা বিচ্ছিন্নাণু পদার্থ সেরূপ দৃঢ় নহে। বর্ত্তমান স্বার্থোপাসন যুগেও, একতা নিবন্ধন অপরাপর দেশের সামাজিক সংশক্তি এবং তদভাবে ভারতের সামাজিক দৌর্ব্বল্য সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যষ্টিগুচ্ছের উদাহরণে পুত্রগণের প্রতি মুমূর্ষু বৃদ্ধের উপদেশাখ্যান অনেকে অবগত আছেন। গুচ্ছবদ্ধ যষ্টি ভগ্ন হয়না। কিন্তু ব্যাপ্ত করিয়া, গুচ্ছ বিচ্ছিন্ন এক এক গাছি যষ্টি অনায়াসে ভঙ্গ করা যায়। আমরা ভাষাদ্বারা মনোভাব ব্যক্ত বা প্রকাশ করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষা মনোভাবের ব্যাপ্তি। ভাষার বিস্তৃতির সহিত মনোভাবের অতিব্যাপ্তি হইলে, তন্মধ্যে মনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না অর্থাৎ ভাবার্থ বল কমিয়া যায়। আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি, বহু ভাষী বা বাচালগণের কথার 'বাঁধুনী' (Relevancy or coherance) নাই। বাচালগণ যে অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কথা কহে, বাক্যে মনোভাবের অতিব্যাপ্তি হেতু সে অর্থবল কমিয়া যায় ; তাহাদের বিস্তৃত বাক্যমালা হইতে সহজে সে অর্থের অনুভূতি হয় না। এজন্য কোনও বিষয়ের বর্ণনায়, যে পরিমাণ ব্যাপ্তিদ্বারা সেই বিষয় পরিস্ফুট হয়, আমরা তৎপরিমাণ বর্ণনাই হৃদয়গ্রাহ্য করি এবং তদতিরিক্ত হইলে, তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ এবং অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। কাব্যরসগ্রাহীগণ বিদিত আছেন, যে কাব্যে ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য (Equibalance) আছে, সেই কাব্যই উৎকৃষ্ট। এই গুণ আছে বলিয়া, কালিদাস, হোমার, হাফেজ, সাদি, সেক্স-পীয়র প্রভৃতি কবিগণের কাব্য গ্রন্থ এত মধুর। হাফেজ এবং সাদির গ্রন্থনিচয়ে কাব্যরস অপেক্ষা ধর্ম্মভাব অধিক বলবান।

যাঁহারা অধুনা, সমাজে পণ্ডিত ও সুবক্তা বলিয়া গণ্য হন, তাঁহাদের বক্তৃতা মালা আলোচনা করিয়া দেখিলেও, উল্লিখিত নৈসর্গিক নিয়মের সত্যতা প্রতীয়মানা হয়। বাগ্মীগণ সালঙ্কারা বাক্যব্যাপ্তি দ্বারা, শ্রোতৃ-বর্গের মনে বোধস্তরের নিম্নবর্ত্তী ভাবনিচয়ের (feelings) উদ্দীপনা

করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দুর্ব্বল অর্থযুক্তা চাকচিক্যময়ী ভাষা যদিও মানবের মানস স্তর অধিকার করিতে পারে, তথাপি বোধস্তরে কোনও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। ঐন্দ্রজালিকগণ যতক্ষণ কুহকী ক্রিয়ানিচয় সম্পন্ন করে, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দ, চমৎকৃত ভাবে, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করে। কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বুঝিতে পারে, ঐ সমস্ত ক্রিয়া অপ্রকৃত; বাজীকরগণের হস্ত কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে মাত্র। বাগ্মীগণের বাগাড়ম্বরেও, সেইরূপ, শ্রোতৃবৃন্দ শ্রবণ সময়ে শ্রুতিসুখজনিত আহ্লাদ অনুভব করে; কিন্তু ক্ষণিক আলোচনা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারে, উহা সারহীন অভ্যাসজাত বাক্যবিন্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ, বাগ্মী ও তার্কিকগণ বাক্যপ্রভাবে সুনাম অর্জ্জন এবং স্ব স্ব মতের প্রাধান্য স্থাপন কল্পে বক্তৃতা বর্ষণ করেন; কোনও একটী গূঢ় বিষয় সুযুক্তি সম্মতরূপে বিচার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। এরূপ বিচার চিন্তা দ্বারাই সমাহিত হইতে পারে। স্বীয়মত ভ্রান্ত হইলেও, বাগ্মী ও তার্কিক তাহার সমর্থন এবং বিরুদ্ধ পক্ষীয় মত সত্য হইলেও, বাগস্ত্র দ্বারা তাহার ছেদন প্রয়াসী হন। এজন্য তাঁহাদের বক্তৃতা শূন্য গর্ভা। কেহ মনে না করেন, যাঁহারা বাক্য দ্বারা সত্য বিস্তার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধরাধামে প্রেরিত হন, তাঁহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের বাক্যামৃত সত্যপূর্ণ; কেননা সত্যবিতরণ জন্যই ইঁহারা বক্তৃতা প্রদান করেন। ইঁহাদের স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষা জীবহৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। যদিও ইঁহারা স্বভাবজ সুপণ্ডিত, তথাপি, পাণ্ডিত্যাভিমানী নহেন। ইঁহাদের বক্তৃতা তর্ক মিশ্রিতা নহে; কেননা ইঁহারা যাহা বলেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত এবং তাহার কোনও বিরুদ্ধ মত হইতে পারে না।

উচ্চ ভাবের ভাবুকগণ তাঁহাদের ভাব বা চিন্তার বিকাশ অনুমোদন করেন না। মুনিগণ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্ম চিন্তা করিতেন। চিত্তেই তাঁহাদের চিন্তারাজী আবদ্ধ থাকিত; বাক্যে তাহার ব্যাপ্তি বা বিকাশ হইত না। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবের ব্যয় হইত না; প্রত্যুত বল সঞ্চিত হইত বলিয়া তাঁহারা তাদৃশ জ্ঞান শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। মন্ত্র ব্যাপ্ত বা ব্যক্ত হইলে, নিষ্ফল হইয়া যায়, আমাদের দেশে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে। রাজনীতিজ্ঞগণ সহজেই এ প্রবাদের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন। গুরু শিষ্যকে অতি গোপনে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং যাহাতে সে মন্ত্র দুগাক্ষরে প্রকাশিত না হয় এরূপ উপদেশ দেন। এইজন্যই প্রাচীনকালে, [illegible] শ্রুতি ও স্মৃতি প্রথার

ততদূর পক্ষপাতী ছিলেন। অবশেষে লোকশিক্ষাদান জন্য, জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যখন লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা হইয়াছিল, তখনও, শিক্ষকগণ সতর্কতা সহকারে অতি সংক্ষেপে সেই সমস্ত বিষয় গ্রন্থগত করিয়াছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণ লিপিবিদ্যাবিশারদ হইয়াও, গূঢ় বিষয় নিচয় শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে গ্রথিত করিয়া রাখিতেন; কদাচ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন না। বাক্য যেমন মনোভাবের ব্যাপ্তি, অক্ষর বিন্যাস বা লিখন, তেমনি, বাক্যের ব্যাপ্তি। কোনও বিষয় বলায় যত ব্যাপ্ত হয়, লিখনে ততোধিক ব্যাপ্ত হয়। সৃষ্টিপ্রকরণে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চগুণ পর্য্যায়ে, সচ্চিদানন্দ ভাবের ক্রমাধিক ব্যাপ্তি ও বলক্ষয় হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বাক্য শব্দাত্মক এবং অক্ষর বা বর্ণ রূপাত্মক; সুতরাং বচন অপেক্ষা লিখন অতিশয় ব্যাপ্ত।

মন ব্যাপ্ত হইলে, মানসিক বলের হানি হয়, দৈনিক ক্রিয়া কলাপে প্রত্যেকেই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। মন যতই উদার বা ক্ষমতাশালী হউক না কেন, ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, তাহার স্বাভাবিক ধারণা শক্তির খর্ব্বতা জন্মে। দুরূহ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে মনের একাগ্রতা (concentration) সম্পাদন আবশ্যক। মানসিক দৌর্ব্বল্যের তারতম্য প্রদর্শন জন্য, আমরা সাধারণতঃ, মনোযোগিতার বিপরীত 'অনবধানতা', 'অনাবিষ্টতা' বা 'অমনোযোগিতা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ দিতে গেলে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনকে একত্র করিয়া, সেই বিষয়ের সহিত যুক্ত বা সম্পূর্ণরূপে তদভিমুখ করিয়া দিতে হয়। কর্ত্তব্যের প্রতি মন না রাখিয়া বা কিঞ্চিৎ পরিমাণে রাখিয়া, ক্ষণিক অপর দিকে মন বা মনের অধিকাংশ দেওয়া 'অনবধানতা।' অনবধানতা বশতঃ, কার্য্যকারী ব্যক্তির ক্রিয়মান কর্ম্মে ভ্রম, প্রমাদ বা ত্রুটী সংঘটিত হইয়া থাকে। অনবধানতা হেতু অনেক সুলেখকের লিপিবিভ্রাট এবং অনেক সুগায়কের তালবিচ্যুতি দেখা যায়। চঞ্চলমনা ব্যক্তি মাত্রেই অনবধান। মনোযোগিতার অভাব 'অমনোযোগিতা' বা 'অনাবিষ্টতা' এবং ইহা অনবধানতা অপেক্ষাও গুরুতর দোষ। চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত মনকে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপানে আনয়ন না করা 'অমনোযোগিতা' বা 'অনাবিষ্টতা'। মনের ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও, অনাবিষ্ট বালক বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে পারে না; কিম্বা অমনোযোগী ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে না। কুবিষয়াসক্ত মানব, পণ্ডিত হইলেও, ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পাণ্ডিত্য নিবন্ধন, যদিও, অনেকে হিতাহিত, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম

প্রভৃতি বিষয়ে তর্ক এবং উচ্চাঙ্গীন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তথাপি, তাঁহাদের মন সংসারে ব্যাপ্ত এবং স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, বিত্ত, যশঃ, মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত থাকায়, পরম তত্ত্বাভিমুখ হইতে পারে না। সাংসারিক পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র পাঠকল্পে, তাহার ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দার্থ লইয়া আলোচনা করেন; শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। ফলতঃ, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। পরমার্থ বিদিত হওয়া জ্ঞান; পক্ষান্তরে সাংসারিক বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন পাণ্ডিত্য। পণ্ডিতগণ ন্যায় দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ সূত্র বা বাক্য আবৃত্তি করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করেন; কিন্তু শাস্ত্র মতাবলম্বী হইয়া কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। মানসিক ব্যাপ্তি হেতু দুর্ব্বলমনা মানব বিশ্বাসহীন হয় এবং বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন ঋষিগণ নবদ্বার-নিবিদ্ধবৃত্তি হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন এবং নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতেন। বাহ্যজগতে আদৌ তাঁহাদের মনের প্রসার হইত না। এইরূপে মানসিক বলাধান করিয়া, পরমচিন্তা দ্বারা, তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেন। তাঁহাদের মানস বুদ্ধিগত এবং বুদ্ধি চিত্তগতা হইয়া মানসিক তিন স্তরের একীকরণ সমাহিত হইত।

যেহেতু, ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবার জন্য সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, অতএব সৌক্ষ্ম অপেক্ষা ব্যাপ্তি অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বাহ্যজগতে সূক্ষ্ম পদার্থ অপেক্ষা স্থূল পদার্থ সহজে ইন্দ্রিয় গোচরীভূত হয়। একটী ক্ষুদ্রায়তন বীজ আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ বীজ ব্যাপ্ত হইয়া, অঙ্কুরাদি পর্য্যায়ে, যখন মহীরুহে পরিণত হয়, তখন তাহা কোনও ক্রমে আমাদের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিতে পারে না। অন্তর্জগতেও ব্যাপ্তি দ্বারা বিষয় সহজবোধ্য হয়। যাহাকে ইঙ্গিতে না বুঝান যায়, তাহাকে বাক্যে প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়; তাহাতেও যদি না হয়, তাহা হইলে কার্য্য দ্বারা শিক্ষাপ্রদান করিতে হয়। চলিত ভাষায় ইহাকে 'হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া,' বলে। এজন্য প্রত্যেক বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য বাচনিক বা লিখিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। যাঁহারা বীজগণিত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা $ক^২—খ^২$ এই ব্যক্তি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই প্রথম বিকাশ দুর্ব্বোধ্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর ব্যাপ্ত দ্বিতীয় বিকাশ (ক+খ) (ক—খ) দেখাইয়া দিতে হয়। তাহাতেও যাঁহাদের বুঝিবার ধন্ধ হয়, তাঁহাদিগকে ঐ দুইটী মৌলিক অঙ্গ (factors) গুণ করিয়া দেখাইয়া দিতে

হয় যে, (ক+খ) (ক—খ) = ক২—খ২। জগন্নাথ পণ্ডিত, প্লেটো, ইউক্লিড্ প্রভৃতি জ্যামিতিক শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তাগণ প্রত্যেক জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা সাধারণ সূত্র, বিশেষ সূত্র, অঙ্কন, প্রমাণ ও উপপত্তি, এই কয়টী ক্রমাধিক ব্যাপ্তি দ্বারা সহজে ইন্দ্রিয়গম্য করিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই নিয়ম বশে শ্বেত অপেক্ষা নীল লোহিতাদি বর্ণ, প্রকৃত অপেক্ষা অনুকার, সহজলভ্য অপেক্ষা আয়াসলভ্যদ্রব্য, শান্তি অপেক্ষা উৎসব ইত্যাদি অধিক পরিমাণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই জন্যই স্থূলেন্দ্রিয়-পরবশ মানব এত বাহ্যাড়ম্বরানুরক্ত। সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে ব্যাপ্তি-প্রিয়তা মানবকে ক্রমশঃ অধিকতর বিষয়াসক্ত করিতেছে এবং তদনুপাতে মানসিক বলাপচয়ে মানব সঙ্কীর্ণমনা হইতেছে। ব্যাপ্তি-প্রিয়তা নিবন্ধন মনুষ্যগণ, ললনা-মনোহারিতা, ধনাগমেচ্ছা, যশোলিপ্সা, প্রভুত্ব-লাভ-বাঞ্ছা প্রভৃতি দুর্নিবার প্রবৃত্তিনিচয় পোষণ করিয়া অন্তঃকরণ কলুষিত করিতেছে।

কাল ও ব্যাপ্তির উল্লিখিত লক্ষণানিচয় দ্বারা সৃষ্টিপ্রকরণে সচ্চিদানন্দভাব ও বিস্মৃতির মিশ্রণ সুস্পষ্টীকৃত হয়। কাল ও ব্যাপ্তি অথবা কালগতাব্যাপ্তিও স্থানগতা ব্যাপ্তির অনুপাতে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়ই বিস্মৃতি-মণ্ডিত হয়। ফলতঃ, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অক্ষর সচ্চিদানন্দশক্তি বিস্মৃতি-জড়িতা না হইলে, অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালগত পার্থক্য, নৈকট্য-দূরত্ব প্রভৃতি স্থানগত বৈলক্ষণ্য, জড়ত্ব-চৈতন্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈষম্য, জীবের আবয়বিক অবস্থাভেদ বা সারল্য-কাঠিন্য প্রভৃতি মানসিক অনুভূতি-পার্থক্য ইত্যাদির বিদ্যমানতা থাকিত না। প্রসঙ্গক্রমে এ সমস্ত বিষয়, ক্রমশঃ, উদাহরণে প্রকাশ করা যাইবে।

সূর্য্য।

সূর্য্য, সৃষ্টিকল্পে, ভগবানের সনাতনী শক্তির প্রথম পুণ্যময় আকার। ঈশ্বর সর্ব্ব প্রথমে, তেজে যেমন রূপ বিকাশ করিলেন, তেমনি, সূর্য্যে আকারের বিকাশ করিলেন। সীমাবদ্ধ রূপই আকার। রূপ সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আকার হইল। আকাশ, বায়ু ও তেজোবিকাশ হইবার পরেই, ভবিষ্যৎ আকার-গতা সৃষ্টির সূচনা স্বরূপ সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ স্বরূপ। অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণ সূর্য্য হইতেই তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হয়। তাপ এবং আলোক সৃষ্টি রক্ষণে কিরূপ আবশ্যকীয়, তাহা সকলেই অবগত

আছেন। মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ, আমরা ছয়-ঋতুময়-বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিবা ও রাত্রি সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। সূর্য্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রাচীন ঋষিগণ সূর্য্য মাহাত্ম্যে দ্রবীভূত হইয়া, মহাদ্যুতি, ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন ইত্যাদি বাক্যে সূর্য্যের স্তব করিতেন। সৌরজগৎ রচনা প্রণালীতে আমরা দেখিতে পাই, বিশাল সূর্য্য গ্রহমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া, অন্যান্য গ্রহ ও তাহাদের উপগ্রহগণকে শাসন করিতেছেন। বিমানবাসী বিরাট সৌর পরিবারে সূর্য্য পিতা,গ্রহগণ তাঁহার সন্তান সন্ততি এবং গ্রহজাত উপগ্রহাবলী সূর্য্যের পৌত্র দৌহিত্র। ইহাদের আবার সন্তান সন্ততি হইতেছে। আমাদের কেহ কেহ, ভ্রমক্রমে, ধরণী মাতার ভ্রাতা জ্ঞানে সূর্য্যকে মামা বলিয়া থাকেন। কিন্তু, সূর্য্য আমাদের ধরণী মাতার পিতা; আমাদের মাতামহ। মাতামহ আমাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেছেন; আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছেন। মাতামহ কেমন অপক্ষপাতী! আমাদের সকলেরই উপর তাঁহার সমান স্নেহ, সমান প্রীতি। তিনি সকলকেই তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য অকাতরে সমানভাবে বিতরণ করিতেছেন। আমাদের এতবড় মাতামহ কিরূপে সঞ্জাত হইলেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

চলতী শক্তি কোনও প্রকারে প্রতিরুদ্ধা হইলে, প্রতিরোধক বস্তুর চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মানা হইতে থাকে, অথবা বিপরীতগামী সম-ক্ষমতাপন্ন দুই বা ততোধিক শক্তি প্রবাহ, সংঘর্ষ বশতঃ, একীভূত হইয়া ঘূর্ণায়মান হয়। প্রতিরোধ বশতঃ শক্তির গতির পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু বেগবল বিদ্যমান থাকে। প্রথম স্থলে যেমন একটী শক্তি প্রতিরুদ্ধা হয়, দ্বিতীয় স্থলে, সেইরূপ, শক্তি নিচয় পরস্পর কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হয়। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বায়ু প্রবাহ প্রতিহত হইয়া বা একাধিক বায়ু প্রবাহ পরস্পর প্রতিহত হইয়া, ঘূর্ণী বায়ুর উৎপত্তি করে। যাঁহারা বৃহৎ জলাবর্ত্ত বা ঘূর্ণীপাক দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সমুদ্র তলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, জল প্রবাহ তাহাতে প্রতিহত হইয়া, ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। বড় বড় নদীতেও, জল-প্রবাহ, তলস্থ কোনও ভারী দ্রব্যে বা লম্বভাবে অবস্থিত তীরে প্রতিহত হইয়া ভীষণবেগে ঘুরিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন, গ্রহ উপগ্রহগণ সকলেই নিজ নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে। সূর্য্যও নিজ-কেন্দ্রভেদী দীর্ঘ কক্ষ-রেখায় আবর্ত্তন করিতেছে। আকাশে, সূর্য্য সৃষ্টির জন্য, প্রথমতঃ তাহার দীর্ঘ কক্ষ রেখার সূত্রপাত হয়। ঈশ্বর ঐ রেখা এরূপ আক-

র্ষণী শক্তি-সম্পন্ন করিলেন যে, আকাশ-ব্যাপ্ত বায়ুজাত তেজোরাশি আকৃষ্ট হইয়া, সমন্তাৎ প্রবাহ রূপে তদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত তেজো-প্রবাহ ঐ রেখায় সম্মিলিত এবং পরস্পর প্রতিহত হইয়া, রেখাবলম্বনে একীকৃত ভাবে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং অদ্যাপি ঘূর্ণায়মান আছে। এই ঘূর্ণায়মান তেজঃপুঞ্জই সূর্য্য। কঠিনেতর বস্তু মাত্রেই ঘূর্ণায়মান হইলে, বর্তুলাকার ধারণ করে; এজন্য সূর্য্য গোলাকার। প্রাচীন ঋষিগণ যখন সূর্য্যকে 'হরি' আখ্যা প্রদান করেন, তখন, সম্ভবতঃ সূর্য্যের মানব হৃদয়াদি হরণ করার সহিত তেজঃপুঞ্জ হরণ করিয়া, স্বীয় অবয়ব পুষ্ট করার ভাবও তাঁহাদের অন্তরে জাগরুক ছিল। অপরাপর গ্রহ উপগ্রহগণ, একই নিয়মে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, তাহা-রাও গোলাকার। অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যের অনেক পরে, ক্রমশঃ, সূর্য্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রকৃতি দেবী নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের সৃজন করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রহেরও, প্রথমে, অক্ষরেখার সূত্রপাত হয়। পরে ঘূর্ণায়মান সূর্য্য হইতে বিশাল পিণ্ডরাজী বিক্ষিপ্ত হইয়া, এক একটী রেখা অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটী গ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে। গ্রহ হইতে উপগ্রহগণের উৎপত্তি একই প্রকারে সমাহিত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহ বা উপগ্রহের কক্ষরেখার আকর্ষণী শক্তি আছে; এজন্য প্রত্যেক গ্রহ বা উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি আছে। আবার এই সমস্ত গ্রহোপগ্রহগণ মধ্যে পরস্পরাকর্ষণ আছে বলিয়া, কোনও গ্রহ বা উপ-গ্রহ মণ্ডলচ্যুত হয় না। হিন্দু মনীষিগণ সূর্য্যকে ভ্রমণশীল বলিয়াছেন বলিয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের মত ভ্রমসঙ্কুল বিবেচনা করেন; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বলিয়া, সূর্য্যকে ভ্রমণশীল বলেন নাই। বস্তুতঃ সূর্য্য নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করে বলিয়াই, তাঁহারা তাহাকে গতিশীল বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু বিদ্বান্‌গণ যেমন একদিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির বিষয় উত্তম রূপে অবগত ছিলেন, অপর দিকে, তেমনি, সমস্ত গ্রহ ও উগগ্রহগণ যে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও সম্যক্ বিদিত ছিলেন, এজন্য, সর্ব্বলোক-প্রসবিতা বলিয়া, তাঁহারা সূর্য্যকে সবিতা আখ্যা প্রদান করিয়া-ছিলেন। 'সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সতুকীর্ত্ত্যতে'।

এইরূপে, যদিও তেজঃ সৃষ্টি হওয়ার পরে সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি, সূর্য্যই তাপ ও আলোকের একমাত্র আধার। হিন্দু পুরাণে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যের তেজোহ্রাস হওয়ার বিষয় বর্ণিত আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও অনুমান করেন, সূর্য্যের তাপ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এখনও যে পরিমাণ

তাপ আছে, তৎপ্রভাবে সূর্য্য সম্পূর্ণ দ্রবণশীল এবং কেবল যে পৃথিবীজাত জীবোদ্ভিজ্জাদির অনধিগম্য, তাহা নহে; প্রত্যুত কোনও প্রকার জীব বা উদ্ভিদের আবাস ভূমির অযোগ্য। পক্ষান্তরে ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, সূর্য্যলোক জীবাধ্যাসিত এবং সুকৃতি ফলে পৃথিবীর পুণ্যবানগণের পবিত্র আত্মা উহাতে স্থান প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে এই দুই মতের কোন্‌টী গ্রহণযোগ্য, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

গ্রহমণ্ডলী আমাদিগকে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে, এই পৃথিবীর ন্যায় বা ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর অনেক গ্রহ বিদ্যমান আছে। আমাদের পৃথিবী আমেরু প্রাণী পরিপূর্ণা। পৃথিবীতর গ্রহনিচয় কি প্রাণী শূন্য মরুবৎ অবস্থিতি করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? অথবা একমাত্র পৃথিবীই কি প্রাণী বসতি ভূমি স্বরূপা নির্ম্মিতা হইয়াছে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর অব্যবহার্য্য কোনও বস্তুর সৃষ্টি করেন নাই। তিনি নানা প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেখানে যে উপাদান (element) সেখানে সেই উপাদানজীবী প্রাণীর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে মৎস্যাদি প্রাণী জলচর; জলই তাহাদের উপাদান। আবার আমাদের উপাদান বায়ু; বায়ু শূন্য স্থানে থাকিলে, আমাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। যদি এমন কোনও প্রাণী থাকে, যাহাদের উপাদান আলোক, যাহারা আলোকে বিচরণ করে, আলোক নিশ্বাস প্রশ্বাস করে, আলোকেই বাঁচিয়া থাকে এবং উত্তাপ গ্রাহ্য করে না ও দ্রব পদার্থের উপর অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, ঈদৃশ প্রাণীর বাসস্থান কোথায় হইতে পারে? এরূপ আলোকময় স্থান কই? ইহার উত্তরে একমাত্র সূর্য্যলোকই নির্দ্দেশ করিতে হয়। সর্ব্ব গ্রহের জনয়িতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ক্ষমতাশালী সূর্য্য যে প্রাণীহীন থাকিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা আমরা ধারণা করিতে পারি, সূর্য্যলোক প্রাণী সমাকীর্ণ। আলোকোপাদান সূর্য্যস্থলবাসী প্রাণী নরলোকের স্থূলোপাদান জীব অপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী; এজন্য দেহান্তে পুণ্যবান নরের আত্মা এই সমস্ত প্রাণীর সহিত মিলিত হয়। পৃথিবীচারী জীবদেহে বায়ু ও সলিলের অত্যধিক আবশ্যকতা আছে; পৃথিবীর জীবদেহ অধিক আলোক বা উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু আত্মা যখন দেহ-মুক্ত হয়, তখন তাহার সলিলবায়ুর আবশ্যকতা বা আলোকোত্তাপ ভীতি থাকে না। আলোকপ্রিয় আত্মা আলোকময় স্থানে গিয়া, আলোকজীবন প্রাণীগণের দেহ

ধারণ করিয়া, তাহাদের সহিত সুখে বিচরণ করে। অতএব অন্তর্দৃষ্টি ঋষিগণ, জ্ঞাননেত্রে, যাহা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য। গ্রহ উপগ্রহ সমস্তই প্রাণী পরিপূর্ণ। জ্ঞানীগণ বলিয়া গিয়াছেন, ধ্রুব প্রভৃতি কতিপয় নক্ষত্রলোকে পুণ্য-প্রাণ জীবগণ বাস করিয়া থাকেন এবং সম পুণ্যবান না হইলে, কোনও আত্মা ঐ সকল লোকে যাইতে পারে না। আমরা পৃথিবীর নানা প্রকার নর সমাজ হইতে, এই তথ্যের ভাব সংগ্রহ করিতে পারি। বিদ্বান্-মূর্খ, সৎ-ধূর্ত্ত, মুমুক্ষু-বদ্ধ প্রভৃতি যত প্রকার মানব আছে, সকলেরই নিজ নিজ সমাজ আছে। বিদ্বান্ মূর্খের, সৎ ধূর্ত্তের, মুমুক্ষু বদ্ধ জীবের সমাজ মনোনয়ন করেন না। কিন্তু বুদ্ধি বা জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা, নিম্নতর সমাজের জীব উচ্চতর সমাজে উন্নীত হইতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সমাজের কোনও জীব যদি জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা ঈদৃশী মানসিক উন্নতি সাধন করেন যে, নিজ সমাজ আর তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনে অপারক হইয়া উঠে, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই তদপেক্ষা উচ্চতর কোনও সমাজলিপ্সু হন। পৃথিবীতে সেরূপ সমাজ না থাকিলেও, তাঁহার জ্ঞান পিপাসা, যেস্থানে ঐরূপ সমাজ আছে, সেই স্থানে তাঁহাকে চালিত করিয়া লইয়া যায়। এই জ্ঞান-পিপাসাই পুণ্যবল বা সৎ-সংকল্প। যদিও আত্মা বা সূক্ষ্মতম শরীর স্থিতি বিমোচনের অনুপাতে একলোক হইতে অন্যলোকে বিচরণ করিতে পারে, তথাপি, উপাদান পার্থক্য হেতু একলৌকিক স্থূলজীবদেহ লোকান্তরে যাইতে পারে না। এজন্য একলোকে দেহান্তর গ্রহণে যেমন পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করিতে হয়, লোকান্তরে যাইতে হইলেও, সেইরূপ দেহবাস ত্যাগ করিতে হয়।

পৃথিবী।

উৎপত্তি সময়ে পৃথিবী বাষ্পময়ী ছিল; কেন না সূর্য্যের আবর্ত্তন বিক্ষিপ্ত এবং সূর্য্য হইতে পৃথগ্‌ভূত বাষ্পপিণ্ডই পৃথিবী। সূর্য্য হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, তেজোহ্রাস বশতঃ, পৃথিবী ক্রমশঃ সলিলময়ী হয় এবং সলিল হইতে ক্রমশঃ মৃত্তিকার উৎপত্তি হওয়ায়, পৃথিবী এক্ষণে জল-স্থল-ময়ী। এখনও পৃথিবীর প্রায় তিনভাগজল এবং এক ভাগ স্থল। ব্রহ্মবাদীগণ জল হইতে প্রথম কর্দ্দম সঞ্জাত হইবার সময়, পৃথিবী মধুকৈটভ দৈত্যের মেদে পরিপ্লুতা হইল, এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঐ মেদুর মৃত্তিকাকেই মধু-কৈটভ-মেদ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য, তাঁহারা, পৃথিবীর 'মেদিনী' আখ্যা-

দিয়াছেন। 'তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্ম-বাদিভিঃ'। মিদ্‌ধাতু স্নিগ্ধ হওয়া অর্থ প্রকাশ করে। কর্দ্দমের স্নিগ্ধতা সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পৃথিবীর মেদে পরিপ্লুতা হওয়া ও মেদিনী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ার তাৎপর্য্য ইহা হইতে সহজেই পরিগ্রহ করা যায়। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন হিন্দুপণ্ডিতগণ পৃথিবীকে ধরণী বা ধরিত্রী, ক্ষিতি, অবনী ইত্যাদি নামেও অভিহিতা করিয়াছেন। সৃষ্টিপর্য্যায়ে এই সমস্ত নামের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। জলজ এবং স্থলজ উদ্ভিজ্জাদি ও জলচর, স্থলচর এবং খেচর জীবাদি উৎপন্ন হইলে, পৃথিবী তাহাদিগকে ধারণ করিয়াছে। সুতরাং মেদিনী হওয়ার পরে পৃথিবী ধরণী বা ধরিত্রী হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সৃষ্ট হইয়া যখন এই সমস্ত জীবোদ্ভিজ্জাদি স্বচ্ছন্দে পৃথিবীতে বাস করিতে সক্ষম হইল, তখন পৃথিবী ক্ষিতি হইল। (ক্ষি=বাসকরা)। যখন নিয়ম সংস্থাপিত হইল এবং সমাজপতি বা নরপালগণ সমাজ শীর্ষে অবস্থিতি পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবী অবনী হইল। (অব্‌=রক্ষা করা, যিনি ভূপাল কর্ত্তৃক রক্ষিতা হন)। এইরূপে, সৃষ্টিবিকাশে, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাভ্যন্তর দিয়া, পৃথিবী যে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীতা এবং বিখ্যাতা হইয়াছে (প্রথ্‌=বিখ্যাত হওয়া), তাহা দেখাইবার জন্যই রহস্যজ্ঞ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর এত নাম করণ করিয়া গিয়াছেন।

অধুনাতন, ভৌগোলিকগণ প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক এতদুভয় নিয়মাবলম্বনে পৃথিবীকে নানা মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ ইত্যাদি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু পৌরাণিকগণ, রাজনৈতিক বিভাগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল মাত্র নিসর্গগত বিভাগানুসারে, পৃথিবীকে-সপ্তদেশে এবং প্রত্যেক দেশকে আবার কতিপয় বর্ষে বা অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরাণকারগণ দেশের 'দ্বীপ' সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। কারণ দেশ সলিল হইতে সম্ভূত হইয়া, সলিল বেষ্টিত আছে। ভৌগোলিক সংজ্ঞায়, জলবেষ্টিত ভূভাগকে দ্বীপ বলা হয়। হিন্দুপুরাণে, নিম্নলিখিত সপ্তদ্বীপ বা দেশের উল্লেখ আছে :—জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী,প্লক্ষ ও পুষ্কর। আমাদের ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপান্তর্গত একটী বর্ষ বা অংশ। কোনও রাজা তাঁহার ভরত নামক পুত্রকে জম্বুদ্বীপান্তর্গত সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত এই বর্ষ বা প্রদেশ প্রদান করেন। তদবধি ইহা ভারতবর্ষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হিমাহবং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌপিতা। তস্মাচ্চ ভারতংবর্ষং তস্যনাম্না মহাত্মনঃ।' ইহা হইতে প্রতীয়-

মান হয়, ভারতবর্ষের চতুঃসীমা পুরাকালে যেরূপ ছিল, অদ্যাপিও সেইরূপ আছে।

বহুতর প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে, উপরোক্ত সপ্তদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি, আমাদের ভারত ভূমি জম্বুদ্বীপের অন্তর্নিহিত বিধায়, এস্থলে উক্তদ্বীপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তরে 'সুদর্শন' নামে একটী জম্বুবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষ ঈদৃশ প্রাচীন যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও হিন্দুগণ ইহাকে সনাতন বিবেচনা করিতেন। এই পবিত্র বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া, তন্নামানুসারে, প্রত্ন ভৌগোলিকগণ এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের 'জম্বুদ্বীপ' নাম-করণ করেন। "দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু। সুদর্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ। তস্যনাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ।" জম্বুদ্বীপ নিম্নলিখিত নববর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল :—কুরু, হিরণ্ময়, রুমণক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমান, ভদ্রাশ্ব, চিনার ও ভারত। যদিও বহুল পরিবর্ত্তন হেতু, অধুনা, উপরোক্ত বর্ষনিচয়ের স্থান নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ, তথাপি, নামচিহ্ন দ্বারা কোনও কোনও আধুনিক দেশের সহিত, কোনও কোনও প্রাচীন বর্ষের একত্বোপলব্ধি হয়। ভাষাপরিবর্ত্তন বা সহজোচ্চারণ প্রযুক্ত 'রুমন্বক'বর্ষ, ক্রমশঃ, রুমানিয়া ও রোম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমের ইতিহাসে রোমাস্ বা রমিউলাস নামক ব্যক্তি হইতে ইটালী দেশের 'রোম' আখ্যা প্রাপ্ত হওয়ার একটী প্রাচীন কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান চীন দেশের সহিত 'চিনার' বর্ষের একত্ব সহজেই অনুমিত হয়। এই সকল ঘটনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক মানচিত্রগত সমস্ত আসিয়া খণ্ড এবং ইয়ুরোপ খণ্ডের পূর্ব্ব ভাগের কিয়দংশ লইয়া, হিন্দু পণ্ডিতগণ জম্বুদ্বীপের গঠন ও সীমানির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সমপ্রকৃতির জীবোদ্ভিজ্জাদির বিদ্যমানতায়, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, অষ্ট্রেলিয়া খণ্ড, আদৌ, একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ ছিলনা; উহা আসিয়া খণ্ডের অন্তর্নিহিত ছিল, পরে ক্রমশঃ সমুদ্র ব্যবধানে আসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জম্বুদ্বীপের বর্ষনিচয়ের স্থান নিপরূণ করা যে কষ্টসাধ্য, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। সম্ভবতঃ, কোনও কোনও প্রাচীন বর্ষ বা তাহার অংশ অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ভুক্ত আছে।

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায়, পৃথিবী সর্ব্বদা নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে এবং ষষ্টিদণ্ডে পৃথিবীর একটী সম্পূর্ণ আবর্ত্তন সমাহিত হয়। এই আবর্ত্তনে পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ সূর্য্যাভিমুখ থাকে, তাহাতে দিবা এবং বিপরীত পৃষ্ঠে রাত্রি হয়

বলিয়া, ইহা পৃথিবীর 'আহ্নিক গতি' অভিহিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের আকর্ষণ বশতঃ, পৃথিবী ডিম্বাকার পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ত্রিশত-পঞ্চ ষষ্টি দিবসে একবার পরিভ্রমণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এজন্য ইহা পৃথিবীর বার্ষিকগতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বার্ষিক গতি নিবন্ধন পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে ছয় ঋতুর আবির্ভাব হয়।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে বসুধা, বসুন্ধরা বা বসুমতী বলিয়া স্তুতি করিতেন। ফলতঃ পৃথিবীর অগণন রত্নরাজী, অসংখ্য মনোমোহকর মণি মাণিক্য এবং চাকচিক্যময় নানা প্রকার খনিজ পদার্থের বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়, সনাতন পুরুষ বৈদূর্য্য ভাণ্ডার করিয়া পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। গাঢ় বিস্মৃতি প্রভাবে এই সকল বস্তুর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, আমরা ইহাদিগকে অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ, অন্তরস্থ সচ্চিদানন্দ ভাব সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, এই সমস্ত জড় পদার্থও নিদ্রিতবৎ বিদ্যমান আছে। তথাপি, ঘন বিস্মৃতির মধ্য দিয়া, সুপ্ত চৈতন্য ও আনন্দের আভা ক্ষীণভাবে পরিস্ফুট হইয়া, ইহাদিগকে এরূপ চাকচিক্যশালী করিয়াছে। প্রস্তর ও ধাতু দ্রব্যে সুপ্ত চৈতন্য ও আনন্দ বিস্মৃতির সংমিশ্রণে নানাগুণে পরিণত হইয়াছে। যেমন কর্দ্দম কঠিন হইয়া মৃত্তিকা বা বালুকা হইয়াছে, তেমনি মৃত্তিকা বা বালুকা কঠিনতর হইয়া প্রস্তর বা খনিজ পদার্থ নিচয় সঞ্জাত হইয়াছে। দীপ্তিশালী প্রস্তরকে আমরা মণি বা মাণিক্য বলিয়া থাকি। রূপ গুণ ভেদে মণির অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে। ইহাদের সংমিশ্রণে ভিন্ননামা নানা ধাতুরও উৎপত্তি হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ সুপ্ত চিদানন্দ ভাবের বিচিত্র বিকাশ ফলে এই সমস্ত উজ্জ্বল রত্নরাজী সমুদ্ভূত হইয়াছে। ভাববিকাশের অনুপাত বা পরিমাণ অনুসারে আমরা স্থূলজ্ঞানে এই সকল দ্রব্যের সমাদর করিয়া থাকি। আমরা, যে জড় দ্রব্যে যত সুপ্ত চৈতন্য ভাবের প্রকাশ হইয়াছে, সেই দ্রব্যকে তত ব্যবহার্য্য এবং যে জড় দ্রব্যে যত সুপ্ত আনন্দ ভাবের প্রকাশ হইয়াছে, সেই দ্রব্যকে তত মূল্যবান বিবেচনা করি। লৌহে সুপ্ত চৈতন্য ভাবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ হইয়াছে, এজন্য কর্ম্মজগতে লৌহের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রজত, কাঞ্চন, হীরক, মরকত প্রভৃতি পদার্থে সুপ্ত আনন্দভাব কমনীয় কান্তিরূপে বিভাসিত হইয়াছে; এজন্য ভাববিকাশ বা মধুরিমার অনুপাতে জগতে এই সমস্ত দ্রব্য মূল্যবান বিবেচিত হয়।

পৃথিবীস্থ পর্ব্বতরাজী প্রথমে কিরূপে সৃষ্ট হইল, নিরূপণ করা দুরূহ। পর্ব্বতের পুরাপ্রচলিত যত নাম বা সংজ্ঞা আছে, তন্মধ্যে একটী ভিন্ন, অপর সকলগুলিই ইহার গুণ বা ধর্ম্মলক্ষণা প্রকাশ করে মাত্র; আদৌ সৃষ্টি লক্ষণা সূচনা করে না। আমরা পর্ব্বত, অচল, ধরাধর, গিরি, শৈল ইত্যাদি শব্দ দ্বারা গ্রন্থিবান, চলনাক্ষম, পৃথিবীধারী, গ্রাসকারী, প্রস্তরময় প্রভৃতি অর্থ বোধগম্য করিতে পারি এবং পর্ব্বত ঐ সকল লক্ষণ বিশিষ্ট তাহা ধারণা করিতে পারি; কিন্তু এই সমস্ত শব্দ বা অর্থ দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টিতত্ত্ব সংগ্রহ করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও, এ বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। হিন্দু সমাজে প্রবাদ আছে, পর্ব্বতগণ পূর্ব্বে পক্ষবিশিষ্ট ছিল। তাহারা উড্ডীয়মান এবং ইতস্ততঃ পতিত হইয়া পৃথিবীর যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিত। এজন্য দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদের পক্ষচ্ছেদ করেন। অন্যান্য পর্ব্বতের পক্ষ কর্ত্তিত হইলে, নগরাজ হিমালয়-সুত মৈনাক গিরি অভিমান ভরে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করেন ("অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই"—রায় গুণাকর) এবং তদবধি সমুদ্রে বাস করিতেছেন। মদুক্ত সৃষ্টি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে এই প্রবাদ-জাত দুইটী ভাব আমাদের মানসমন্দির অধিকার করে। প্রথম, জল সৃষ্টি হওয়ার পরে পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়, সমুদ্রে পর্ব্বত আছে। সুতরাং এ প্রবাদ বাক্য হইতেও, এ বিষয়ে এতদধিক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিন্দু পণ্ডিতগণ, কি হেতু পর্ব্বতের 'অদ্রি' সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। অদ্রি শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে, আমরা দেখিতে পাই, নঞ্ বা অ পূর্ব্বক পলায়ন করা অর্থ সূচক দ্রা ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যে পলায়ন করে না' ইহাই অদ্রি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। আবার তরলার্থক দ্রব শব্দ দ্রু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দ্রু ধাতু 'গমন করা' অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং দ্রু ও দ্রা উভয় ধাতুই এক ভাবের অর্থ সূচনা করে; কিন্তু দ্রু অপেক্ষা দ্রা অধিকতর তীব্রার্থসূচক। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই সকল ধাত্বর্থ আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়, জল হইতে প্রথমে যখন মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, তৎকালে পৃথিবীর আবর্ত্তন বলে, ইহার কোমল বা দ্রব মৃত্তিকা রাশি কোনও কোনও স্থলে ঝুলিয়া পড়ে, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ, ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। এই সকল স্ফীত কর্দ্দমপিণ্ড শৈত্য সংযোগে কঠিন প্রস্তরে পরিণত এবং ধরাসংনিবদ্ধ হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে ধরাধর বা পর্ব্বতরূপে বিরাজ করিতেছে। সলিলা-

ভ্যন্তরে সামুদ্রিক শৈলরাজীও একই নিয়মে সঞ্জাত হইয়াছে। পলায়নোন্মুখ হইয়াও, পর্ব্বতবৃন্দ পৃথিবী হইতে পলায়ন করিতে পারে নাই, এ জন্য প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞগণ ইহাদিগকে 'অদ্রি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

চন্দ্র।

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। আনন্দদায়ক বলিয়া প্রচীন কবিগণ ইহার চন্দ্র নামকরণ করিয়াছেন। পৃথিবী সৃষ্টা হওয়ার পরে চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের আবর্ত্তন-বিক্ষিপ্ত। অংশ, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তন-বিক্ষিপ্ত অংশ। এজন্য পুরাণকারগণ ধরণী-কুক্ষি-ভেদে চন্দ্রের জন্ম হওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন। পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে, চন্দ্র শৈত্যসংযোগে অধিকতর কঠিন ও সঙ্কুচিত হইয়াছে। পুরাণকারগণ, জন্মের পরে চন্দ্রের ক্ষয় রোগগ্রস্ত হওয়ার রূপকে, সঙ্কোচনে তাহার আয়তন হ্রাস হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। পরন্তু, ক্ষয়-রোগ নিবারণ জন্য, চন্দ্রের শশ বা মৃগ অঙ্কে গ্রহণ করার যে বর্ণনা পুরাণে আছে, চন্দ্রস্থ শৈলরাজীই তাহার রূপক সমস্যা পরিপূরণ করে। সংহতি প্রভাবে পরমাণু সকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইলে, জড় পদার্থ কঠিন হয়। কিন্তু সংহতি শক্তির নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। জড় পদার্থ কাঠিন্যের চরম অবস্থায় উপনীত হইলে, সংহতি তাহার উপর আর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মৃত্তিকা সংহতি প্রভাবে কাঠিন্যের শেষ দশায় উপনীত হইয়া প্রস্তর হয়। প্রস্তর হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্তিকার আয়তনের সঙ্কোচ হয়; কিন্তু প্রস্তর আর সঙ্কুচিত হয় না। চন্দ্রের পর্ব্বতমালাই তাহার অঙ্কস্থ শশ বা মৃগ। পর্ব্বত সঙ্কুচিত হইতে পারে না; সুতরাং তাহার আয়তনেরও হ্রাস বা ক্ষয় হইতে পারে না। পরবর্ত্তী পুরাণে চন্দ্রের জীবন গত হওয়ার এক মধুর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। বহুকাল হইল ক্ষয় রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। চন্দ্রের মাতামহ সূর্য্য স্বীয়তনয়া চন্দ্রজননী-পৃথিবীকে ভুলাইবার জন্য এক কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি স্বীয়ছটা চন্দ্রের মুখমণ্ডলে পাতিত করেন; তাহাতে চন্দ্র বদন উজ্জল ও হাস্যময় প্রতীয়মান হয়। মুগ্ধাধরণী পুত্রের এইরূপ হাস্যময় মুখ দেখিয়া হৃদয় শীতল করেন এবং তাঁহার পুত্ররত্ন বাঁচিয়া আছে, এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই বিচিত্র রূপক যে কি গম্ভীর রহস্যময়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চন্দ্র স্বয়ং আভাহীন; সূর্য্য কিরণ চন্দ্রে পতিত হওয়ায়, চন্দ্র দীপ্তিশালী প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রে

আপতিত সূর্য্যকিরণকেই আমরা চন্দ্রশালা বা জ্যোৎস্না বলিয়া থাকি। সুধাংশু-কৌমুদী ধরাবাসী জীবান্তঃকরণে যে কিরূপ পবিত্র পুলক প্রদান করে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। তেজোময় মিহির-মরীচি, ইন্দু শৈত্য সংযোগে স্নিগ্ধ ও শীতল হয়; এজন্য চন্দ্রাতপ এরূপ সুখস্পর্শ এবং মনোরম।

পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও সেইরূপ নিজ কক্ষাবর্ত্তন-নিরত হইয়া, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই চন্দ্র-গতিই শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষ-পর্য্যায়ের কারণ। চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণ বশতঃ জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তি হয়।

চন্দ্র অতিশয় শীতল বলিয়া, জীববাসের অনুপযোগী, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। কিন্তু প্রাচীন মনীষিগণ, সূর্য্যলোকের ন্যায় চন্দ্রলোকও যে জীবকুল সমাকুলিত, তাহার ভূয়সী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যলোকে জীববসতি সম্বন্ধে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, চন্দ্রলোক সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে; সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

সূক্ষ্ম বিকাশ।

মূল যৌগিক বস্তু ব্যোমাদি পর্য্যায়ে ক্রমশঃ স্থূলভাবে বিকাশিত হইয়াছে বলিয়া, পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চভূতের বিকাশের 'স্থূল বিকাশ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চভূতময় পদার্থের মধ্য দিয়া, সচ্চিদানন্দ ভাবের যে ঊর্দ্ধ বিকাশ হইয়াছে, তাহাকে সূক্ষ্মবিকাশ বলিতে হইবে। স্থূলবিকাশে যেমন বিস্মৃতি, ক্রমশঃ, অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সূক্ষ্মবিকাশে, তেমনি, তদনুপাতে বিস্মৃতির প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। স্থূলবিকাশে যেমন সচ্চিদানন্দ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া অবশেষে সুষুপ্ত হইয়াছে, সূক্ষ্মবিকাশে, তেমনি, এই সুষুপ্ত সচ্চিদানন্দ ভাবের ক্রমোন্মেষ বা স্ফুরণ হইয়াছে। স্থূল বিকাশে যেমন প্রত্যেক বিকাশিত বস্তু, স্বীয়গুণের সহিত, পূর্ব্ব বিকাশিত বস্তুর গুণ বা গুণনিচয় প্রাপ্ত হয়, সূক্ষ্মবিকাশেও সেইরূপ পরবিকাশিত বস্তু, তাহার বিশেষ গুণের সহিত, পূর্ব্ববিকাশিত বস্তুর গুণ প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র অত্যন্ত সাহসী; আবার নিম্নতর পশুর যে সমস্ত ভাব আছে, তাহাও ব্যাঘ্রে বিদ্যমান আছে। সিংহে পশুত্ব, ব্যাঘ্রের সাহস এবং তদ্ভিন্ন কিঞ্চিৎ মহত্ত্ব আছে। সিংহ ও ব্যাঘ্রে যে সকল গুণ আছে, বানরে তৎ সমস্ত পরিলক্ষিত হয়; পরন্তু বানর সিংহ ব্যাঘ্র

অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী। মনুষ্যের পশুত্ব ও হিতাহিত বিচার বুদ্ধি আছে এবং হিতাহিত বিচার বুদ্ধির বিদ্যমানতাই মানবের মনুষ্যত্ব। হিন্দুপুরাণকারগণ ভগবানের অবতারবাদরূপকে, সৃষ্টির সূক্ষ্মবিকাশে, জীববিকাশ পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অথবা ভগবান যখন স্বয়ং সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, তখন পৌরাণিক মতে রূপকের আরোপ না করিয়া, ইহাকে সুস্পষ্ট বিবর্ত্তবাদ বলাই সঙ্গত। পুরাণ মতে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি ক্রমে জীববিকাশ বা ক্রমোন্নত জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। ডারউইন-প্রমুখ আধুনিক বিবর্ত্তবাদীগণ (evolutionists) একই মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতেও, ভূমণ্ডলে ক্রমশঃ উন্নত প্রকৃতির জীব আবির্ভূত হইয়াছে। ডারউইনের বিবর্ত্তবাদ আধুনিক মনোবিজ্ঞানে (psychology) ও চরিত্রনীতি বিজ্ঞানে (ethics or moral philosophy) গৃহীত হইয়া এই সকল শাস্ত্রে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

উদ্ভিদ্ বিকাশ।

সূক্ষ্মবিকাশ-পর্য্যায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, উদ্ভিদ্-বিকাশই তাহার প্রথম স্তর স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। সুপ্ত সচ্চিদানন্দ ভাব প্রথমে উদ্ভিদে স্ফুরিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ যেমন উদ্ভিদ্‌কে সচেতন বলিতে সাহসী হন নাই, তেমনি আবার ইহাকে অচেতন বলিতেও সাহস করেন নাই; এজন্য তাঁহারা উক্ত উভয় পদার্থের মধ্যস্থলে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহা উদ্ভিদের স্বরূপাবধারণ বিষয়ে, তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতা সূচনা করে। যদি, বলা যায়, উদ্ভিদ্ সচেতনও নহে, অচেতনও নহে, তাহা হইলে উদ্ভিদের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। হিন্দুপুরাণকারগণ, স্পষ্টাক্ষরে, উদ্ভিদকে স্বল্পচেতন বলিয়া গিয়াছেন এবং, এক্ষণে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মতই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ইহা গ্রহণ করিতেছেন।

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনুসংহিতা; প্রথম অধ্যায়।

ইহারা (উদ্ভিদ্গণ) বহুবিধ কর্ম্মফলে, তমোগুণে আক্রান্ত হইয়া অবস্থান করে। ইহাদের বহির্ব্যাপার থাকে না। ইহারা কেবল মাত্র অন্তরে চৈতন্য বিশিষ্ট থাকে। কোনও কোনও সময়ে ইহাদের সুখদুঃখের বিলক্ষণ অনুভব

হয়। ফলতঃ জীবে সুপ্ত সচ্চিদানন্দ ভাবের যেরূপ বিকাশ হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের ধর্ম্ম বা গুণ, অল্প পরিস্ফুট ভাবে উদ্ভিদে পরিলক্ষিত হয়। জীবের ন্যায় উদ্ভিদের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাবস্থা আছে; উভয়েরই শারীরিক পরিণতির নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ উপলব্ধি করা যায়। উদ্ভিদ্ শীত গ্রীষ্ম অনুভব করিতে পারে। আঘাত লাগিলে, উদ্ভিদ্ কাতর হয়; আবার প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের ক্ষত আরোগ্য হয়। কোনও কোনও উদ্ভিদের অনুভব-শক্তি অপেক্ষাকৃততীক্ষ্ণ প্রতীয়মানা হয়। উদাহরণ স্বরূপ লজ্জাবতীলতার (Sensative plant) বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবয়বিক গঠন সম্বন্ধেও, জীবোদ্ভিদে সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। বৃক্ষত্বক্‌কে উহার চর্ম্মমাংস, ত্বগাবৃত কাষ্ঠকে উহার অস্থি, এবং কাষ্ঠমধ্যস্থ কোমল পদার্থকে উহার অস্থিমজ্জা বলা যাইতে পারে। জন্ম, জীবন-ধারণ, শরীর-পোষণ, ফলজনন ও মৃত্যু, এই কয়েকটী স্থূল ধর্ম্ম, সূক্ষ্মবিকাশগত পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ; সুতরাং উহারা জীবোদ্ভিজ্জেরও সাধারণ ধর্ম্ম।

জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও ক্রমোন্নত বিকাশ হইয়াছে। আমরা চারি শ্রেণীর উদ্ভিদ্ দেখিতে পাই। যথা :—শৈবাল, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ। যদিও জীব বিকাশের পূর্ব্বে উদ্ভিদ্ বিকাশ সমাহিত হইয়াছে, তথাপি, উদ্ভিদ্ বিকাশ ও জীব বিকাশ এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদ্ বিকাশের অব্যবহিত পরেই, তদাশ্রয়ী জীবের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এইরূপে সম্বদ্ধ হইয়া উদ্ভিদ্ বিকাশ ও জীব বিকাশ উভয়ই অগ্রসর হইয়াছে। পরবর্ত্তী জীববিকাশ বর্ণনায় এই বিষয় স্পষ্টতর ভাবে প্রদর্শিত হইবে।

জলজ ও স্থলজভেদে শৈবাল দুই প্রকার। পৃথিবী জলময়ী থাকা অবস্থাতেই জলজশৈবাল সঞ্জাত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্তিকা সৃষ্টি হওয়ার পরে যে স্থলজ শৈবালের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। জলে ও স্থলে এরূপ সূক্ষ্ম শৈবাল বিদ্যমান আছে, যাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি, অনেক সূক্ষ্ম শৈবাল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলেও, আমরা তাহাদিগকে শৈবাল বলিয়া জানিতে পারি না। কোনও কোনও গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ জলে পরিবর্দ্ধিত হয় ও বাঁচিয়া থাকে। এজন্য, জলীয় ও স্থলীয়, এই দুই শ্রেণীতে ইহাদের প্রত্যেককেই বিভক্ত করা যায়। কিন্তু কোনও গুল্ম, লতা বা বৃক্ষকে জলজ ও স্থলজ ভেদে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা যে সকল গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ জলীয়,

তাহাদেরও মূল কর্দ্দম বা মৃত্তিকা সংনিবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয়, ক্রমে কর্দ্দম ও মৃত্তিকা সঞ্জাত হওয়ার পর পর্য্যায়ানুযায়ী গুল্ম, লতা ও বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে।

জীব-বিকাশ।

জীবের সহিত বাহ্যজগতের অপরাপর বস্তুর সম্বন্ধ বিচার করিলে সহজেই প্রতীতি হয়, ভোক্তাস্বরূপ জীবের জন্ম হইয়াছে। জীব-সম্ভোগ জন্যই যেন ভগবান তাঁহার এই বিপুল বিভব সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভাব প্রণোদিত হইয়া কবি গোল্ড্স্মিথ্ বলিয়াছিলেন, "The world, the world is mine," এই বিশ্ব আমারই, আমারই জন্য—আমিই ইহা সম্ভোগ করি। মিল, বেন্থাম প্রভৃতি আধুনিক হিতবাদী দার্শনিকগণ (utilitarians) একই ভাবের ভাবুক। ফলতঃ সম্ভোগ ক্রিয়া নিষ্পাদন জন্যই জীব ইন্দ্রিয় ও অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর যাহাঁকে যে পরিমাণ ভোগাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তৎ পরিচালন জন্য তাহাকে কার্য্যসাধক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রদান করিয়াছেন। ইহাই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর বিভিন্নাকৃতি হওয়ার কারণ। আবয়বিক যন্ত্রের ক্ষমতানুসারে জীবের ভোগ পদ্ধতি নিয়মিতা হয়। মানবগণ সাধারণতঃ সম্ভোগ ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় যন্ত্রের সদ্ব্যবহার না করিলেও, সৃষ্টি বিকাশে মনুষ্য জাতি সর্ব্বোচ্চ আবয়বিক যন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এমন একটী মহৎ নিয়মের অস্তিত্বোপলব্ধি হয়, যদ্দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পরিশাসিত হইতেছে। বিকাশ পর্য্যায় প্রতিভাত উচ্চতর বস্তু অবয়ব পোষণ জন্য নিম্নতর বস্তুর উপর নির্ভর করে। যদিও জীব ও উদ্ভিদ্ উভয়ই পঞ্চভূতময় পদার্থ, তথাপি উদ্ভিদ জীবের আহার। আবার জীবকুল মধ্যেও শারীরিক বা মানসিক বলের তারতম্যানুসারে নিম্নতর উচ্চতরের অঙ্গপোষক। নিরীহ দর্দ্দুর নিরীহতর কিঞ্চিলিকাদি (কিঞ্চুলুকাদি) ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। ভেক সর্প কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয়। সর্প বলবান গরুড় পক্ষীর ভোজ্য। কীট পতঙ্গ ভোজী পক্ষী বলবত্তর বিহঙ্গমের খাদ্য। পশুগণ মধ্যেও দৈহিক বলের ক্রমানুযায়ী পরস্পরে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এমন কি, যদিও শ্রেষ্ঠ জীব মানব মানসিক বলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুনিচয়কে পদানত করিয়াছে, তথাপি শারীরিক বলের অপকৃষ্টতা নিবন্ধন, মনুষ্য তাহাদের খাদ্য। মানসিক বলের তারতম্যানুসারে, মানব সমাজে মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবয়বিক

সম্ভোগ জন্য উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীকে ভিত্তি করিয়া দণ্ডায়মান হয়। বিদ্যাচর্চ্চাদি দ্বারা যাঁহারা মানসিক বলের ঔৎকর্ষ্য সাধন করেন, অশিক্ষিত কৃষক বা শ্রমজীবীকুলের কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থ বা শস্যে তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিগণ কর্তৃক সবলমনা ব্যক্তিগণের সেবা সমাহিত হইবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজে জাতি, বর্ণ, ব্যবসায় প্রভৃতিক্রমে মনুষ্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ হয়। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয়, বিকাশ পর্য্যায়ে ক্ষীণশক্তি প্রবলতর শক্তির অন্তর্নিহিত হইয়া যায় এবং এই অন্তর্নিধান সমাধানই চৈতন্যের স্থূল সম্ভোগ বা ক্রিয়া। ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং স্বভাবজ। ভগবান পৃথক্ পৃথক্ রূপে, গুণে বা আকারে তাঁহার সচ্চিদানন্দ শক্তির বিচিত্র বিকাশ করিয়া, তাহাদের সম্ভোগ সমবায়ে সৃষ্টিলীলা সমাধান করিতেছেন। এজন্য জীব জীবন ধারণে এবং অঙ্গপোষণে আনন্দানুভব করে। বিভিন্ন জীবনিচয়ের সম্ভোগ সমবায় নিমিত্ত, যে যে প্রকার বস্তুর আবশ্যকতা, তাহার সত্ত্বা এবং যে যে স্থানে যে যে প্রকার বস্তুর আবশ্যকতা, সেই সেই স্থানে তাহাদের স্থিতি, বিধাতা কর্তৃক বিহিত হইয়াছে। আময়ে জীব সম্ভোগে বিঘ্ন জন্মে, এজন্য তদুপশমক ওষধির সৃষ্টি হইয়াছে। পূতিগন্ধে জীবকুল বিরক্ত হয়, তাহাদের ভোগে বাধা উপস্থিত হয়; এজন্য মৃত দেহাদি উদরসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে গৃধ্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যে দেশে অধিক সর্প আছে, অপরাপর জীবের শঙ্কা নিবারণ জন্য তথায় গরুড় জাতীয় পক্ষীরও বিদ্যমানতা আছে। জীবের আনন্দ বিধান জন্যই ঈশ্বর ইন্দ্রিয় ও তদ্‌গ্রাহ্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবের নয়ননন্দন জন্য শ্যামল শষ্প, হরিৎ পত্র, কুসুম-সুষমা, জীবদেহে বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ, শ্রবণ নন্দন জন্য পবনের স্বন্ স্বন্ শব্দ, তটিনীর কুলুকুলু রব, বিহগের কাকুলী ও তান, নাসিকানন্দন জন্য ফলপুষ্প ও অন্যান্য দ্রব্যজাত সুরভি, রসনানন্দন জন্য সুরসাল ফল ও মিষ্টাস্বাদন বস্তু সম্ভার, স্পর্শ-নন্দন জন্য সুখসেব্য বায়ু, অগ্নি, সলিল ও বহুবিধ কোমল পদার্থ প্রভৃতি আভরণ প্রকৃতি দেবী সতত নিজ বিরাট অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন। আবার এই স্থূলানন্দ সম্ভোগ হইতেই জীবের সূক্ষ্মানন্দ সম্ভোগের সূত্রপাত হয়। কারণ স্থূলানন্দ সম্ভোগে জীব যখন উপলব্ধি করিতে পারে, ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল আনন্দের একমাত্র ব্যবস্থাকর্ত্তা পরমেশ্বর, তখনই জীবের ভক্তি, ভাব ও প্রেমরসের উদ্রেক হয়। জীব তখন ভগবানকে জানিতে চায় এবং তাঁহার অপার করুণার জন্য তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

সর্ব্ব প্রথমে যে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয় ক্ষণকাল বিবেচনা করা

কর্ত্তব্য। ঈশ্বর কি তাহার আশ্রয় বা আহারের ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাকে জগতে উপস্থাপিত করিয়াছেন ? যিনি এত দয়ালু ও সতর্ক যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার তিন মাস পূর্ব্বে তাহার মাতৃস্তনে পীযূষ সঞ্চার করিয়া দেন, তিনি তাঁহার সর্ব্ব প্রথম জীবকে, নিরবলম্বাবস্থায় ভূতলে ছাড়িয়া দিলেন, ঈদৃশ বিরুদ্ধ ভাব আদৌ মানস-পটে উদিত হয় না। আমরা দেখিতে পাই, মৎস্য জলচর এবং জলবাসী ; মৎস্য শৈবাল ভক্ষণ করে এবং শৈবাল আশ্রয় করিয়া, তন্নিম্নে বা তন্মধ্যে অবস্থান করে। অতএব সলিল মৎস্যের উপাদান (element) এবং শৈবাল ইহার প্রধান ভক্ষ্য। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, জলজ শৈবাল সৃষ্ট হওয়ার পর মীনের সৃষ্টি হইয়াছে। কূর্ম্মজাতীয় জীব জলচর হইলেও, জলই ইহাদের একমাত্র আশ্রয় নহে। শুক্তি, শঙ্খ, শম্বুক, কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতি কূর্ম্ম কোনও কোনও সময়ে স্থলে আগমন করে এবং কোমল মৃত্তিকা মধ্যে ডিম্ব ত্যাগ করে। শম্বুক ও কচ্ছপ স্থলজ শৈবালও ভক্ষণ করে এবং কোন কোন শম্বুক স্থলচর। স্থলবিহার করিবার জন্য কূর্ম্মজাতি পদাদি আবশ্যক অঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে ; কেবল জলবিহার জন্য মৎস্যের ন্যায় ইহাদের ডানা নাই। এই সকল ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, অন্ততঃ জল হইতে কোমল মৃত্তিকা এবং তাহাতে কোনও কোনও স্থলজ শৈবাল সঞ্জাত হওয়ার পর, কূর্ম্মজাতীয় সর্ব্বনিম্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। জলে যেমন সর্ব্ব প্রথমে মীন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, মৃত্তিকা সঞ্জাত হইবার পরে, স্থলে সেইরূপ প্রথমে কিঞ্চিলিকাদি পন্নগজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। আবার জলে যেরূপ মীনের পর কূর্ম্মজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, স্থলেও সেইরূপ পন্নগজাতীয় জীবের সৃষ্টির পর, ভেক, শরট, কৃকলাস প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় অণ্ডজ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। কুম্ভীরের সহিত শরট ও কৃকলাসের আকার ও চরিত্রগত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কুম্ভীর যেমন অগ্রজাত মীনাদি ভক্ষণ করে, এবং লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, ইহারাও সেইরূপ অগ্রজাত কীট পতঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং ভক্ষণ করে। শশক, শূকর, শল্লকী প্রভৃতি বারাহিক জীব মুখাগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া, ওল, কচু প্রভৃতি শৈবাল কন্দ ভক্ষণ করে। সুতরাং স্থলজ শৈবালাদি উত্তমরূপে সঞ্জাত হওয়ার পরে যে বারাহিক জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবী তৃণ গুল্মাচ্ছাদিত হওয়ার পর, ছাগাদি তৃণভোজী জীবের বিকাশ হইয়াছে এবং তৃণভোজী জীবের বহুল আবির্ভাবের পর মাংসাশী প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে।

খেচর প্রাণীর সৃষ্টিপর্য্যায় লক্ষ্য করিলে, মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি স্বেদজ প্রাণী যে সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। মশক মক্ষিকাদি কীট পতঙ্গ যদিও খেচর, তথাপি, ইহারা তৃণ শৈবালাদি মধ্যে অবস্থান করে। শৈবালাচ্ছন্ন জলাভূমিতে মশক ও মক্ষিকার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। গুল্ম, লতা ও বিটপী বিকাশের সহিত অণ্ডজ বিহঙ্গম কুলের ক্রম বিকাশ হইয়াছে। অণ্ডজ বিহঙ্গের পর চর্ম্মচট্যাদি স্তন্যপায়ী পক্ষীর আবির্ভাব হইয়াছে।

বিকাশ পর্য্যায়ে হিন্দু পৌরাণিকগণ কৃত নিম্নতর জীবের যেরূপ জাতিবিভাগ এক্ষণে আমরা দৃষ্টিগোচর করি, তাহাতে কয়েকটী প্রাণীকে তাঁহাদের প্রদত্ত কোনও শ্রেণীভুক্ত করা দুরূহ। পুরাণকারগণ জলচর কূর্ম্মজাতীয় জীবের বিকাশের পর, স্থলচর বরাহ জাতীয় জীবের বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত পন্নগ ও সরীসৃপ জাতীয় জীব এবং খেচর কীট, পতঙ্গ ও বিহঙ্গ নিচয়কে কূর্ম্ম কিম্বা বরাহ এতদুভয়ের কোনও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়না। এই সকল প্রাণী যে পুরাণকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, এমন নহে। অনেক পুরাতন গ্রন্থে ইহাদের বহু বর্ণনা এবং অন্য প্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যদিও পুরাণে তৃণভোজী জীবগণের ছাগ, মেষ, গো, মহিষাদি ক্রমে বর্ণনা আছে, তথাপি এই সকল প্রাণীকে বরাহ ও নৃসিংহ এতদুভয়ের কোনও শ্রেণীগত করা যায় না। ইহা হইতে বোধ হয়, পুরাণকারগণ কৃত জীব পর্য্যায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত হয় নাই। কালস্রোতে পৌরাণিক জীবপর্য্যায়ের অন্তর্বর্ত্তী দুই একটী শ্রেণী সূত্র-বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

উদ্ভিদ্ বিকাশ ও জীব বিকাশ যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অগ্রসর হইয়াছে, জীববিকাশ মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিকাশ, সেইরূপ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এক জাতীয় জীবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, যে তদপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় জীবের বিকাশ হইয়াছে, এরূপ নহে। পন্নগ জাতীয় জীবের মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্প বিকাশ দ্বারা পন্নগ জাতীয় জীবের বিকাশ সম্পূর্ণ হইয়াছে। জাতীয়ত্ব গণনায়, ভেক সরীসৃপ জাতীয় বিধায়, পন্নগ জাতীয় সর্প অপেক্ষা উচ্চতর। কিন্তু সর্প সৃষ্টি হওয়ার পরে ভেকের সৃষ্টি হয় নাই। পূর্ব্ব-বর্ণিত সৃষ্টি-পোষণ নিয়মানুসারে, খাদ্য কিঞ্চুলুক সৃষ্টি হওয়ার পরে খাদক ভেকের এবং খাদ্য ভেক সৃষ্ট হওয়ার পরে খাদক সর্পের সৃষ্টি হইয়াছে। জাতীয়ত্ব গণনায়, মাংসাশী পশু তৃণোদ্ভিদ্ভোজী পশু অপেক্ষা উচ্চ; কিন্তু

তৃণোদ্ভিদ্‌ভোজী পশুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ কুঞ্জর সৃষ্ট হওয়ার বহু পূর্ব্বে মাংসাশী পশুর সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী শৃগালাদি সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ কপি জাতীয় জীব সৃষ্ট হওয়ার পর মানবের সৃষ্টি হইলেও, বানর বিকাশ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মানবের সৃষ্টি হইয়াছে।

আম মাংস ভুক্‌ চতুষ্পদ প্রাণীর সৃষ্টি পর্য্যায় আলোচনা করিলে, সিংহ যে এই শ্রেণীর শেষ এবং সর্ব্বোচ্চ বিকাশ, সহজেই তাহার উপলব্ধি হয়। সর্ব্বদেশেই প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই মহৎ পশুর গুণানুশীলন করিয়াছেন এবং সকলেই একবাক্যে সিংহকে মৃগেন্দ্র বা পশুরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব বিচারে হিন্দু পুরাণকারগণ যেরূপ সম্পূর্ণ ভাবে সিংহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেরূপ আর কোন দেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলী করিতে পারেন নাই। সৃষ্টি পর্য্যায়ে হিন্দু পৌরাণিকগণ, সিংহকে নৃসিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা সিংহের পশুত্বে মনুষ্যের স্থূল-বিচার-বুদ্ধির পূর্ব্বাভাব সূচিত হইতেছে। সিংহচরিত্র পরবর্ত্তী মানব সৃষ্টির যবনিকা স্বরূপ। এই পটোৎক্ষেপণে, প্রথমতঃ বানরাদি কাচুক নিচয়ের রঙ্গনৃত্যের পর,প্রকৃত মানবলীলাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। ফলতঃ, জীবসৃষ্টি বিকাশ প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে এক মহা নাট্যাভিনয় স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। প্রথম অঙ্কে দৃশ্যপট সলিল, শৈবাল; অভিনেতা মীনগণ। দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্যপট সলিল, কর্দ্দম, শৈবাল; অভিনেতা কূর্ম্মগণ। তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্যপট কর্দ্দম, মৃত্তিকা, শৈবাল (তৃণ); অভিনেতা বরাহ বর্গ। চতুর্থ অঙ্কে দৃশ্যপট তৃণ, গুল্ম, লতা; অভিনেতা ছাগ, মেষ, গো, মহিষ। পঞ্চম অঙ্কে দৃশ্যপট বিটপী, বল্লরী; অভিনেতা একদিকে বিহঙ্গবর্গ, অন্যদিকে ঋক্ষ, শার্দ্দুল, (কুঞ্জর), কেশরী। তৎপরে এক বা দুই অঙ্কে নাট্য সমাধা হইয়াছে। কপি এবং নরাভিনয় এক অঙ্কে বা সুবিধার জন্য দুই অঙ্কে ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেক অঙ্কের গর্ভাঙ্ক আছে, পূর্ব্বে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আবার উপরোক্ত প্রধান অভিনেতাগণ ব্যতীত, প্রত্যেক গর্ভাঙ্কে অনেক নিম্নতর অভিনেতাও আছে। যাহা হউক, হিন্দু পৌরাণিকগণ যে কেবল সিংহকে নৃসিংহ বলিয়া তাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহারা সৃষ্টি পর্য্যায়ের মধ্যভাগের একটী সুপরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়া, যেমন উজ্জ্বলবর্ণে তাহার সমস্ত অঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তেমনি, সিংহের প্রকৃত স্থানও ঐ চিত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পুরাণকারগণের উদ্ভাবিত জগদ্ধাত্রী প্রতিমা যে সৃষ্টি পর্য্যায় মধ্য ভাগের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সর্ব্বো-

ৎকৃষ্ট চিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহিষদলন-রত মাতঙ্গ-মস্তকন্যস্তপদ কেশরী পৃষ্ঠে বরাভয়ধারিণী জননী জগদ্ধাত্রী! 'জগদ্ধাত্রী' এই পবিত্র শব্দ কি গম্ভীর অর্থদ্যোতনা করে! মাতা আদ্যাশক্তি আমাদের জন্য জগৎ ধারণ করিয়া আছেন এবং মূঢ়মতি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন, ও বলিতেছেন 'এই যে বিপুল বলশালী দুরন্ত মৃগনিচয় আমার পদতলে পরম্পরায় পড়িয়া আছে, ইহারা আমারই শক্তিসম্ভূত এবং আমিই এই পর্য্যায়ে ইহাদের সৃজন করিয়াছি। মা ভৈ! ভয় করিও না! বর গ্রহণ কর!—প্রণিধান পূর্ব্বক বোধগম্য কর!' পুরাণ-কারগণের উদার হৃদয়ে এই সমস্ত গরিষ্ঠ ভাব সমুদিত হইত। এক্ষণে আমাদের বিস্মৃতিবিমলিন সঙ্কীর্ণান্তঃকরণে এরূপ ভাবের আভা অনুমাত্রও প্রতিফলিত হয় না।

হিন্দু পণ্ডিতগণ, সাধারণতঃ, বানর শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ 'যে বনে রমণ বা ক্রীড়া করে' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সুধী রায়মুকুট বানর শব্দের যে সকল অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা হইতে সৃষ্টি পর্য্যায়ে বানরের স্থান বা শ্রেণী নিরূপণ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। রায়মুকুট বানর শব্দের তিন অর্থ প্রদান করেন :—(১) বনের অপত্য বানর। (২) বা = তুল্য, নর = মনুষ্য, যে মনুষ্য তুল্য। (৩) যে বান অর্থাৎ বন ভব ফল গ্রহণ করে। এই তিন সংজ্ঞার প্রথম ও তৃতীয় হইতে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়, সুস্বাদু ফলপ্রসূ বৃক্ষ নিচয়ের সৃষ্টি ও তাহাদের ফলাগমের পর বানর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। রায়মুকুটপ্রদত্ত বানর শব্দের দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে, পুরাণকারগণকৃত সৃষ্টি পর্য্যায়ের "বামননরের' সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য প্রমিত হয়। প্রথমতঃ, বামন শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। 'বামি' ধাতুর অর্থ বিপরীত বলা। যে সাধারণ প্রাণীর প্রমাণ হইতে বিপরীত বা উন উক্ত হয়,সেই বামন। বামন শব্দ খর্ব্ব, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র, অল্প, নীচ, এই সকল অর্থ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, নরশব্দের বৈয়াকরণিক সমাধানে আমরা দেখিতে পাই, লওয়া বা পাওয়ার্থক 'নৃ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অ প্রত্যয় করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে ভাবাদিক বা আত্মার উন্নতি প্রাপ্ত হয়, সেই নর। এই সকল অর্থদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, পৌরাণিকগণ যে জীবের 'বামননর' সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই পরে বানর ও বামন উক্ত হইয়াছে। উচ্চারণ সংক্ষেপ হেতু, 'বামন নর' শব্দের মধ্যস্থিত ম ন অক্ষরদ্বয় ত্যাগ করিয়া 'বানর' এবং শেষস্থিত ন র বর্ণদ্বয় ত্যাগ করিয়া 'বামন' শব্দ ক্রমশঃ কথিত ও লিখিত ভাষায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ বানর বামননর

ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকৃতি, প্রকৃতি, আত্মিক উন্নতি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে বানর খর্ব্বনর বা চলিত ভাষানুযায়ী বামন। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে এই বানর বা বামনের দৈহিক ও আত্মিক পূর্ণবিকাশ হইয়া নর বা মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মনস্বী রায়মুকুট, প্রকৃত প্রস্তাবে, এইরূপ আভাষ দিয়াছেন।

দেব ও দানব।

অধুনাতন জড়বিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার হেতু মানবগণ, সাধারণতঃ, বাহেন্দ্রিয় গ্রহণাতীত কোনও বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন না। অথবা, মানব মন অত্যধিক পরিমাণে বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থে ব্যাপৃত থাকায়, কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতি কল্পে মনের যতদূর ঔৎকর্ষ্য সাধন করা আবশ্যক, সাধারণ মানবকুল তাহা করিতে পরাঙ্মুখ। বিস্মৃতি ভার-প্রপীড়িত হইয়া, আমাদের মন এরূপ অলস ও তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে যাহা দেখাইয়া দেয়, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তদতিরিক্ত কোনও বিষয়, ঘটনাক্রমে, আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেও, আমরা তাহা অসত্য বিবেচনা করিয়া, তৎসংস্পর্শে মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কায় ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেই। সুতরাং জড়বিজ্ঞান সীমার বাহিরে কোনও সত্য থাকিলেও, তাহা অনুসন্ধান করিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি, আদৌ, আমাদের সমুদ্ভূত হয় না। পূর্ব্বে পৌরাণিকগণের বর্ণিত এরূপ অনেক বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। অতএব পুরাণ-কারগণের বর্ণনা অলীক উপন্যাস নহে। আবার, যেহেতু, সর্ব্বদেশীয় পুরাণে দেব ও দানবগণের অস্তিত্ব বিষয়ে ঐকমত্য আছে, সুতরাং, আমাদের ইহা অবিশ্বাস করার কারণ নাই; বরং ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত। বস্তুতঃ, সর্ব্বদেশীয় পুরাণেই, কেবল যে দেবাসুরগণের অস্তিত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।- তাঁহাদের মানবাতীত ক্ষমতা, মানবগণের উপর তাঁহাদের আধিপত্য, দেব ও অসুরগণের ভীষণ সংগ্রাম প্রভৃতি ভূরি ভূরি আশ্চর্য্য বিবরণ পুরাণমালার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। দেব (Deity) ও দৈত্য বা দানব (Demon) উভয়েই, স্বভাবতঃ, স্থূল শরীর বিহীন আত্মিক প্রাণী (Being)। আবার, ইচ্ছানুযায়ী, ইঁহারা পার্থিব বা যে কোনও কৃত্রিম স্থূল কায়া ধারণ করিতে পারেন। পঞ্চভূতাত্মক দেহাতীত বলিয়া, ইঁহারা দেহধর্ম্মাক্রান্ত নহেন।

ইঁহাদের বাল্য, যৌবন, জরা, মরণ প্রভৃতি অবস্থাভেদ নাই। ইঁহারা ক্ষিতি অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম কর্ত্তৃক আবিষ্ট হন না; পরন্তু ইহাদের সকলেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারেন। এই সমস্ত পৌরাণিক তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয়, বিস্মৃতি-নিমজ্জিত সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃ হইতে, নিমজ্জন মাত্র, কাল ও ব্যাপ্তি বিকাশপ্রাক্, এমন কতকগুলি অবহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূক্ষ্ম আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা সৃষ্টিলীলা সমবায় জন্য, ব্রহ্মাণ্ডাবসান পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবেন। ঈশ্বর নিয়োগে, যদিও ইঁহাদের কাহারও কাহারও, কখনও কখনও, পৃথিব্যাদি লোকে স্থূলদেহে ক্ষণকাল নিবসতি করিতে হয়, তথাপি নিরূপিত সময়ান্তে পুনরায় তাঁহারা স্ব স্ব সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হইয়া সহচরগণের সহিত মিলিত হন। এই সকল আত্মাভিন্ন, বিস্মৃতি-নিক্ষিপ্ত অপর সমস্ত বীজের, পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে, প্রথমতঃ স্থূলবিকাশ এবং পরে সূক্ষ্মবিকাশ হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা যদিও সৃষ্ট, তথাপি পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়গতবিকাশ প্রক্রিয়াধীন হন নাই। এই সমস্ত সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ ঈষৎ বিস্মৃতিস্পৃষ্ট হইলেও, বিকাশ প্রক্রিয়াগত বস্তুর ন্যায় বিস্মৃতির গাঢ় আবরণ মণ্ডিত নহেন। এজন্য কাল এবং ব্যাপ্তি অন্যান্য সৃষ্ট জীবের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, ইঁহাদের উপর সেরূপ পারে না। পৌরাণিকগণ দেব ও দানবগণকে 'ত্রিকালজ্ঞ' আখ্যা দিয়াছেন। ফলতঃ বিকাশ প্রক্রিয়াধীন জীবের ন্যায় ইঁহাদের ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ইত্যাকার কাল বৈষম্য নাই। আমরা বর্ত্তমানের তুলনায় যাহা ভূত বা ভবিষ্যৎ, বিবেচনা করি, তৎসমস্ত ইঁহারা বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। বিস্মৃতি-বিভ্রম-নিবন্ধন মানবের যেমন কাল ও ব্যাপ্তিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন যবনিকান্তরালের অস্তিত্বোপলব্ধি হয়, ইঁহাদের সেরূপ হয় না। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে হইতেছেনা, আমরা তাহা গত বিবেচনা করিয়া, কালক্ষেত্রে অতীত রূপ পটের অন্তরালে নিক্ষেপ করি। আমরা যাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতেছি, তাহা আছে, এইরূপ বিবেচনা করি। আবার যাহা এক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছেনা, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা আছে, আমরা তাহা আগামী বিবেচনা করিয়া, উহা কালক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ রূপ পটের অন্তরালে নিক্ষেপ করি। দেব ও দানবগণ দেখিতে পান, আমরা যাহা অতীত বিবেচনা করি, তাহা আছে, আমরা যাহা বর্ত্তমান বিবেচনা করি, তাহা আছে এবং আমরা যাহা ভবিষ্যৎ বিবেচনা করি, তাহাও আছে। আমরা বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে ব্যাপ্তি আয়ত্ত করিতে না পারি,

মনদ্বারা তাহা আয়ত্ত করিতে পারি। আমাদের মন অত্যধিক বিস্মৃতিগ্রস্ত এবং বহিরিন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট হইয়া ক্রিয়াকরণে অভ্যস্ত হইলেও, আমরা নিমেষে মনদ্বারা নয়নসীমাতীত সুদূরবর্ত্তী বস্তু দেখিতে পাই, অথবা আমাদের মন বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে সুদূর দেশে যাইতে পারে। ইংলণ্ড-প্রবাসী বাঙ্গালী লণ্ডন নগরে বসিয়া, নিমেষে, তাঁহার কলিকাতাস্থ স্বজনগণকে মনদ্বারা দর্শন করিতেছেন, অথবা তাঁহার মন নিমেষ মধ্যে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় তাঁহার স্বজনগণের নিকট আসিয়াছে। অতএব বাহ্যন্দ্রিয়ের তুলনায়, মনের দূরত্ব বোধ নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। দেব ও দানবগণ মনোময়: পরন্তু মানবমন অপেক্ষাও ইঁহারা অল্পবিস্মৃতিগ্রস্ত। ইঁহাদের দূরত্ব বোধ নাই। ইঁহারা বাঞ্ছা মাত্র ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতে পারেন, অথবা বিশ্বের সমস্ত বস্তু, এই সমস্ত আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়। তথাপি দেবাসুরগণ মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। যদিও অপরাপর সৃষ্টজীবের তুলনায় দেবাসুরগণ স্বল্প বিস্মৃতিগ্রস্ত, তথাপি ইঁহাদের মধ্যেও বিস্মৃতির তারতম্য আছে এবং এই তারতম্যানুসারে উচ্চ শ্রেণীর দেবাসুরগণ নিম্নশ্রেণীর দেবাসুরগণের মনোবৃত্তি উপলব্ধি করিতে পারেন; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর দেবাসুরগণ উচ্চশ্রেণীর দেবাসুরগণের মানসিক ভাব অনুধাবন করিতে পারেন না। হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ-বিজ্ঞানে (mythology) ইহার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার দেবগণ অপেক্ষা দানবগণ অধিক বিস্মৃতি-জড়িত। সুতরাং শ্রেণী গণনায় দানবগণ দেবগণের নিম্নতর।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা নিচয় হইতে প্রতীয়মান হয়, সৃষ্টিলীলা সমাধান জন্য সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ বিকাশ বৈচিত্র্য সূচনা স্বরূপ দেবগণকে প্রকৃত বা যোগাত্মক এবং দানবগণকে অপ্রকৃত বা বিয়োগাত্মক ভাবাপন্ন করিয়া সৃজন করিলেন। এজন্য সৃষ্টজগৎ দেবাসুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেবাসুরগণ কর্ত্তৃক পরিশাসিত হইতেছে। হিন্দু পুরাণকারগণ, দেবগণের প্রকৃত ভাব এবং দানবগণের অপ্রা-কৃত ভাব প্রদর্শন কল্পে, দেবগণের সুর এবং দানবগণের অসুর আখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সুর' শব্দ উৎকৃষ্ট দীপ্তিশালী অর্থ প্রকাশ করে। ফলতঃ দেবাত্মা-গণ ঐশ্বরিক দীপ্তি উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অসুর সুর-বিরোধী। দানবগণ দেবগণের বিরুদ্ধাচারী। এই ভেদ চিত্র স্পষ্টতর করিবার জন্য, পৌরাণিকগণ, রূপকে, দেবদানব পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কশ্যপ ভার্য্যা অদিতি হইতে দেবগণের এবং উক্ত মুনির অপরা

ভার্য্যা দিতি বা দনু হইতে দৈত্য বা দানবগণের জন্মবৃত্তান্ত পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রকৃত ও অপ্রকৃত ভাবাপন্ন, আবার কোনও কোনও বস্তু অধিক পরিমাণে প্রকৃত এবং কোনও কোনও বস্তু অধিক-পরিমাণে অপ্রকৃত ভাবাপন্ন। এই নিয়মে সৃষ্টিসাম্য রক্ষিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণ প্রকৃত ভাবের এবং দানবগণ অপ্রকৃত ভাবের আধার স্বরূপ। এই সমস্ত আধার হইতে বিকাশগত সৃষ্ট বস্তু প্রকৃত ও অপ্রকৃত ভাবে রঞ্জিত হইতেছে এবং সৃষ্টির অবসান পর্য্যন্ত, প্রত্যেক আধার পূর্ণ ও অনিঃশেষ ভাবে বিদ্যমান থাকিবে। দেবগণ স্বত্ব বুঝিতে পারিয়া, ঈশ্বরে মিলিত হইবার জন্য, সতত ব্যবধান পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অসুরগণ তাঁহাদের গতির বাধা জন্মাইয়া দেয় এবং তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে না দিয়া পশ্চাৎ দিকে টানিবার চেষ্টা করে। ইহাই দেবাসুর সংগ্রাম। সৃষ্টিরক্ষার্থ ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত; কারণ প্রকৃত ভাবের আধার দেবগণ ঈশ্বরে মিলিত হইয়া গেলে, সৃষ্ট জগৎ, কেবল অপ্রকৃত ভাব রঞ্জিত হইয়া বিস্মৃতির গাঢ় আবরণে ভীষণ নরক স্বরূপ হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে এবং দেবাসুর-ভাবগত জীব-জগতের সর্ব্বত্র এই সংগ্রাম বহ্নির লক্ লক্ শিখা পরিলক্ষিত হয়। সংসারাসক্তি জীবকে বৈরাগ্য পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। মানব মন প্রকৃতাপ্রকৃত ভাবের ভীষণ সমর-ক্ষেত্র। কারণ হিতাহিত বুদ্ধি-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব মানব-মনে প্রকৃত ও অপ্রকৃত উভয় ভাবই প্রবলবেগে উদ্দীপিত হয়। মনের স্বাভাবিক অবস্থায়, একদিকে সারাৎসার ঈশ্বর একমাত্র অবলম্বন ঈদৃশী সুবুদ্ধি এবং অন্যদিকে সাংসারিক ও সমাজিক কর্ত্তব্যতা বোধ মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং মানব মনে রণবাদ্য বাজিয়া উঠে। প্রথমতঃ, অপ্রকৃত ভাবেরই জয়াশা পরিলক্ষিত হয়। মানব অপ্রকৃতকে প্রকৃত বিবেচনা করিয়া, অপ্রকৃত ভাব আশ্রয় করে। স্বকীয় পরি-বারবর্গের ভরণপোষণ, পিতৃমাতৃ ভক্তি, সন্তান-বাৎসল্য, স্বজন-স্নেহ, সামাজিক প্রীতি, জনানুরাগ প্রভৃতি যোগে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাই মানব পরম সুখকর বোধ করে। ক্রমশঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে মানব-মন অধিকতর বিস্মৃতি-প্রলিপ্ত হইয়া স্বার্থান্ধ ও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু হিন্দু পৌরাণিক-গণ আমাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস বাণী দিয়াছেন। পরিণামে দেবগণের জয় এবং অসুরগণ পরাভব প্রাপ্ত হয়। মানব মনেও পরিণামে প্রকৃত ভাবেরই জয় হয়। যদি একজন্মে না হয়, জন্মজন্মান্তরে মানব মনের এই পরিণাম সমাহিত হয়।

পরিণামে, মানব মনে জ্ঞানদীপ্তি প্রভাবে বিস্মৃতি বিদূরিত হইয়া যায়। মানব, তখন, বিশুদ্ধান্তঃকরণে দেখিতে পান, ঈশ্বরই একমাত্র প্রকৃত বস্তু; সমাজ, সংসার সমস্তই অপ্রকৃত। তথাপি, সমাজ সংসার ঈশ্বরের সৃষ্ট,সুতরাং মানবের অনতিক্রমণীয়। মানব, সামাজিক ও সাংসারিক ধর্ম্ম পালন না করিলে, ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না। সামাজিক ও সাংসারিক কর্ত্তব্যতা পালন দ্বারা সার-বস্তু লাভ করা যায়। সমাজ সংসার অপ্রকৃত হইলেও প্রকৃত বস্তু লাভ করিবার উপায় এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টির ইহাই পবিত্র রহস্য। এইরূপে, দেবাসুর ভাবগত সৃষ্ট জগতে, অপ্রকৃত দ্বারা প্রকৃত লাভোদ্দেশ্যে, সৌক্ষ্মবৈকাশিক পুরোবর্ত্তন প্রক্রিয়া সমাহিত হয়।

রাজকর্ম্মচারীগণ যেমন রাজকীয় ক্ষমতা চালন ও রাজকার্য্যাবলী সম্পাদন করেন, দেবাসুরগণও সেইরূপ ঐশী ক্ষমতা পরিচালন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম পরম্পরা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যোগ্যতানুসারে দেবগণ স্বস্ব দিব্যপদ-রাজীতে অধিষ্ঠিত আছেন। হিন্দু পুরাণকারগণ, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের,এই অষ্টদিক্‌পাল বা দেব শাসন-কর্ত্তার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা সৃষ্টি রক্ষার্থ প্রাকৃতিক শক্তি নিয়মিত করিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর দেবগণ এবং অসুরগণ ঈশ্বরের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ভাগ্য ফল-সম্ভোগে জীবকুলকে প্রেরণা করেন। আমরা যাহাকে সুফলভোগ বলি, তাহাতে দেবগণ এবং আমরা যাহাকে কুফলভোগ বলি, তাহাতে অসুরগণ চালক স্বরূপ হইয়া থাকেন। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায়, জীব আশ্চর্য্যরূপে পতনোন্মুখ বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। চলিত ভাষায় আমরা ইহাকে 'কাণের নিকট দিয়া তীর যাওয়া' বা 'ফাঁড়া কাটিয়া যাওয়া' বলিয়া থাকি। এই সকল স্থলে দেবদূতগণ জীবকে বিপদ-মুক্ত ও সুফল ভোগ করাইয়া দেন। আবার অনেক স্থলে জীব অভাবনীয় রূপে বিপদগ্রস্ত হয়। আমরা, অনেকের আকস্মিক বিপদে, তাহাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া, পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। ফলতঃ এই সকল স্থলে দৈত্যদূতগণ জীবকে দৃশ্যমান বিপদে পাতিত করিয়া কুফল ভোগ করান। সংসারে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির দৈবানুগৃহীত হওয়া এবং বিপন্ন ব্যক্তির কুগ্রহান্বিত হওয়ার সাধারণ প্রবাদ প্রচলিত আছে। মানবমনে, দেবগণ উন্নতি পথে ধাবিত হইবার এবং দানবগণ অবনতি পথে চলিবার প্রবৃত্তি সঞ্চার করেন।

মোহ বশতঃ, মানবগণ মধ্যে একপক্ষে যেমন অনেকে দেবাসুরগণের অস্তিত্ব

স্বীকারে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করেন, অপর পক্ষে, আবার, তেমনি কেহ কেহ তাঁহাদিগকে ঈশ্বর স্বরূপ বিবেচনা করেন। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ, ভ্রমক্রমে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণকে, অযথা, পৌত্তলিক ও বহু ঈশ্বরোপাসক বলিয়া ঘৃণা করেন। হিন্দুগণ, যদিও, দেবাসুরগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তথাপি, তাঁহাদের অনেকেই, দেবাসুরগণকে ঈশ্বর স্বরূপ উপাসনা করেন না। তাঁহারা জানেন, পার্থিব তুলনায়, রাজকর্ম্মচারীগণ রাজক্ষমতা পরিচালন করিলেও, যেমন ঐ সকল রাজকর্ম্মচারী রাজা নহেন, সেইরূপ, দেবাসুরগণ ঐশী ক্ষমতা পরিচালন করিলেও দেব বা দানব ঈশ্বর নহেন। দেব ও দানব ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণী মাত্র। পৌত্তলিকতা বা বহু ঈশ্বরোপাসনা আদৌ হিন্দু ধর্ম্মসম্মত নহে, এ বিষয় পরে সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইবে। হিন্দুগণের মধ্যে কেহ কেহ দেবাসুরগণকে, অজ্ঞতা নিবন্ধন, ঈশ্বর স্বরূপ উপাসনা করেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও হিন্দুধর্ম্মসম্মত বা হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব নহে। সকল ধর্ম্মেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, কাল্পনিক বস্তুকে ঈশ্বর বোধে পূজা করিয়া থাকেন। বরং, তুলনায়, হিন্দু ধর্ম্মে এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। যাহা হউক, উপরোক্ত পক্ষদ্বয় যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা ভ্রান্তি এবং সঙ্কীর্ণান্তঃকরণতার পরিচায়ক। সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে এপর্য্যন্ত যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে সহজেই প্রতীতি হইবে, ব্রহ্মাণ্ড যদিও সচ্চিদানন্দ শক্তির বিকাশ, তথাপি বিস্মৃতির আবরণ নিবন্ধন জগতে সর্ব্বত্র সমতুল ভাবে ঐশী শক্তির বিকাশ হয় নাই। পর্য্যায়গত বিকাশপ্রাপ্তবস্তু মধ্যে মানব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা, সূক্ষ্মভাবে মানবে ঐশী শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ হইয়াছে। নিম্নতর জীব নিচয় মানবকে ঈশ্বর বিবেচনা করিলেও মানব ঈশ্বর নহে। এমন কি, মানবগণের মধ্যেও এক জাতি বা একদেশবাসী, অপর জাতি বা অপর দেশবাসী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হন। এক জাতির মধ্যেও, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। মানসিক উন্নতির তারতম্যে, উৎকৃষ্ট জন নিকৃষ্ট জনের শ্রদ্ধা, সম্মান, ভীতি ও আদরের পাত্র, সন্দেহ নাই। মানব সমাজ, দৃশ্যতঃ কৃত্রিম প্রতীয়মান হইলেও, ঈশ্বরাভিপ্রায় অনুসারে গঠিত। সুতরাং যদ্বারা সমাজ রক্ষিত বা পুষ্ট হয়, তাহাও ঈশ্বরের অনুমত। সমাজ রক্ষাকল্পে, লঘু জনের যেমন গুরুজনকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করা উচিত, গুরুজনেরও সেইরূপ লঘুজনের প্রতি উপযুক্ত আদর প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। সৃষ্টি রক্ষার্থ, ভগবান যেমন

সন্তানের হৃদয়ে পিতৃমাতৃ-ভক্তি ও পিতামাতার অন্তঃকরণে সন্তান-বাৎসল্য প্রদান করিয়াছেন, সমাজ পোষণোদ্দেশ্যে, তেমনি তিনি প্রত্যেক মানবের মনে অপরাপরের প্রতি ন্যায্য আদর প্রদর্শন করিবার প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু বিস্মৃতি বশে স্বার্থান্ধ মানব, সমাজে অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে ভাগ্য-বিধাতা গণনা করিয়া, ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করে। এরূপ বিস্মৃতিগ্রস্ত মানবের অস্তিত্ব কোনও দেশ, জাতি বা ধর্ম্ম বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। ফলতঃ, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ব ধর্ম্ম মধ্যে, অল্লাধিক পরিমাণে এরূপ হতভাগ্য মনুষ্যের বিদ্য-মানতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষীভূত মানবকে মানব যদি ঈশ্বর বোধে পূজা করিতে পারে, তাহা হইলে, অবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবগণে যে মানবের ঈশ্বর ভ্রম হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

মনের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া, মানব সমাধিপ্রাপ্ত বা ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারেন, পূর্ব্বে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সুতরাং মানসিক উন্নতি-বলে দেবত্ব বা অসুরত্ব লাভ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। হিন্দু পুরাণে এরূপ বর্ণনা আছে, দেবরাজ ইন্দ্র মানব নিচয়ের তপশ্চর্য্যায়, অনেক সময়ে স্বরাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা করিয়াছেন। ফলতঃ মানব ইচ্ছা করিলে মনোবল দ্বারা দেবরাজত্ব লাভ করিতে পারেন। যোগাভ্যাসে মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া, মনুষ্যগণ দেহত্যাগ পূর্ব্বক, রুচি অনুসারে, দেবাত্মা বা দানবাত্মাগণের সহিত মিলিত হইতে অথবা ভৌতিক শরীরে দেবত্ব কিম্বা অসুরত্ব লাভান্তর দৈব কিম্বা আসুরিক ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে পারেন। অনেক যোগবলসম্পন্ন ব্যক্তির অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। যদিও দেবত্ব ও তন্ন্যুন অসুরত্ব-প্রাপ্তি, মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে, তথাপি, সাধনার দ্বারা এই সকল লোকাতীত ক্ষমতা অর্জ্জন করা প্রকৃষ্ট মানসিক উন্নতির পরিচায়ক। এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা একদিকে যেমন দেব ও দানবগণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, অপর দিকে সেইরূপ, মানব মন যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বিকাশে বিস্মৃতি-মুক্ত হইয়া, উচ্চতর সোপানাবলীতে আরোহণ করিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করা যায়।

বিকাশ পর্য্যায়ে ভূমণ্ডলে মানব অপেক্ষা উন্নত প্রকৃতির জীবাবির্ভাব সম্বন্ধে আধুনিক বিবর্ত্তবাদীগণ যে অনুমান করেন, তাহা প্রকৃত নহে। দার্শনিকগণের মতানুযায়ী মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাম, মনোবৃত্তি ও মানসিক সমৃদ্ধি বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মানব ইচ্ছা করিলে, আত্মোন্নতি দ্বারা যে কোনও উচ্চ-তর প্রাণীর সমকক্ষ হইতে পারেন। সুতরাং ধরাধামে মানবাপেক্ষা উচ্চতর

জীবাবির্ভাবের আবশ্যকতা নাই। দৃশ্যমান পর্য্যায়গত বিকাশে মনুষ্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং বিবর্ত্তবাদীগণও তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা দ্বারা ক্রমশঃ মানবের মানসিক উন্নতি সাধিত হইতেছে বিবেচনায় তাঁহারা যে আশাবতী ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। যুগপর্য্যায়ে, বিস্মৃতি প্রভাবে, ক্রমশঃ মানবের যে মানসিক অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ, মানব শিক্ষাবিধান জন্য, মানবাপেক্ষা উন্নত প্রকৃতির জীব, অগ্রেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা পর্য্যায়গত বিকাশ প্রণালীর অনধীন দেব ও দানব।

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়-বিরচিত সমন্বয় গ্রন্থে
বিশ্বোৎপত্তি নামা তৃতীয় অধ্যায়।

কালচক্রনামা

চতুর্থ অধ্যায়।

যুগপর্য্যায় এবং সভ্যতা।

হিন্দু পৌরাণিকগণ যেরূপে পূর্ব্বাধ্যায়-বর্ণিত পৃথিবীর দেশ বিভাগ নিষ্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, সর্ব্বদেশ মধ্যে পুণ্যক্ষেত্র জম্বুদ্বীপ প্রথমে সলিল হইতে সঞ্জাত হয়। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভূভাগ মধ্যেও, আবার, আধুনিক কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী আসিয়া মহাদেশের মধ্য খণ্ড প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে। কশ্যপ নামা কোনও মুনি এই হ্রদতটে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া, উহা কাশ্যপীয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে, উচ্চারণ-সারল্য বা সংক্ষেপ কিম্বা ভাষা বৈষম্য হেতু, 'কাশ্যপীয়' শব্দ প্রথমে কাশ্যপীয়ান এবং পরে কাস্পিয়ানে রূপান্তরিত হইয়াছে। কশ্যপ মুনির সম্মান ও স্মৃতি রক্ষার্থ, হ্রদ যদি কাশ্যপীয় উক্ত হয়, তাহা হইলে, তত্তীরবর্ত্তী তাঁহার পবিত্র অবস্থিতি প্রদেশ একই নামে অভিহিত হইতে পারে। ফলতঃ, যদিচ, এই প্রদেশ এক্ষণে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া, খণ্ডগত নামমালায় সমলঙ্কৃত হইয়াছে, তথাপি, পূর্ব্বে ইহা কাশ্যপীয় প্রদেশ রূপে পরিচিত ছিল। কাশ্যপীয় প্রদেশ যেমন সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হয়, তেমনি ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যজাতির আবির্ভাব হয়। প্রথমাবির্ভূত বলিয়াই হউক বা অপর যে কোনও কারণেই হউক—যাহা কেবল মাত্র ভগবানেরই বিদিত—ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং প্রিয়জীব মানবকুল মধ্যে কাশ্যপীয় প্রদেশবাসীগণ পরমপিতার প্রিয়তম হইলেন এবং পরমপিতা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অপিচ, সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা প্রীত হইয়া, সৌভাগ্যশালী কাশ্যপীয় প্রদেশবাসীগণের মধ্য দিয়া, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃরূপা সভ্যতা বিস্তার করিবার বাঞ্ছা করিলেন। মানব সৃষ্টির পর, করুণাময় ঈশ কতিপয় দেবাত্মাগণের উপর তাঁহাদের শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন এবং ঈশ্বরাদেশে এই সকল দেবাত্মাগণ, যথাক্রমে, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ নামে বিশ্রুত এবং প্রজাপতি রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, প্রজাগণের শিক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত মহর্ষি-মানবরূপী দেব শিক্ষকগণ মনীষী কাশ্যপ প্রদেশ বাসীগণকে তাঁহাদের

শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিমান জ্ঞানস্বরূপ প্রজাপতি দশকের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইত এবং তাঁহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত কাশ্যপ প্রদেশীয় জনগণান্তঃকরণে তাঁহাদের উজ্জ্বল জ্ঞানভাতি সমভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হইলেন। ধীমান মানবপ্রবর কাশ্যপ জানপদগণ অনতিকালমধ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রত্যেক প্রকার জীব এবং তাহাদের স্বভাব ও ধর্ম্ম, প্রত্যেক প্রকার বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি এবং তাহাদের ফুল,ফল ও গুণাগুণ, প্রত্যেক প্রকার জড় পদার্থ এবং তাহাদের ব্যবহার সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেন। প্রজাপতিগণের উপদেশানুসারে তাঁহারা সমস্ত বস্তুর নামকরণ করিলেন। তাঁহারা সৃষ্টিরহস্য অবগত হইয়া সৃষ্টির উপাদান নিচয় পরিজ্ঞাত হইলেন। তাঁহারা ব্যোমচারী গ্রহোপগ্রহাদির বিষয় বিদিত হইলেন। কিরূপে মানবের খাদ্য শস্যোৎপাদন করিতে হইবে,এবং কিরূপে তাহাদ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে, শ্রম সংক্ষেপ হেতু কোন্ কার্য্যে কি উপায়ে কোন্ পশুশক্তি-সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, কি উপায়ে শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং তন্নিবন্ধন আবশ্যকীয় দ্রব্যরাজী কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তৎসমস্ত বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহারা প্রজাপতিগণের উদ্ভাবিত অক্ষর বিদ্যা এবং সংখ্যাতত্ত্ব শিক্ষা করিলেন এবং ভাষাতত্ত্ব অবগত হইয়া ভাষাসৃষ্টি করিলেন। মানবের বাক্য প্রয়োগে নিয়ম সংস্থাপন করিলেন বলিয়া, তাঁহারা এই ভাষার 'সংস্কৃত' নামকরণ করিলেন। তাঁহারা, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি মানবীয় বিদ্যাতত্ত্ব বিদিত হইলেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মাদির বিষয় অবগত হইয়া, কিরূপে তদধীন জীব স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিলেন। সংসার সম-বায়ে, অপরাপর সৃষ্ট বস্তুর সহিত মানবের এবং মানবগণ মধ্যে পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ সংরক্ষণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা প্রজাপতিগণ কাশ্যপ দেশবাসী-গণকে সম্যক্ অবগত করাইলেন। কাশ্যপীয়গণ সমাজ পোষণ জন্য, সামাজিক নিয়ম প্রণয়ন প্রথা এবং শিল্প, কৃষি, সঙ্গীত, বাদ্য, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ব্যায়াম প্রভৃতি ক্রিয়াপদ্ধতি বিদিত হইলেন। সর্ব্বোপরি, মহর্ষি প্রজাপতিগণ কাশ্য-পীয়গণকে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়া, সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার প্রতি মানবের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। কাশ্যপ প্রদেশবাসীগণ সত্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেবকণ্ঠে, পরম পিতার স্তুতি ও ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান

মহিমাতুল্য তাঁহার সৃষ্ট সুন্দর দ্রব্যনিচয়ের গুণ গান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে ঐ প্রদেশ স্বর্গভূমি সদৃশ হইয়া উঠিল। প্রেমময় পরম পিতা প্রিয় সন্তানগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন জন্য, কাশ্যপ ভূমিবাসীগণ যখন যেরূপে ভগবানের আরাধনা করিতেন, তখন সেইরূপে তাঁহাদের সমক্ষে সমুদিত হইতেন। এইরূপে ঈশ্বরাভিপ্রায়ে মানব শিক্ষার বিধান করিয়া, দেবশিক্ষকগণ নিরূপিত কালাবসানে অন্তর্হিত হইলেন।

সত্যযুগ এবং সমাজ ধর্ম্ম।

দেবর্ষিগণের অন্তর্ধানের পর, শিক্ষিত কাশ্যপীয়গণ তাঁহাদের সন্তান সন্ততিবর্গের শিক্ষা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে বংশবিস্তার হেতু তাঁহাদের সংখ্যাধিক হওয়ায়, তাঁহারা সঙ্কীর্ণ কাশ্যপ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, কোনও সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে নিবসতি স্থান সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং প্রকৃতির-লীলা নিকেতন বহু নদনদী-বিধৌত হিমালয় গিরি দক্ষিণস্থ পবিত্র ভূমি তাঁহাদের বাসস্থানের উপযুক্ত, এইরূপ স্থিরীকৃত করিলেন। ইহাতে পরমনিয়ন্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল—যাহা সুসিদ্ধ হইবার জন্যই সমুদ্ভূত হয়। কারণ, পরম পিতা তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণের বাসের জন্য হিমাচলদক্ষিণভূমি সুরম্য করিয়া সৃজন এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণে তথায় বাস করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। হুতাশন সম দীপ্তিমান ভদ্র কাশ্যপীয়গণ তাঁহাদের উক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট বাসভূমিতে আগমন করিলে, তাঁহারা তথায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন; এজন্য তাঁহারা আপনাদিগকে 'আর্য্য' নামে অভিহিত করিলেন। কেননা 'ঋ' ধাতু প্রথমতঃ 'গমন করা' এবং দ্বিতীয়তঃ 'প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়া' অর্থ প্রকাশ করে। হিমাচল দক্ষিণবর্ত্তী কর্ম্মভূমি যেমন, একদিকে, ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত হওয়া বিহিত হইয়াছিল, অন্যদিকে, তেমনি, হিন্দু পৌরাণিকগণ আর্য্যগণের তথায় আগমন ঘটন হইতে সত্যযুগারম্ভ কাল গণনা করেন। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, প্রথমতঃ, বিন্ধ্যাচলোত্তরবর্ত্তী সমতল গাঙ্গেয় ভূভাগে তাঁহাদের বাসভবনাদি সংস্থাপন মনোনয়ন এবং উক্ত ভূভাগের আর্য্যাবর্ত্ত নামকরণ করিলেন। ভারতে আর্য্যগণের বাস-প্রতিষ্ঠা কল্পে, এই সময়ে, তাঁহাদের উদ্ভাবিত পরশু বা কুঠারাস্ত্রের বহুল ব্যবহার হইয়াছিল। মানবগণ পরশু সাহায্যে, বাসস্থান নির্ম্মাণ জন্য কাননপরিষ্কার, গৃহ নির্ম্মাণ জন্য বৃক্ষাদি কর্ত্তন, অন্যান্য সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন ও পশু আক্রমণ নিবারণ করিত এবং সর্ব্বদা কুঠার হস্তে ইতস্ততঃ

বিচরণ করিত। এজন্য পৌরাণিকগণ সত্যযুগের 'পরশুরামযুগ' খ্যাতি প্রদান করিয়াছেন। পরশু ও পরশ্বধ শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে, আর্য্যগণ কি উদ্দেশ্যে কুঠারাস্ত্রের উক্ত নামকরণ করিয়াছিলেন, সে কৌতুহল নিবৃত্ত হইতে পারে। পরশু = পর (শত্রু) — শৃ (হিংসা করা) + উ ; যে পর বা শত্রুকে হিংসা বা আঘাত করে। পরশ্বধ = পর — শ্বন্ (কুক্কুর)—ধ (ধে, পান করা + অ) যে কুক্কুরের ন্যায় শত্রুকে ভক্ষণ করে বা তাহার রক্ত পান করে। আবার 'রম্' ধাতুর অর্থানুসারে, পৌরাণিকগণ সৃষ্টি পর্য্যায়ে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর বা আনন্দ-দায়ক জীব মানবের সাধারণ 'রাম' নামকরণ করিয়াছেন, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। ভারতে সত্যযুগের প্রথমাবস্থায় মানবগণ কুঠার ধারণ তৎপর ছিল বলিয়া, পৌরাণিকগণ যেমন এই যুগকে পরশুরাম যুগ বলিয়াছেন, সেইরূপ দ্বাপর যুগে মানবগণ বলদর্পী ছিল বলিয়া, তাঁহারা উহার 'বলরামযুগ' আখ্যা দিয়াছেন। পুনশ্চ, রাজ-ধর্ম্মানুযায়ী আদর্শ মানব শ্রীরামচন্দ্রের নামানুসারে, পুরাণকারগণ ত্রেতা যুগকে'রাম যুগ'নামে বিখ্যাত করিয়াছেন। এজন্য পৌরাণিক বিকাশ পর্য্যায়ে বামনের পর পরশুরাম, রাম ও বলরাম পর্য্যায়ত্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমণ্ডলে ক্রমোন্নত জীবাবির্ভাব পৌরাণিক ও আধুনিক বিবর্ত্তবাদীগণের মীমাংসাসম্মত হইলেও, হিন্দু পুরাণকারগণের বিবর্ত্তবাদে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। তাঁহাদের মতে, মানবাবির্ভাবের পর, যুগক্রমে যে মনুষ্যের মানসিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু. যুগচক্রে মানব মন ক্রমশঃ বিস্মৃতি-বিমলিন হওয়ায়, মনুষ্যের মানসিক অবনতি সাধিত হইয়াছে। যুগভেদে মানবের বিভিন্ন কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া, পৌরাণিকগণ তদনুসারে উক্তরূপে মানবের যুগগত পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ পুরাণকারগণ-প্রদত্ত পরশুরাম, রাম ও বলরাম পর্য্যায় যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের বিশেষ লক্ষণা সূচনা করে। প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে।

পরশুরাম শব্দের ভাবার্থ এবং সত্যযুগারম্ভে ভারতে আর্য্যবসতি কল্পে কিরূপ বিস্ময়কর কার্য্যপরম্পরা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা হিন্দুপুরাণকারগণ-বর্ণিত রূপক নিচয় হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ভৃগুনন্দন পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃ-অঙ্গে কুঠারাঘাত করিলেন। যে সকল প্রজাপতি বা দেবর্ষি মানবগণকে সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করেন, ভৃগু তাঁহাদের অন্যতম, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজাপতি ভৃগুর শিক্ষাধীন মানবকুল তাঁহার সন্তানোপম এবং তিনি শিষ্যগণের পিতৃকল্প। কিরূপে পরশু সাহায্যে বৃক্ষাদি ছেদন এবং

১০

পশু-আক্রমণ নিবারণ করিতে হয়, তাহা ভৃগু-প্রদত্ত উপদেশ বলে প্রথমে মনুষ্যের হৃদ্গত হয়। প্রকৃতিদেবী আমাদের জননী। সলিল, মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জড়, উদ্ভিদ, জীব সকলই প্রকৃতি-মাতার অঙ্গ। পরশুধারী মোহিতকারী জীব মানব ভৃগুপিতার শিক্ষা বলে গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য কাননে প্রবেশ করিয়া কুঠার দ্বারা বৃক্ষ লতাদি কর্ত্তন এবং বন্য হিংস্র পশু নিচয়কে আঘাত করিয়া নিহত বা বিতাড়িত করিলেন। কোনও কোনও পুরাণে পরশুরামের মাতৃ হত্যার বিবরণ আছে। তাহাও কুঠার দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই সময়ে অনেক নৈসর্গিক জীবোদ্ভিদ্ আহত বা নিহত হইয়াছিল। পরশুরামঃ কেবল এই প্রকারে মাতৃ-অঙ্গে আঘাত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সাংসারিক ব্যবহার জন্য, তিনি আবশ্যকীয় ধাতু প্রস্তরাদিও কুঠার দ্বারা সংগ্রহ করিতেন এবং তাঁহার অনেক প্রকার কুঠার ছিল। মনুষ্যবাস নিরাপদ করিবার জন্য, পরশু-রাম জাতি তাঁহার কুঠার দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, বিঘ্ন ও অপায় পরম্পরা নিবারণ করিয়া, ধরণীকে নিঃক্ষত্রা করিয়াছিলেন। হিন্দু পুরাণকারগণের রূপক বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, মহাতেজস্বী বীর্য্যবান পরশুরাম ক্ষতকারী জীবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, একবিংশতি বার তাঁহাদের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রা করিয়াছিলেন। সর্প, ঋক্ষ, শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যময় প্রদেশে সুসভ্য আর্য্যগণ যখন প্রথম বসতি সংস্থাপন করেন, তৎকালে বিরুদ্ধাচারী জীবোদ্ভিদের সহিত তাহাদের যে ভীষণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারেনা এবং বসতি বিস্তার কল্পে, পুরুষ পরম্পরায় বারংবার তাঁহাদের এই দুরন্ত সমরের পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণ যুগযুগান্তরব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমে ধরণী-পৃষ্ঠ মানব বসতি-সুলভ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি, কোনও অনাধ্যাসিত বা বহু-পূর্ব্বাধ্যাসিত স্থানে আবাস স্থাপন করিতে গেলে, এখনও যেরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা চিন্তা করিলে, পরশুরাম যুগে মানবগণ ভারতবর্ষে বাস-প্রতিষ্ঠা কল্পে কীদৃশ শ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আর্য্যগণ কর্ম্ম-ভূমিস্থিত স্ব স্ব ভবনে প্রশান্ত ভাবে ও পরম সুখে আদর্শ সামাজিক ও পারিবারিক জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবন ধারণোপাদান দ্রব্যনিচয়ের

প্রাচুর্য্য থাকা স্বত্বেও, শারীরধর্ম্মাভিজ্ঞ আর্য্যগণ পরিমিততার সহিত সংযত ভাবে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যদিও, তাঁহারা কৃষি-তত্ত্ব বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন, তথাপি আবশ্যকতাতিরিক্ত ভূমি কর্ষণ বা শস্যোৎপাদন করিতেন না। কারণ, তাঁহারা জানিতেন, ঈশ্বর মানবকে অপরাপর জীবের অধীশ্বর করিয়া সৃজন করিলেও, প্রকৃতি মাতার ভূমিতে মানবের যেমন অধিকার আছে, ঈশ্বর-সৃষ্ট অপরাপর জীবেরও সেইরূপ আনুক্রমিক অধিকার আছে; অন্যপক্ষে প্রকৃতির চিরশস্য-প্রসবিনী মৃত্তিকা হইতে আবশ্যক হইলেই শস্য সংগ্রহ করা যায়। এজন্য ব্যবহার্য্য শস্যোৎপাদন ভিন্ন, মানবের সঞ্চয় কল্পে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করা বিধেয় নহে। তাঁহারা বাণিজ্যতত্ত্ব অবগত থাকিলেও, শস্যাদি বিক্রয় দ্বারা ধনাগম-লালসা কিম্বা সঞ্চিত শস্যের অধীশ্বর গণিত হইয়া সামাজিক প্রতিপত্তি-লাভ-বাসনা অন্তঃকরণে পোষণ করিতেন না। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ পশ্বাদি নিধন করিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্বেষ বা মাংস ভক্ষণ লোভ-পরতন্ত্র হইয়া কখনও জীব হত্যা করিতেন না। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে মানবেতর জীবের যে সকল অধিকার আছে, তাঁহারা কখনও তাহার অনাদর করিতেন না। তাঁহারা যথেষ্ট পশুচারণ ভূমি বর্জ্জন করিয়া, নিজ প্রয়োজনে অবশিষ্ট ভূমি ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা অপরাপর জীবের ভোগে বাধা প্রদান না করিয়া, বৃক্ষের সুপক্ক, সুমিষ্ট এবং সুরসাল ফল এবং পরিণত কন্দমূলাদি ভক্ষণ করিতেন। গব্যদুগ্ধের উপকারিতা এবং তদ্বারা বহুবিধ রুচি ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা বিদিত থাকিয়া, তাঁহারা গাভীবৎসের দুগ্ধ পান সমাপনান্তর গোদুগ্ধ সংগ্রহ করিতেন। তাঁহারা গৃহপালিত পশু পক্ষীগণের প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন এবং স্বভাবানুসারে যে সকল জীব মানবের অধীনতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে কখনও অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতেন না। তাঁহারা বিনা প্রয়োজনে উদ্ভিদ্ জাতির ক্লেশোৎপাদন করিতেন না। তাঁহারা কোনও বৃক্ষ, লতা বা গুল্মের অপরিণত পত্র, পুষ্প বা ফল বৃন্তচ্যুত করিতেন না বা ঔষধ নির্ম্মাণোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোনও ওষধি উত্তোলন করিতেন না। তাঁহারা যাবতীয় ধাতু ও উপধাতুর বিষয় অবগত থাকিয়াও, বিলাসিতা প্রযুক্ত ধাতু সংগ্রহ করিতেন না। তাঁহারা ঔষধ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যনিচয় প্রস্তুত করিবার জন্য, খনি খনন করিয়া, নানা প্রকার খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতেন। ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহারই প্রীত্যর্থে, তাঁহারা সুবর্ণ পাত্রে

পান ভোজনাদি করিতেন। আমাদের পরম পিতা তাঁহার সৃষ্টজীবকুলকে তাঁহার ভূমণ্ডলস্থ বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া, প্রত্যেকের ন্যায্য সম্ভোগ ব্যবস্থা ভার মানবের উপর অর্পণ করিয়াছেন; এই গূঢ় মর্ম্ম অবগত থাকিয়া, তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার নিয়োজিত ও আজ্ঞাধীন ব্যবস্থাকারীস্বরূপ, পবিত্রভাবে সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

আর্য্যজনপদ নিচয় মূর্ত্তিমান বিনয়, সৌজন্য, স্নেহ ও প্রীতির শ্রী-সমন্বিত হইয়া উঠিল। জীবের মঙ্গল জন্য, পরম নিয়ন্তা তাঁহার এই সমস্ত দ্যুতি সংসারে প্রেরণ করিলেন। প্রত্যেক পরিবারগত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া, পরস্পরের সহায়তায় সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণকে যেমন বাৎসল্য করিতেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ জ্যেষ্ঠগণের প্রতি প্রীতিপূর্ণশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সকলেই সন্তুষ্টান্তঃকরণে পরিবার-পতির অধীনতা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বাক্য আদেশ স্বরূপ প্রতিপালন করিতেন। পুরুষ কিম্বা স্ত্রীভেদে আদর ও সম্মাননার তারতম্য ছিল না। পুরুষগণ পারিবারিক নিয়মবন্ধন মধ্যে যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন, স্ত্রীগণও সেইরূপ করিতেন। শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে পুরুষগণ বহির্দ্দেশ হইতে সাংসারিক দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং নারীগণ ভবনাভ্যন্তরে ঐ সমস্ত দ্রব্য দ্বারা সাংসারিক সুব্যবস্থা সমাধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন, স্ত্রীজাতি বলিয়া, তাঁহাদের পুরুষের অধীনতা বা অবরোধ-নিয়ম পালন করিতে হইত না; স্বভাবতঃ পুরুষগণ বাহ্যকর্ম্ম সম্পাদনক্ষম এবং ললনাগণ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও পরিচর্য্যায় সুনিপুণা। পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতি-পার্থক্যে ঈশ্বরের যে পবিত্র বিধান অভিব্যঞ্জিত হয়, আর্য্যগণ তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পরিবারপরিধিমধ্যে কেহ কোনও প্রকার অভাব বা অনাটন অনুভব করিতেন না; এজন্য সকলেই পরিতুষ্ট ও প্রফুল্লাস্য থাকিতেন। সত্যযুগে আর্য্যপরিবার ফুল্লকুসুমিতদ্রুমের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। প্রত্যেক পরিবার-গতজনগণের যেরূপ সদ্ভাব ছিল, পরিবারনিচয় মধ্যেও পরস্পরের সেইরূপ সৌহার্দ্দ ও সহানুভূতি ছিল। আর্য্যগণ পারিবারিক বিভিন্নতা নির্ব্বিশেষে, পরস্পরের প্রতি বিনয়, সৌজন্য, প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা গৃহাগত ব্যক্তিবর্গের যেরূপ অতিথি সৎকার করিতেন, গৃহবহির্ভাগেও, পাত্রানুযায়ী সকলের প্রতি সেইরূপ সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করিতেন। গৃহে কোনও পূজনীয় ব্যক্তি আসিলে, পরিবারগতজনগণ পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা ও পরিচর্য্যা করিতেন।

আশীর্ভাজন কোনও ব্যক্তি গৃহে সমাগত হইলে, তাঁহারা মিষ্টালাপ ও সদাচার দ্বারা তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতেন। গৃহাগত ব্যক্তি পরিবারগত কাহারও আশীর্ব্বাদ ভাজন, কাহারও ২ সমকক্ষ, এবং কাহারও ২ পূজনীয় হইলে, পরিবারস্থ সকলেই যথারীতি তাঁহার অভ্যর্থনা ও পরিতোষ সম্পাদন করিতেন। যে কোনও স্থানে আৰ্য্যগণ সম্মিলিত হইলে, কনিষ্ঠগণ অগ্রে জ্যেষ্ঠগণের পাদবন্দনা করিতেন এবং জ্যেষ্ঠগণও তৎসমভিব্যাহারে কনিষ্ঠগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। যদিও জ্ঞান ও সাধনা বলে আৰ্য্যগণ নিরাময় ও নিরাপদ থাকিতেন, তথাপি পরস্পরের প্রীতি সংবর্দ্ধন জন্য, তাঁহারা পরস্পরের গৃহগমনাগমন ও সংবাদাদি গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা সমস্ত গৃহকেই স্বগৃহ এবং সমাজগত সমস্ত ব্যক্তিকেই আত্মীয় বিবেচনা করিতেন। কেহ কখনও কাহারও কোনও সাহায্য করিতে পারিলে, তাহা সমাজে পরোপকার বিবেচিত না হইয়া, কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন বিবেচিত হইত। কারণ, সমাজে কেহ কাহাকেও পর বিবেচনা করিতেন না।

তপোবল-সম্পন্ন দীপ্তিমান মহর্ষিগণ সদুপদেশ প্রদান-কল্পে গৃহে শুভাগমন করিলে, আৰ্য্যগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আতিথ্যব্রতের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। হিমাচল বর্ষে উপনিবেশ স্থাপন স্থিরীকৃত হইলে, যুবক ও তরুণবয়স্ক কাশ্যপীয়গণ সকলেই পরিবারবর্গসহ ভারতে সমাগত হইলেন; কেবল বয়োবৃদ্ধ কতিপয় প্রবীণ কাশ্যপীয় মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কাশ্যপভূমিতে অবস্থিতি এবং প্রবল তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। মিহির সদৃশ এই সমস্ত কাশ্যপীয় যখন মধ্যে মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের সন্তানগণকে দর্শন করিতে আসিতেন, আৰ্য্যগণ তখন আনন্দে বিভোর হইয়া, পতাকা হস্তে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও চরণ বন্দনা করিতেন। গৃহে গৃহে মাঙ্গলিক তোরণ উত্তোলিত হইত এবং গৃহে গৃহে এই সকল ঋষিপুঙ্গবের অর্চ্চনা ও আতিথ্য সৎকার হইত। ইঁহাদের দৃষ্টান্তানুযায়ী ভারত-প্রতিষ্ঠিত আৰ্য্যগণও বৃদ্ধাবস্থায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বন করিতেন। তাঁহারাও গৃহস্থগণের বাটীতে আগমন করিলে, একই প্রকার অভ্যর্থনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইতেন।

সমাজে সকলেই পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ও দেহরক্ষা জন্য সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতেন এবং পরম কারুণিক বিধাতা তাঁহাদের সৎপরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেন। সত্যযুগে আৰ্য্যসমাজে মূর্ত্তিমান স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিত। কেহই সাংসারিক অস্বচ্ছলতা অনুভব করিতেন না; এজন্য কেহই অন্তঃকরণে কোনও প্রকার ক্ষোভ পোষণ করিতেন না। কেহই অন্যায়রূপে

কোনও দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার বাসনা করিতেন না; এজন্য সত্য যুগে আর্য্য-সমাজে চৌর্য্য বা দস্যুবৃত্তি ছিল না। কেহই কাহারও প্রতি ঈর্ষা, হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না; এজন্য তাঁহাদের পরস্পর প্রীতিমধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। তাঁহারা এতদূর সত্যানুরক্ত ছিলেন যে, বিদ্রূপ ছলেও কখনও অসত্য ব্যবহার করিতেন না। এজন্য তাঁহারা কখনও কাহারও তোষামোদ বা কাহারও প্রতি চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহারা সকলেই আড়ম্বরশূন্য সরল জীবন যাপন করিতেন। স্থাপত্য, বস্ত্রনির্ম্মাণ এবং রন্ধনাদি শিল্প বিশেষরূপে বিদিত থাকিয়াও, তাঁহারা কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ সৌধগঠন, সামারোহিক পরিচ্ছদ পরিধান, অতিরিক্ত মসলা-বিশিষ্ট খাদ্যভোজন প্রভৃতি বিলাসচর্য্যার বিরোধী ছিলেন। সামাজিক প্রতিপত্তিলাভ বাসনা তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হইত না। এই সমস্ত কারণে, সত্যযুগে, আর্য্যসমাজ চাঞ্চল্য, কাপট্য ও মাৎসর্য্যের ছায়াপাতে মলিন হইত না। আন্তরিক সারল্য ও সত্যপরতার জ্যোতিঃ বাহ্যরূপলাবণ্যে মিশ্রিত হইয়া, আর্য্যগণের দিব্যশ্রী সম্পাদন করিত। ফলতঃ, সত্যযুগে মানবীয় ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং এজন্যই ইহা সত্যযুগ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

সৃষ্টিরহস্যজ্ঞ আর্য্যগণ বংশবিস্তার কল্পে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতেন এবং সত্যযুগে আর্য্য সমাজে মানবোচিত বিবাহসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল। বিবাহ চুক্তি স্বরূপ বিবেচিত না হইয়া, মানবজীবনের একটী অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্মসঙ্গত সংস্কার গণ্য হইত। এজন্য, জায়া ও পতি, উভয়েই বিবাহ সময়ে দাম্পত্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপালনে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পক্ষেরই, দাম্পত্য-কর্ত্তব্যতা-বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত, বিবাহ হইত না। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পিতৃপরিবার মধ্যে রুধিরজ সম্পর্ক নৈকট্য থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইত না। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অধিক বয়স্ক না হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহ হইত না। পিতামাতা বা সম্পর্কীয় গুরুজন, বাৎসল্য বশতঃ, বরবধূকে বিবাহ সময়ে যে যৌতুক প্রদান করিতেন, তদ্ভিন্ন বর কিম্বা কন্যাপক্ষ বিবাহ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট কোনও প্রকার দাবি উত্থাপন করিতেন না। বিবাহসূত্রে গ্রথিত পরিবারনিচয় মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও আদর গাঢ়তর হইত এবং সর্ব্বদা স্নেহের আদান প্রদান নিষ্পন্ন হইত। স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেম বিরাজ করিত এবং তাঁহারা সন্তানোৎপাদনোদ্দেশ্য ভিন্ন, রিপুচরিতার্থ করণ জন্য ইন্দ্রিয়সংসর্গ

করিতেন না। স্ত্রী যেমন স্বামীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, স্বামীও সেইরূপ স্ত্রীর সহিত সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শ ও স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বিবেচনা করিতেন। দাসীর ন্যায় স্ত্রী যেমন স্বামীর পরিচর্য্যা করিতেন, স্বামীও সেইরূপ আপনাকে স্ত্রীর প্রাণেশ্বর প্রতিপন্ন করিতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন, আত্মা-ভিহিত সচ্চিদানন্দ জ্যোতির লিঙ্গভেদ নাই ; সৃষ্টিকুশল বিধাতা সৃষ্টি-সৌকর্য্যার্থ আত্মাধার জীবদেহ পুরুষ ও স্ত্রীভেদে ভিন্নাকারে গঠন করিয়াছেন। অপিচ, সংসার সমাধান জন্য দম্পতী রূপী শরীরাধার একমনা ও একাত্মক হইলেও, ঈশ্বর সৃষ্টি বিস্তার হেতু পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে স্বামী স্ত্রীর দুই দেহ অর্পণ করিয়াছেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা আর্য্যজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সত্যযুগে কুসুমোপবন-পরিকীর্ণ সরল সুনির্ম্মল আর্য্যকুটীরনিচয় দেবনিকেতন স্বরূপ প্রতী-য়মান হইত। ফলতঃ, স্বাস্থ্যজ্ঞানী আর্য্যগণ শুচিরক্ষণ অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম-সংস্কার বিবেচনা করিতেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অশন, বসন ও অঙ্গপ্রত্য-ঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে, আর্য্যগণ বহুবিধ সংস্কার বিধির প্রচলন করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত অনুশাসন সমাজে ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ প্রতিপালিত হইত। পরি-মিততা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষাহেতু, সত্যযুগে আর্য্যগণ পূর্ণাকার, সুঠাম, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। জাতমাত্র শিশুর অঙ্গ পরিষ্কার, সূতিকা গৃহের পারিপাট্য, মল ত্যাগান্তর শৌচ, দন্তধাবন এবং মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য, প্রত্যহ স্নান, গাত্র মার্জ্জন এবং পরিধেয় বসন ধৌত করণ,ভোজন স্থান ও পাত্রের পারিচ্ছন্নতা, শয্যা পরিষ্কার, রোগীগৃহ বিশুদ্ধি, সুপবিত্র স্থানে মুমূর্ষুর অবতারণ প্রভৃতি প্রকৃষ্ট নিয়মাবলী পুরাপ্রবর্ত্তিত অনুশাসননিচয়ের ছায়া স্বরূপ অদ্যাপি তথাকথিত হিন্দু-সমাজে বর্ত্তমান আছে। স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে, আর্য্যগণ শবদেহ সুগন্ধি ইন্ধন ও অপরাপর সুরভি-দ্রব্য সংযোগে অবিলম্বে অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিতেন।

আর্য্যগণ প্রিয় প্রেতাত্মানিচয়ের উদ্দেশে পূত খাদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করি-তেন। তাঁহারা জানিতেন, সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃরেণু আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা মরজীবদেহাশ্রয় করিয়া, ইহলোকে মায়া-কল্পিত আত্মীয়াদি রূপে বিচরণ করে এবং নিরূপিত সময়ান্তে মৃত্যু প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল ভৌতিক দেহাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে অধিষ্ঠিত হয়। দেবগণের প্রীত্যর্থে আর্য্যগণ হোম ও যজ্ঞানু-ষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবে দেবগণের উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাদি রুচিকর পদার্থ আহুতি প্রদান এবং মহিমাসূচক স্তুতিবাক্যে দেবার্চ্চনা করিতেন।

প্রজাপতি দশকের পরমোপদেশ রত্নাবলী পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট বিদিত হইয়া, আর্য্যগণ তদনুসারে যেমন সংসারের অপরাপর যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ নিষ্পাদন করিতেন, সেইরূপ, প্রকৃষ্টতান-লয়-রাগ-রাগিণী-সঙ্গত সুললিতছন্দে মধুর কণ্ঠে পরম পিতার স্তুতি এবং তৎসৃষ্ট গৌরবান্বিত পদার্থ নিচয়ের গুণ বর্ণনা দ্বারা তাঁহারই সুপবিত্র মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। শেষনিশিযামান্তভাগে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আর্য্যজনপদনিকরপ্রতিগৃহসমুত্থিত দিব্যোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত হইয়া,জলস্থল মরুৎব্যোম পবিত্রীকৃত করিলে, লোহিতাম্বরা অলক্তরাগ-রঞ্জিত গণ্ডা ঊষাদেবী অবগুণ্ঠনোন্মোচন করিয়া, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে মঙ্গল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং সুষুপ্তিসম্ভোগবিগতক্লম কুশলচিন্তান্বিতচিত্ত আর্য্যগণ প্রাত-রুত্থান-জনিত শয্যা ত্যাগানন্তর মহোল্লাসে বালারুণগুণ গান করিয়া দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্য পরম্পরায় মনোনিবেশ করিতেন। আর্য্যগণ নির্ম্মলসলিলাব-গাহন স্নানে শরীর শীতল এবং বিশুদ্ধ করিয়া, মধ্যাহ্নে ঈশ্বরের উপাসনা সমাপন করিলে, মাতা, জায়া, ভগিনী, দুহিতা প্রভৃতি আত্মীয়াগণ তাঁহাদিগকে সাদরে ভোজনে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহারা আহার-বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, স্নেহদত্ত সুপক্ক খাদ্য ভক্ষণ করিতেন। ভোজনের পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিতেন ঃ 'হে আমাদের খাদ্যদাতা পরম-পিতা দয়ালু বিভো! আমাদের সম্মুখে যে খাদ্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তোমা-রই করুণা-সম্ভূত এবং শরীর ধারণ জন্য তোমার ইচ্ছায় আমরা ইহা গ্রহণ করি।' দিবাকর্ম্মশ্রমক্লিষ্ট জীবের শান্তিবিধান জন্য, ঈশ্বর নিয়োগে সন্ধ্যাসতী যখন ধর-ণীকে ধূসরবাসে সজ্জিতা করিতে উদ্যতা হইতেন, আর্য্যগণ তখন প্রকৃতির মাঙ্গ-লিক পরিবর্ত্তনে ভগবৎ প্রেমাবিষ্ট হইয়া, সারাৎসার পরব্রহ্মধ্যান-নিমগ্ন হইতেন। রজনীর প্রথম ভাগে শয্যোপরি সুখশয়ান আর্য্যগণ এই মন্ত্রে নিদ্রা-দেবীর আরাধনা করিতেন ঃ—অয়ি ক্লান্তিহারিনি সুখদে নিদ্রে! আমাদিগকে আরাম প্রদান করিবার জন্য আমাদের পরমপিতা যামিনী সহচরী করিয়া তোমাকে সৃজন করিয়াছেন। কুশলময়ের ইচ্ছায় আমরা তোমার কোমল ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিলাম।'

বর্ণ, ভাষা ও লিপিবিদ্যা অবগত থাকিয়াও, আর্য্যগণ সত্যযুগে দেবর্ষিগণের উপদেশমালা লিপিবদ্ধ করিতেন না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রজাপতিগণের নিকট ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া যেমন তৎসমস্ত হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখি-য়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষগণের প্রমুখাৎ সেই সকল উপদেশ শ্রবণ

করিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রাখিতেন। এজন্য তাঁহারা প্রজাপতি-প্রদত্ত জ্ঞানরাশি শ্রুতি ও স্মৃতি নামে অভিহিত করিতেন। ফলতঃ আর্য্যগণের অন্তঃকরণ এরূপ বিশাল ছিল যে, জগদীশ্বর দেবতাগণদ্বারা যে পরিমাণ জ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করিলেন, তাহা তাঁহারা মনোনিবদ্ধ করিয়া রখিতেন। কোনও বিষয় দর্শন করিয়া স্মরণ করিবার জন্য, তাহা তাঁহাদের লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইত না। কেননা, সর্ব্ববিষয়ই সর্ব্বসময়ে তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকিত। প্রজাপতিগণ যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতব্য কোনও বিষয় বর্জ্জিত ছিলনা। দেবশিক্ষকগণ যে সকল ছাত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন; এজন্য প্রজাপতিগণ বাক্য এবং আভ্যাসিক উদাহরণোপদেশ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যদি তাঁহাদের লিখিত পুস্তকদ্বারা গৌণতঃ শিক্ষাপ্রদান করিতে হইত, তাহা হইলে পৃথিবী স্থিতিকাল মধ্যে মানবশিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না; পরন্তু এত পুস্তক প্রণীত হইত যে, ভূমণ্ডলে তাহা রাখিবার স্থানাভাব হইত। যাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতের জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ পর্ব্বত সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক পাঠ করিয়াও, আমরা এক হিমালয় গিরি সম্বন্ধে এত অল্প বিষয় জানিতে পারি, যাহা হিমাচল বিষয়ক সম্পূর্ণবোধ গণ্য হইতে পারে না। দেবশিক্ষকগণ হিমালয় শৈলের প্রকৃত বাহ্যাভ্যন্তরিক অবস্থা, ইহার কতগুলি শৃঙ্গ, কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে জীবোদ্ভিদ বা অপরাপর পদার্থ কি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহাদের গুণ বা ধর্ম্ম, ইহাতে কত প্রকার ধাতু আছে, ইহা কবে কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বা পরিণাম কি, প্রভৃতি যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, সকলই বিদিত ছিলেন এবং বাক্য দ্বারা ও সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন দ্বারা তৎ সমস্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে পারিতেন। যদি তাঁহাদের ছাত্রগণ তাঁহাদের শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত না হইতেন এবং যদি পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা দেব শিক্ষকগণের ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে এক হিমালয় পর্ব্বতের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত করিতে তাঁহাদের এত পুস্তক বিরচন করিতে হইত, যাহা বৃহত্তম প্রাসাদেও রক্ষিত হইতে পারিত না এবং কোনও মানবই জীবনে ঐ গ্রন্থ-পর্ব্বত পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারিতেন না। ঈশ্বর জ্ঞান বিস্তার জন্য যেমন সর্ব্বজ্ঞ দশ দেবাত্মাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন, তেমনি কাশ্যপ প্রদেশবাসীগণ ও তাঁহাদের সন্তান

আর্য্যগণকে তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করিলেন। দেবশিক্ষকগণ কাশ্যপীয়গণকে যে প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন, কাশ্যপীয়গণও আর্য্যগণকে এবং আর্য্যগণ তাঁহাদের বংশধরগণকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠে যে স্বল্প বোধ লাভ করা যায়ত,তাহাও অপ্রত্যক্ষ।

হিন্দু পুরাণকারগণ মানব গণনায় ১৭২৮০০০ বৎসর সত্য যুগাবস্থিতি কাল পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া বিমল সমাজ ধর্ম্ম ভারতে বিরাজ করিয়াছিল। আর্য্যগণ এই বিশাল সমাজ-ধর্ম্ম-তরু ছায়ায় সরল বিনীত প্রশান্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। মানসিক ঐশ্বর্য্য প্রভাবে কেহ কেহ সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া, সত্যযুগে বিরাট আর্য্য সমাজের নেতা-গণ্য হইতেন এবং সমাজ-ধর্ম্মানুযায়ী সমাজে নেতৃত্ব করিতেন। কিন্তু বাহ্যৈশ্বর্য্য বলে কেহই এই পবিত্র সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতেন না। আর্য্যসমাজ প্রীতি-গঠিত ছিল এবং প্রীতি ইহার ভিত্তি ছিল। সমাজে সকলে সকলকে ভালবাসিতেন। আর্থিক বা বৈষয়িক অনিষ্টাশঙ্কায় কেহ কাহাকেও ভয় করিতেন না। কিম্বা অর্থ বা বিষয় লাভ হেতু কেহ কাহাকেও ভয় প্রদর্শনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন না। কেহ কাহাকেও প্রতারিত করিতেন না বা কেহ কোনও প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতেন না। সকলেই শিষ্ট ছিলেন এবং পরস্পরের সাহায্য করিতেন। সুতরাং সত্যযুগে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন জন্য বাহুবলসম্পন্ন শাসক বা কোনও প্রকার শাসন প্রথার আবশ্যকতা ছিল না। নিষ্প্রয়োজনীয়তা হেতু সত্যযুগে রাজশাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বলী, বেণু, মান্ধাতা,পুরোরব, ধুন্ধুমারী;কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাবান আর্য্যগণ সত্যযুগে সর্ব্বলোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং সমাজ ইঁহাদিগকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল। ইঁহাদিগকে অনেকে, ভ্রমক্রমে, সত্য যুগের রাজা স্বরূপ গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, রাজার যে প্রকৃতি বা ধর্ম্ম,ইঁহাদের তাহা ছিল না এবং ইঁহারা রাজা ছিলেন না। ইঁহাদিগকে রাজা বলিলে, ইঁহাদের গৌরবের হানি করা হয়। পুরাণকারগণ ইঁহাদের "চক্রবর্ত্তী" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ ইঁহারা সমাজ-চক্রবর্ত্তী বা সমাজ-অধিপতি ছিলেন। সমাজ ইঁহাদিগকে স্বীয় শীর্ষে স্থাপিত করিয়া প্রভুর ন্যায় গণ্য করিত। ইঁহারা বাহুবল প্রয়োগে সমাজশাসন প্রয়াসী হন নাই। তথাপি, সত্যযুগাবসান সময়ে কেহ কেহ সমাজ-নেতৃ-পদাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, এতৎ কল্পে

পরস্পর প্রতিযোগিতার উদ্রেক হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রতিপত্তি লাভ চেষ্টায় যে অশান্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতেই সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিপ্লবে সত্যযুগের আশুবিলয় সূচনা স্বরূপ মানব প্রকৃতির কথঞ্চিৎ বৈকৃত সাধিত হইল। সরল আর্য্যমনে বিস্মৃতির কালিমা ক্ষীণ মেঘের ন্যায় উদিত হইতে লাগিল এবং সামাজিক বিপ্লবও ক্রমশঃ ঘোরতর হইতে লাগিল। আর্য্যগণ ক্ষমতা-লিপ্সু ব্যক্তিগণের যোগ্যতানুসন্ধান করিতে গিয়া, ন্যায়-ন্যায়, দোষ গুণ, অধিকারানধিকার, যোগ্যতাযোগ্যতা, সামাজিক হিতাহিত প্রভৃতি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ব্যক্তি দ্বারা সমাজ শাসন বাঞ্ছা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ব্যক্তির নির্ব্বাচনে তাঁহাদের মতদ্বৈধ হইতে লাগিল। বিচারবিহ্বল আর্য্যগণ, সমাজ নিয়মনে ঈশ্বরের মৌলিক প্রভুত্ব বিষয়ে ঈষৎ সন্দিহান হইলেন এবং পূর্ণ শান্তি ভোগ করিতে থাকা স্বত্বেও সামাজিক পরিবর্ত্তন কামনা করিলেন। এইরূপে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানগণ মায়া কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া, ভগবানের নিকট ঘোর অপরাধী হইলেন। তথাপি পরম পিতা তাঁহাদিগকে সদয় ভাবে শিক্ষা দিবার বিধান করিলেন; কারণ তিনি যেমন ন্যায়বান, তেমনি দয়ালু। আর্য্যগণ যেরূপ বর মনোনীত করিয়াছিলেন, তিনি সেই বর মানব জাতিকে প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বিস্মৃতি-জড়িত মানব বিস্মৃতি প্রভাবে ভগবানকে ভুলিয়া যায়; কিন্তু বিস্মৃতির অতীত পরমপিতা তাঁহার সন্তানগণকে বিস্মৃত হন না। মহেশ্বর সত্যযুগের বিনাশ সাধন বাঞ্ছা করিবা মাত্র, প্রলয়ের ভয়ানক চিহ্ন পরম্পরা সমুদিত হইতে লাগিল। সূর্য্য গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল; চন্দ্র নিষ্প্রভ হইল; গগনে ধূমকেতু উদিত হইতে লাগিল; প্রকৃতি তিমিরাবৃতা হইল; প্রাণীকুল ত্রাসগ্রস্ত এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিল; দেশে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইল। অনেক জীব কালকবলে পতিত হইল। পরবর্ত্তী যুগপ্রভাব সহনক্ষম প্রাণীনিচয় অবশিষ্ট রহিল। তপোবন-বাসী মহাতেজস্বী পুণ্যবান ঋষিগণ, সত্যযুগের সাক্ষী এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ জীবিত রহিলেন। এই প্রকারে, খণ্ডপ্রলয়ের দ্বারা সত্যযুগের বিলোপ সাধন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান ধরণী-পৃষ্ঠে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

আর্য্যগণকে তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করিলেন। দেবশিক্ষকগণ কাশ্যপীয়গণকে যে প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন, কাশ্যপীয়গণও আর্য্যগণকে এবং আর্য্যগণ তাঁহাদের বংশধরগণকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠে যে স্বল্প বোধ লাভ করা যায়ত,তাহাও অপ্রত্যক্ষ।

হিন্দু পুরাণকারগণ মানব গণনায় ১৭২৮০০০ বৎসর সত্য যুগাবস্থিতি কাল পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া বিমল সমাজ ধর্ম্ম ভারতে বিরাজ করিয়াছিল। আর্য্যগণ এই বিশাল সমাজ-ধর্ম্ম-তরু-ছায়ায় সরল বিনীত প্রশান্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। মানসিক ঐশ্বর্য্য প্রভাবে কেহ কেহ সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া, সত্যযুগে বিরাট আর্য্য সমাজের নেতা-গণ্য হইতেন এবং সমাজ-ধর্ম্মানুযায়ী সমাজে নেতৃত্ব করিতেন। কিন্তু বাহ্যৈশ্বর্য্য বলে কেহই এই পবিত্র সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতেন না। আর্য্যসমাজ প্রীতি-গঠিত ছিল এবং প্রীতি ইহার ভিত্তি ছিল। সমাজে সকলে সকলকে ভালবাসিতেন। আর্থিক বা বৈষয়িক অনিষ্টাশঙ্কায় কেহ কাহাকেও ভয় করিতেন না। কিম্বা অর্থ বা বিষয় লাভ হেতু কেহ কাহাকেও ভয় প্রদর্শনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন না। কেহ কাহাকেও প্রতারিত করিতেন না বা কেহ কোনও প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতেন না। সকলেই শিষ্ট ছিলেন এবং পরস্পরের সাহায্য করিতেন। সুতরাং সত্যযুগে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন জন্য বাহুবলসম্পন্ন শাসক বা কোনও প্রকার শাসন প্রথার আবশ্যকতা ছিল না। নিষ্প্রয়োজনীয়তা হেতু সত্যযুগে রাজশাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বলী, বেণু, মান্ধাতা,পুরোরব, ধুন্ধুমারী,কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাবান আর্য্যগণ সত্যযুগে সর্ব্বলোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং সমাজ ইঁহাদিগকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল। ইঁহাদিগকে অনেকে, ভ্রমক্রমে, সত্য যুগের রাজা স্বরূপ গণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, রাজার যে প্রকৃতি বা ধর্ম্ম,ইঁহাদের তাহা ছিল না এবং ইঁহারা রাজা ছিলেন না। ইঁহাদিগকে রাজা বলিলে, ইঁহাদের গৌরবের হানি করা হয়। পুরাণকারগণ ইঁহাদের "চক্রবর্ত্তী" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ ইঁহারা সমাজ-চক্রবর্ত্তী বা সমাজ-অধিপতি ছিলেন। সমাজ ইঁহাদিগকে স্বীয় শীর্ষে স্থাপিত করিয়া প্রভুর ন্যায় গণ্য করিত। ইঁহারা বাহুবল প্রয়োগে সমাজশাসন প্রয়াসী হন নাই। তথাপি, সত্যযুগাবসান সময়ে কেহ কেহ সমাজ-নেতৃ-পদাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, এতৎ কল্পে

পরস্পর প্রতিযোগিতার উদ্রেক হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রতিপত্তি লাভ চেষ্টায় যে অশান্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতেই সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিপ্লবে সত্যযুগের আশুবিলয় সূচনা স্বরূপ মানব প্রকৃতির কথঞ্চিৎ বৈকৃত সাধিত হইল। সরল আর্য্যমনে বিস্মৃতির কালিমা ক্ষীণ মেঘের ন্যায় উদিত হইতে লাগিল এবং সামাজিক বিপ্লবও ক্রমশঃ ঘোরতর হইতে লাগিল। আর্য্যগণ ক্ষমতা-লিপ্সু ব্যক্তিগণের যোগ্যতানুসন্ধান করিতে গিয়া, ন্যায়-ন্যায়, দোষ গুণ, অধিকারানধিকার, যোগ্যতাযোগ্যতা, সামাজিক হিতাহিত প্রভৃতি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ব্যক্তি দ্বারা সমাজ শাসন বাঞ্ছা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ব্যক্তির নির্ব্বাচনে তাঁহাদের মতদ্বৈধ হইতে লাগিল। বিচারবিহ্বল আর্য্যগণ, সমাজ নিয়মনে ঈশ্বরের মৌলিক প্রভুত্ব বিষয়ে ঈষৎ সন্দিহান হইলেন এবং পূর্ণ শান্তি ভোগ করিতে থাকা স্বত্বেও সামাজিক পরিবর্ত্তন কামনা করিলেন। এইরূপে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানগণ মায়া কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া, ভগবানের নিকট ঘোর অপরাধী হইলেন। তথাপি পরম পিতা তাঁহাদিগকে সদয় ভাবে শিক্ষা দিবার বিধান করিলেন; কারণ তিনি যেমন ন্যায়বান, তেমনি দয়ালু। আর্য্যগণ যেরূপ বর মনোনীত করিয়াছিলেন, তিনি সেই বর মানব জাতিকে প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বিস্মৃতি-জড়িত মানব বিস্মৃতি প্রভাবে ভগবানকে ভুলিয়া যায়; কিন্তু বিস্মৃতির অতীত পরমপিতা তাঁহার সন্তানগণকে বিস্মৃত হন না। মহেশ্বর সত্যযুগের বিনাশ সাধন বাঞ্ছা করিবা মাত্র, প্রলয়ের ভয়ানক চিহ্ন পরম্পরা সমুদিত হইতে লাগিল। সূর্য্য গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল; চন্দ্র নিষ্প্রভ হইল; গগনে ধূমকেতু উদিত হইতে লাগিল; প্রকৃতি তিমিরাবৃতা হইল; প্রাণীকুল ত্রাসগ্রস্ত এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিল; দেশে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইল। অনেক জীব কালকবলে পতিত হইল। পরবর্ত্তী যুগপ্রভাব সহনক্ষম প্রাণীনিচয় অবশিষ্ট রহিল। তপোবন-বাসী মহাতেজস্বী পুণ্যবান ঋষিগণ, সত্যযুগের সাক্ষী এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ জীবিত রহিলেন। এই প্রকারে, খণ্ডপ্রলয়ের দ্বারা সত্যযুগের বিলোপ সাধন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান ধরণী-পৃষ্ঠে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

ত্রেতাযুগ এবং রাজধর্ম্ম।

মোহাপতিত সন্তানগণের শিক্ষার জন্য অভীপ্সিতলীলা সম্পাদন করিয়া করুণাধার ভগবান তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং পুনরায় তাহাদের প্রতি প্রীত হইলেন এবং যুগবিপর্য্যয়-দুর্দ্দিন নিবারণ. কল্পে, তাঁহার মহাশক্তি কণাংশ কতিপয় দ্বারা রাজাখ্য মানবের সৃষ্টি করিয়া, ধরা শাসন জন্য তাঁহাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন।

অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তে শয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥ ৪ ॥

মনুসংহিতা ; সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টদিক্‌পালাংশ নির্ম্মিত শাসন-দণ্ডধারী মহাপ্রতাপশালী নরপতি আবির্ভূত হইলেন এবং অবনীতলে ত্রেতাযুগ প্রতিষ্ঠিত হইল। মানবের কৃতজ্ঞতায় বিলোপায়মানপ্রায়া সৃষ্টি রক্ষাপ্রাপ্তা হইল, এজন্য তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এই যুগের ত্রেতাযুগ নামকরণ করিলেন। (ত্র=রক্ষা+ইত=প্রাপ্ত)। অপিচ, রাজাবির্ভাবে ত্রেতাযুগে রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে শাসন দণ্ড পরিচালনা করা অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক। প্রকৃতি রঞ্জনার্থ রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজশাসনে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনজ সৃষ্টি-সাম্য রক্ষিত হয়। রাজা শিষ্টের পালনে যেমন দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা এবং মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন, দুষ্ট দমন কল্পে, সেইরূপ, অশান্তিকারী প্রজার মনে স্বীয় বাহ্যাভ্যন্তরিক প্রতাপ দ্বারা ভীতি উৎপাদন করেন। এজন্য রাজা শিষ্ট ও আর্ত্তের যেমন সহজাধিগম্য, অত্যাচারী দুর্ব্বিনীতের তেমনি দুষ্প্রসদ। রাজা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া মানব চরিত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হন ; কিন্তু শাসন সৌকর্য্যার্থ, যতক্ষণ কার্য্যে পরিণত না হয়, ততক্ষণ স্বীয় অভিসন্ধি কাহারও অবগত হইতে দেন না। এজন্য রাজচরিত্র দুর্বোধ্য এবং অতিশয় গম্ভীর। ঈশ্বর নিয়োগে রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজা ও প্রজা উভয়েই এই গূঢ় সত্য উপলব্ধি করিয়া, একদিকে, রাজা যেমন নিস্পৃহ, নিরালস্য, নিরহঙ্কার এবং অযথেচ্ছাচারী ভাবে রাজ্য শাসন করেন, অন্যদিকে, প্রজাকুল তেমনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন এবং রাজবিধি ঈশ্বর প্রত্যাদেশের ন্যায় বিবেচনা করেন। সুতরাং ভয়, মৈত্র ও প্রীতি

দ্বারা প্রজা-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান রাজধর্ম্ম-সম্মত। রাজা ও প্রজামধ্যে শাস্তাশাস্য সম্বন্ধ বিদ্যমানতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হওয়ায়, রাজপদ স্বভাবতঃ, প্রজাপদ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। স্বভাবতঃ রাজা এরূপ শ্রীসম্পন্ন, যাহা প্রজাকুলের সম্মান ও প্রশংসা আকর্ষণ করে। ঈশ্বর রাজাকে এরূপ ঐশ্বর্য্যবান করিয়াছেন, যৎ প্রভাবে প্রজাবর্গ, স্বভাবতঃ; রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। এজন্য রাজার দাম্ভিকতা এবং প্রজার রাজশ্রীকাতরতা উভয়ই অনৈসর্গিক। তথাপি, রাজধর্ম্ম সমাজ ধর্ম্মের ন্যায় সরল নহে। সমাজধর্ম্ম স্বচ্ছ, পবিত্র এবং প্রশান্ত; রাজধর্ম্ম মহৎ এবং আড়ম্বর পূর্ণ। আড়ম্বর বিদ্যমানতা হেতু, বিস্মৃতি সমাজধর্ম্ম অপেক্ষা রাজধর্ম্মে অতি শীঘ্র গ্লানি আনয়ন করিতে পারে। সমাজধর্ম্মে মানবগণ নিরুদ্বেগে সত্যপরায়ণ থাকিয়া পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে। রাজধর্ম্মে মনুষ্যগণ সত্যপ্রিয় হইলেও, সমারোহজ চাঞ্চল্যে মানব প্রকৃতির বিকৃতি সাধিত হয়। এজন্য পুরাণকারগণ ত্রেতাযুগে ত্রিচতুর্থাংশ সত্য বা ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে ত্রেতাযুগ এবং রাজধর্ম্মোদয় সঙ্কেত ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। পরিখা প্রাচীর-বেষ্টিত দ্বার-গবাক্ষ-সমন্বিত বহুপ্রকোষ্ঠ বৃহৎ রাজপ্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইল। রাজ-সৌধশিরে বিবিধবর্ণ-রঞ্জিত আর্য্য-পতাকা উড্ডীন হইল। রাজদ্বারে সুপরিচ্ছদধারী দৌবারিকনিচয় শোভা পাইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাগার নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ পরিপূর্ণ রাজোদ্যান এবং মনোরম লতাগুল্ম-পরিবৃত রাজোপবন বিরচিত হইল। সুবিস্তৃত রাজ-সরোবর নিচয় খনিত হইল। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম রাজী প্রস্তুত হইল। এইরূপে বহুবিধ বিচিত্র বস্তু সংযোগে সুদূরায়তন রম্য রাজপুর প্রতিষ্ঠিত হইল। আবার রাজপথের দুই পার্শ্বে, আর্য্যগণ রাজপ্রথানুকরণে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং বিপণিশ্রেণী সন্নিবিষ্ট হইল। সত্য যুগের শান্তজনপদ অথবা শাদ্বলপ্রান্তরাধিকৃত স্থানে জনচেষ্টিত-চঞ্চলা কোলাহলময়ী নগরী সংস্থাপিতা হইল এবং প্রীতিবিস্ফারিতান্তঃকরণে আর্য্যগণ সাদরে ইহার রাজধানী অভিধা করিলেন।

শাসন পদ্ধতির সুব্যবস্থার জন্য মনুষ্যের কর্ম্মবিভাগ এবং তৎসহ মানবের বর্ণ বিভাগ নিষ্পন্ন হইল। পুরুষ পরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুসরণে, এই বর্ণ বিভাগ ক্রমশঃ জাতি বিভাগে পরিণত হইয়াছিল। সত্যযুগে আর্য্যগণ যখন সরল পারিবারিক জীবন যাপন করিতেন, তখন সকলেই সাংসারিক কার্য্য ও ঈশ্বরো-

পাসনা করিতেন; এজন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হেতু, তাঁহাদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী গঠিত হয় নাই। এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হেতু, আর্য্যগণ কতিপয় দলে বিভক্ত হইয়া, প্রত্যেক দল স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনানিরত থাকিয়া, সদুপদেশদ্বারা মানবের মানসিক-বৃত্তি-শুদ্ধিকরণাভিলাষে আধ্যাত্মিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ ভার গ্রহণ করিলেন এবং সমাজ প্রীতিভরে নিজ শীর্ষস্থানীয় আর্য্যগণকে এই গুরুকার্য্য ভার প্রদান করিলেন; যেহেতু তাঁহারাই ঐ কার্য্যে কুশল ও উপযুক্ত ছিলেন। এই সকল তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ সুদর্শন ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ আখ্যাপ্রাপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ বর্ণ বিবেচিত হইলেন। উদার প্রকৃতি শ্রী-সম্পন্ন বীর আর্য্যগণ বাহু ও বুদ্ধি বলে সমাজ রক্ষাভার গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় বর্ণভুক্ত এবং ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। কর্ম্মলক্ষণায় রাজাও ক্ষত্রিয় শ্রেণীগত এবং ক্ষত্রিয় পদবাচ্য হইলেন। যাঁহারা বাহু ও বুদ্ধি বলে এই শ্রেণীর নিম্নতর গণ্য হইলেন, তাঁহারা কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা সমাজের আহার সংস্থান ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কার্য্যে ব্রতী হইয়া, তৃতীয় বর্ণান্তর্গত এবং বৈশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল উচ্চাঙ্গীন কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যক্তিবর্গ স্বস্ব শ্রেণীতে নির্ব্বাচিত হইলে, সমাজের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে সমাজে অন্য একটী বিভাগ গঠিত হইল যাহা সেবাকরী চতুর্থ শ্রেণী স্বরূপ বিবেচিত হইয়া, শূদ্রসংজ্ঞিত হইল। অতীক্ষ্ণবুদ্ধি শূদ্রগণ যদিও তাদৃশ মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে পারিতেন না, তথাপি, ইঁহারা আজ্ঞাবহ ভৃত্য স্বরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া, প্রভূত সামাজিক মঙ্গল সাধনের হেতুভূত হইয়াছিলেন। কেননা, ইঁহাদের শারীরিক-পরিশ্রম-ভিত্তি অবলম্বনে, উচ্চতন বর্ণত্রয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সমাজের মঙ্গল বিধান করিতে পারিতেন। এই শ্রেণীচতুষ্টয়কে সমাজাবয়বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করিলে, ব্রাহ্মণগণ উহার মুখ, ক্ষত্রিয়গণ বাহু, বৈশ্যগণ উরু এবং শূদ্রগণ পদ সদৃশ প্রতীয়মান হন। ঈশ্বরেচ্ছায় এই মৌলিক বর্ণ বিভাগ নিষ্পাদিত হইয়াছিল। এজন্য পুরাণকারগণ, নিপুণতার সহিত, রূপকে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের,উরু হইতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শূদ্রের জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রেণী বিভাগ সম্পন্ন হওয়ার পর, বর্ণচতুষ্টয় নিরূপিত কার্য্যদ্বারা স্বস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ণগত কর্ম্ম সম্পাদন জন্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য,

এই তিন বর্ণের বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত এবং শ্রুতি ও স্মৃতি-বিশারদ জ্ঞানাধার ব্রাহ্মণগণ তিন বর্ণেরই শিক্ষাবিধান করিতেন। এই সকল শিক্ষক ব্রাহ্মণগণ পুরুষপরম্পরাগত প্রজাপতি দক্ষের শিক্ষোপদেশ হৃদগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তপোবনবাসী মহর্ষিগণ যদিও দেবর্ষিগণ-প্রদত্ত জ্ঞানের পূর্ণভাণ্ডার স্বরূপ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা সর্ব্বসময়ে নরসমাজে আসিয়া মানবকুলের শিক্ষা বিধান করিতে পারিতেন না। শূদ্রগণের যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাস করিতে হইতনা; কিন্তু তাঁহারা কার্য্য দ্বারা, সাধারণ সামাজিক আচার ব্যবহার ও সভ্যতায় অভ্যস্ত হইতেন। এইরূপে সামাজিক ক্রিয়াদ্বারা উপরিতন তিনশ্রেণী ও শূদ্রগণ মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সংঘটিত হইল এবং এই পার্থক্য নিবন্ধন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, ঔচিত্য সহকারে, আপনাদের দ্বিজ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন। যেমন অণ্ডোৎপত্তি এবং তদ্বিদারণে শাবক সম্ভব দ্বারা বিহঙ্গগণের দুইবার জন্ম হয়, তেমনি দেহোৎপত্তি ও জ্ঞান স্ফূরণ দ্বারা মানবগণের এক জীবনে জন্মদ্বয় নিষ্পন্ন হয়। মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াও, যাহাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়না, তাহাদের প্রকৃতি এবং মানবেতর জীব-প্রকৃতি মধ্যে সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। দৈহিক ও মানসিক অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম দৈহিক জন্মদ্বারা মানবের মানবত্ব সমাধান হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সংস্কার দ্বারা মনের নির্ম্মাল্য এবং তাহাতে জ্ঞান সঞ্চার করিতেন। তাঁহারা, জ্ঞান বিকাশের চিহ্ন স্বরূপ, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। এজন্য, উপরিতন বর্ণত্রয় মধ্যেও, জ্ঞান বিকাশের ক্রমানুসারে, উপবীত গ্রহণ প্রণালীর পার্থক্য বিহিত হইয়াছিল। আচার ব্যবহারগত এই সমস্ত বিসদৃশতা নিবন্ধন, অনেকে শূদ্রগণকে ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্য জাতি অনুমান করেন। শূদ্রগণের বর্ত্তমান অবস্থা যে কিয়ৎ পরিমাণে এই মত পোষণ করে,তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, মৌলিক শ্রেণীবিভাগ সময়ে, আর্য্যগণ যে অনার্য্য জাতীয় লোক সমূহ লইয়া এরূপ একটী অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর গঠন করিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহাদের বর্ণ বিভাগ যেরূপ সুকৌশল-সম্পন্ন, তাহাতে প্রতীতি হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট আর্য্যগণ সহযোগে শূদ্র শ্রেণী গঠিত হয়; কালক্রমে অনেক অনার্য্য জাতীয় মানব এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুসভ্য আর্য্যগণের পরিচর্য্যা বা তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্যকরা অল্পবুদ্ধিশালী আর্য্যগণের সাধ্যায়ত্ত থাকিলেও, উহা অনার্য্যগণের ক্ষমতাতীত ছিল। বিশুদ্ধচারী আর্য্যগণ, সহজে অনার্য্যগণকে তাঁহাদের সমাজে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন নাই। ক্রমশঃ,

শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা আর্য্য ব্যবহার সাধন করিয়া, অনার্য্যগণ শূদ্র শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে বিভিন্ন রাজাগণের রাজত্ব কালে যেরূপে ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয়, তাহাতেও, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন প্রতিভাত হয়।

ব্রাহ্মণগণ বিধিমন্ত্রপূত-বারি প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইয়া ঈশ্বর-প্রেরিত সুলক্ষণ-যুত নরপতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং রাজা ঈশ্বরাভিপ্রায় ও ধর্ম্মবিধি অনুসারে সুনিয়মে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ছত্রধারী আভাময়-কিরীট-শোভিতশির বিনির্ম্মিত-পূর্ব্ব-রত্ন-খচিত সিংহাসনাসীন মণিময়াভরণ নৃপতি-দম্পতি মস্তকোপরি শোভমান আতপত্র ধারণ করিলেন এবং চামরধারীগণ তাঁহাদিগকে সাদরে সুবাস চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর ও দেবগণের উদ্দেশে হোম ও যজ্ঞ ক্রিয়া সমাহিত হইল। তপোবনাগত তেজঃপুঞ্জ মহর্ষিগণ এবং নাগরিক ও জানপদগণ সমক্ষে এই বিরাট অভিষেক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল এবং সকলেই উৎফুল্লচিত্তে ইহা নয়নগোচর করিলেন। ঋষিগণ রাজদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ প্রদান করিলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ নম্রতা সহকারে ঈশ্বরের নিকট রাজদম্পতির মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ নতজানু ও নতশির হইয়া রাজদম্পতিকে অভিবাদন করিলেন এবং ঋষিগণ ভিন্ন সকলেই রাজ প্রভুত্ব স্বীকার এবং রাজ দম্পতির অভিনন্দন করিলেন। অভিষেকানুষ্ঠান সমাপনান্তে, আমন্ত্রিত পরিদর্শকবৃন্দ পরিতুষ্টি সহকারে রাজগৃহে স্বাদুভোজ্যনিচয় ভোজন করিলেন এবং প্রত্যর্থীগণ কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ মাঙ্গলিক অভ্যুদয়ে রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়া, রাজা প্রতিদিন সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক, অমাত্য ও পারিষদ্‌বর্গের সহায়তায় রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণকে সমধিক কার্য্যকুশল বিবেচনা করিয়া, রাজা, তাঁহাদের মধ্য হইতেই, অধিকাংশ রাজ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত করিলেন। মন্ত্রণাহেতু ব্রাহ্মণ-গণ এবং ব্যবহারিক বিষয় মীমাংসা জন্য বৈশ্যগণও রাজামাত্য নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত উপদেষ্টাভাবে ব্রাহ্মণগণ সুহৃদ্ভাবে ক্ষত্রিয়গণ এবং ব্যবহার বিধি প্রস্তাব করণ কল্পে বৈশ্যগণ, প্রায়শঃ, রাজসভায় যোগদান করিতেন। ক্রমশঃ, বিচার কার্য্য সমাধানে ব্রাহ্মণগণ এবং তৎসহায়তায় বৈশ্যগণ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোনও দুঃসাধ্য গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায়, রাজা তপোবনবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিগণকে

সাদরে রাজপুরে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহারাও কখনও কখনও, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, রাজাকে সদুপদেশ প্রদান করিবার জন্য, রাজ সভায় আগমন করিতেন। রাজ সভায় কেবল যে প্রজাপালন ও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইত, তাহা নহে; পরন্তু বিদ্যাতত্ত্ব ও সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিবিধ সারগর্ভ আলোচনা ও মীমাংসা হইত। এজন্য প্রজাকুল রাজাকে একাধারে সমাজপতি ও রাজ্যাধীশ্বর বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজনীতিসূত্র এবং বিবিধ ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তৎসমস্ত রাজানুমোদিত করাইলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ, তদনুসারে, বিচার ও অপরাপর রাজ কার্য্য সম্পাদন এবং রাজক্ষমতা পরিচালন করিতে লাগিলেন। রাজ-শাসন-প্রবর্ত্তন সহ রাজকর-বিধি, ভূমিভোগ-বিধি, উত্তরাধিকার-বিধি, বিবাহ-বিধি, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ-বিধি, ক্রয়-বিক্রয়-বিধি, সাক্ষ্যবিধি, দণ্ডবিধি, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি এবং এই সমস্ত বিধানানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য কার্য্যবিধি প্রণীত ও প্রচলিত হইল। কারণ, রাজকর্ম্মচারীগণ ব্যতিরেকে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণ এই সমস্ত বিধিশাস্ত্রমর্ম্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য, যত্ন পূর্ব্বক এ সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সত্য যুগে ভূমি সম্ভোগ জন্য, কেহ কাহাকেও কোনও কর প্রদান করিতেন না। প্রত্যেকেই আপনাকে স্বাধিকৃত ভূমির স্বামী বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ত্রেতাযুগে মানবগণ বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বর রাজাকে ভূস্বামী করিয়া ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূমি রাজকীয়। রাজার ভূমি সম্ভোগ করিতে হইলে, প্রজাকুলের রাজাকে কর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুনশ্চ, রাজা রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন দ্বারা, প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করেন। যাঁহার তত্ত্বাবধানে লোকে সুখে ও নিরুদ্বেগে জীবন ধারণ করে, তাঁহাকে কর প্রদান করা ধর্ম্মানুমোদিত। পক্ষান্তরে, যাহাতে প্রজার স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত জন্মে, রাজার সেরূপ কর গ্রহণ করা উচিত নহে। এজন্য সদস্যগণ রাজকর বিধি প্রণয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে মানবগণ কিঞ্চিৎ আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছিলেন; এজন্য ভূমিভোগ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় রাজসম্মত ভূমিভোগ বিধি ও উত্তরাধিকার বিধি প্রচলিত হইল। একই কারণে বিবাহ বিধির আবশ্যকতা হইল। যেহেতু রাজা সমাজপতি, সুতরাং রাজসম্মত নিয়মে বিবাহ সংস্কার সাধিত হওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মানব জীবনের অপরাপর সংস্কারের নিয়ামক রহিলেন। সত্যযুগে

আর্য্যসমাজে কাহারও ঋণী হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল না। যেহেতু পার্থিব বিষয়ে কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইতেন না। যদিও ঘটনাক্রমে, কেহ কোনও বিষয়ে কাহারও সাহায্য করিতে পারিতেন, সাহায্যকারী তাঁহার পরিশ্রমের মূল্য কিম্বা সাহায্যের প্রতিদান প্রত্যাশা করিতেন না। আবার একই কারণে, সত্য-যুগে ক্রয়-বিক্রয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না। সমাজে পরিবারবর্গ কেহ কাহাকেও পর বা অনাত্মীয় বিবেচনা করিতেন না। কাহারও পার্থিব কোনও দ্রব্যের অভাব ছিল না; এজন্য কেহ কাহারও নিকট হইতে কোনও দ্রব্য গ্রহণ প্রয়াসী হইতেন না। যদিও, মানবগণ মধ্যে কখনও কোনও পদার্থের আদান প্রদান হইত, তজ্জন্য মূল্যদান বা গ্রহণের ভাব মানব মনে উদিত হইত না। ত্রেতাযুগে, সমারোহাচরণ হেতু, মানবের অভাব বোধ হইল। যদিও, সাধারণতঃ, মানবগণ অতিশয় বদান্য ছিলেন, তথাপি কেহ কেহ পার্থিব কোনও দ্রব্যদ্বারা কাহারও কাহারও সাহায্য করিতে গেলে, সাহায্যকারীগণ ঐ দ্রব্যের পুনঃ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন। আবার কর্ম্ম বিভাগ হেতু, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায় এক-মাত্র বৈশ্যগণের আয়ত্তাধীন হওয়ায়, নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য, সমাজ বৈশ্যগণের মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিলেন। বিনামূল্যে সমাজের আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত সংকুলন করা বৈশ্যগণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কারণ, সংগৃহীত দ্রব্যনিচয় একবার সমাজে প্রদান করিয়া নিঃশেষ করিলে, সমাজের চিরপ্রয়ো-জন পরিপূরণার্থ অনতিবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করা অসম্ভব। এজন্য, বৈশ্যগণ প্রদত্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দ্রব্য অর্থাৎ প্রদত্তদ্রব্যের মূল্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং সমাজের অভাব মোচনার্থ, পুনরায় তদ্বারা আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, বৈশ্যগণ এইরূপে পৃথিবীতে যেমন বাণিজ্য ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিলেন, তেমনি, ব্যবহার্য্য পদার্থ নিচয়ের অধিকারী স্বরূপে সমাজের অভাব মোচনার্থ, ঋণদান প্রথারও প্রবর্ত্তন করিলেন। ঋণদান ও আবশ্যকীয় দ্রব্যবিক্রয়, উভয় প্রথাই সমাজের প্রভূত কল্যাণকর; যেহেতু উভয় প্রথা দ্বারাই সমাজের অভাব মোচন হয়। কিন্তু, মূল উদ্দেশ্যের বিকৃতি হইলে, উভয় প্রথা দ্বারাই, আবার, সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। ঋণগ্রাহী ব্যক্তি ঋণ দ্বারা বিনা পরিশ্রমে, আবশ্যকীয় বস্তু লাভ করিয়া, আলস্যবশে, ঋণ পরিশোধের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ক্রমান্বয়ে ঋণগ্রহণ প্রবৃত্তি পরিপোষণ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে ঋণদাতা লোভপরবশ হইয়া, ঋণদায়ে ঋণগৃহীতার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারেন। ক্রয় বিক্রয়ে, গ্রাহক বিনামূল্যে কোনও দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে,

ক্রমশঃ, তাঁহার বিনা আয়াসে, অনৌচিত্য সহকারে, অপরের সংপরিশ্রমলব্ধ বস্তু-প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভর কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে, বিক্রেতা, দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য দাবি করিয়া, গ্রহণেচ্ছুককে উক্ত দ্রব্যের ভোগে বঞ্চিত করিতে পারেন কিম্বা আলস্য বশতঃ, বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি না দিয়া, মন্দ দ্রব্য বিক্রয়ে মানবের ভোগে বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন। সুতরাং এই দুই হিতকরী প্রথার পাবিত্র্য রক্ষা করিবার জন্য, রাজ সদস্যগণ যুক্তিযুক্ত ভাবে তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিলেন। যদিও ত্রেতাযুগে মানবগণ সত্যপ্রিয় ছিলেন এবং অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত কোনও পক্ষেরই মিথ্যা বলিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি, পক্ষগণের অনবগতি বা অন্য কোনও কারণজাত বিচার্য্য বিষয়ের জটিলত্ব অপনয়ন কল্পে সাক্ষী-বাক্য গ্রহণ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং তাহার সুব্যবস্থার জন্য পণ্ডিতগণ সাক্ষ্যবিধি প্রণয়ন করিলেন। সামাজিক শুদ্ধ আচার-ব্যবহার, সৌনৈতিক নিয়মাবলী এবং ধর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বনে শাসন ব্যবস্থার জন্য, রাজবিধি নিচয় গঠিত হইয়াছিল; সুতরাং অপরাপর সুনিয়ম ভঙ্গের ন্যায় রাজবিধির ব্যতিক্রম দুষ্কৃতাপরাধ এবং রাজবিধিলঙ্ঘন-কারী প্রজা ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম-লঙ্ঘনকারী মানবের ন্যায় দণ্ডার্হ। এজন্য রাজা অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণ সহযোগে, দুষ্ক্রিয়াকারী মানবের শাসনোদ্দেশ্যে অপরাধ বিশেষের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড বিধান করিলেন। ভ্রমক্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়মোল্লঙ্ঘন ব্যতিরেকে, ব্রাহ্মণগণের আর কোন ত্রুটী সম্ভবপর ছিলনা। ব্রাহ্মণ-গণের ভ্রম সংশোধন জন্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ব্যবস্থাপিত হইল।

রাজ-প্রতিকৃতি-সমন্বিত এবং রাজ-নামাঙ্কিত সুবর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত হইল। প্রজাকুল, রাজভক্তি প্রদর্শন জন্য, যত্ন পুর্ব্বক, সাধ্যানুযায়ী এই সকল মুদ্রা গৃহে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত, বিনিময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিবার জন্য, বহুবিধ ধাতুপ্রস্তর, রম্যদর্শন পবিত্র জীবকঙ্কাল, গৃহ-পালিত পশ্বাদি ও অন্যান্য কতিপয় প্রয়োজনীয় পদার্থ ধন বা অর্থ স্বরূপ বিবেচিত হইতে লাগিল। প্রজাগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ধন, নানাপ্রকার মণি-মাণিক্য ও খনিজপদার্থ এবং অপরাপর আহরিত অর্থ দ্বারা রাজকোষ সংস্থাপিত হইল। কারণ, কর্ম্মচারীগণের বেতন দান, সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠান এবং আপৎ-পাতে ভরণ পোষণাদি দ্বারা প্রজাগণের সাহায্য করণ কল্পে রাজার সর্ব্ব সময়ে ধনরক্ষণ অত্যাবশ্যক। প্রজারঞ্জন রাজধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য হইলেও, দুষ্ট প্রকৃতির লোক রাজ-শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া, রাজাকে শত্রু বিবেচনা করিতে পারে

এবং আততায়ী স্বরূপ, হঠাৎ, রাজা কিম্বা তাঁহার স্বজনগণের শরীর আক্রমণ করিতে পারে, অথবা ভিন্ন দেশীয় কোনও বিজিগীষু রাজা সহসা রাজপুরী আক্রমণ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, নিরাপদ রাজবাসস্থানস্বরূপ দুর্গ নির্ম্মিত হইল। অমাত্যাদি উচ্চতন কর্ম্মচারীগণের সহিত, রাজপ্রাসাদ রক্ষা, রাষ্ট্রীয় শান্তি রক্ষা, রাজাদেশ জ্ঞাপন, আদেশাহূত ব্যক্তিবর্গকে রাজদ্বারে আনয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অনেক নিম্নশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। আবার, রাজার লোকবল প্রদর্শন এবং বৈদেশিক রাজার জিগীষান্তরায়োৎপাদনকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সৈন্য-নিয়োগ হইল। ত্রেতাযুগে রাজধর্ম্মানুযায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ এবং সৈন্য নিয়োগ হইয়াছিল মাত্র। যে আশঙ্কা হেতু দুর্গ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়, ত্রেতাযুগে ভারতবর্ষে সে আশঙ্কা ফলবতী হয় নাই বা রাজায় রাজায় কোনও আভ্যন্তরীণ যুদ্ধোপস্থিত হয় নাই। পরবর্ত্তী দ্বাপর-যুগে দুর্গ নির্ম্মাণ ও সৈন্যনিয়োগের সার্থকতা প্রথমে প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, এইরূপে স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বলরূপ সপ্তাঙ্গ-সমন্বিত রাজ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অন্যায়-পীড়িত ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে অন্যায়কারী বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত অভিযোগ শ্রবণ ও তন্মীমাংসা করণ কল্পে বিচারা-লয় সংস্থাপিত হইল। শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ সদ্বিবেচক ক্ষত্রিয়গণ বিচারক এবং লিপি-বিদ্যাকুশল ব্যবহারাভিজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ ও আচার ব্যবহারবিদ্‌ বৈশ্যগণ, বিচার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য, বিচারকাধীন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ, মেধাবী ক্ষত্রিয়গণ রাজকর ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণে মনো-যোগী হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণও বিচারকের আসন সমলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। বিচারপতি স্বীয় আসনে সমাসীন হইলে, ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারী সসম্মানে তাঁহাকে দৈনিক কার্য্যের বিবরণ অবগত করাইতেন এবং বিচারক প্রত্যেক অভিযোগ বিচারে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত পক্ষকে আহ্বান এবং সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া পরম্পরা ক্রমে অভিযোগবৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাহার মীমাংসা করিতেন। অভি-যোগকারী অভিযোগ বিষয় বিচারক সমক্ষে নিবেদন করিবা মাত্র, ক্ষত্রিয় কর্ম্ম-চারী তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন এবং অভিযুক্ত তাহার যে উত্তর প্রদান করিতেন, তাঁহাও তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ হইত। বিচারক উভয় পক্ষের বর্ণনা পরিজ্ঞাত হইয়া, আবশ্যক হইলে, সাক্ষীবাক্য গ্রহণ করিতেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ম্মচারী দ্বয়ের নিকট বিচার বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত আচার ব্যবহার অবগত হইয়া, ঘটনা

ও ব্যবহারের সামঞ্জস্যে স্বীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেন। বিচার গৃহের আবশ্যক দ্রব্যজাত ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে থাকিত,এবং তিনি অধিকাংশ সময় বিচার-গৃহে অবস্থিতি করিতেন। অপিচ, প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে বিচার কার্য্য নিষ্পাদিত হইত বলিয়া, তিনি বিচার বিষয়ের 'আত্মা' স্বরূপ বিবেচিত হইতেন। এজন্য বিচার কার্য্যে, বিচারকাধীন ক্ষত্রিয়কর্ম্মচারী 'কায়স্থ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। যেহেতু কায় শব্দ গৃহ এবং কায়স্থ শব্দ আত্মা অর্থ প্রকাশ করে। পরন্তু, ব্যবহারব্যাখ্যা দ্বারা বিচারকর্ত্তার সাহায্য করিতেন বলিয়া, বৈশ্য কর্ম্মচারী রাজ সভায় শ্রেষ্ঠ বৈশ্য গণিত হইতেন। এজন্য, বিচারকাধীন বৈশ্য কর্ম্মচারী 'শ্রেষ্ঠী' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ত্রেতাযুগ-প্রবর্ত্তিত এই প্রথা-নুসারে, অমিশ্রিত হিন্দু রাজত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে বিচারকগণ কায়স্থ ও শ্রেষ্ঠী সাহায্যে বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যুগ পর্য্যায়ে প্রাচীন হিন্দু রাজবিধি ও ব্যবহারের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও, কলিযুগের প্রথমাবস্থায় যে মৃচ্ছকটিক নাটক বিরচিত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতে আর্য্য-বিচার-পদ্ধতি অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। তাৎকালিক বিচার-বিভ্রাট প্রদর্শনোদ্দেশ্যে, মৃচ্ছকটিককার উক্ত নাটকে বসন্তসেনা সম্বন্ধীয় চারুদত্তের বিচার চিত্র সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন বা বিচার-প্রাপ্তি হেতু প্রজাগণের অর্থব্যয় করিতে হইত না। অভিযোগ উপস্থিত হইলেই, তাহা উপযুক্ত রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অবিলম্বে রাজদ্বারে আনীত হইত। কোন্ বিচারকের নিকট হইবে, তাহা অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়কেই অবগত করান হইত। বিচার প্রথা সরল এবং বিচার কার্য্য অল্পকাল-সাধ্য ছিল। বিচারক-গণের অভিযোগ-মীমাংসা ও আদেশ রাজানুমোদিত করিবার জন্য, রাজগোচরে আনয়ন করা হইত এবং এই জন্যই কায়স্থ কর্ম্মচারী বিচারক সমীপে অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেন। রাজা আবশ্যক বোধে বিচারক কর্ম্মচারী-গণের কোনও কোনও বিচার মীমাংসা ও আদেশ পরিবর্ত্তিত বা রহিত করিতেন এবং সুহৃদ্বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, বিহিতাদেশ প্রদান করিতেন। স্থল-বিশেষে রাজা স্বয়ং বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

সত্যযুগ-প্রবর্ত্তিত সমাজধর্ম্মের প্রতিকৃতি অবলম্বনে ও সমাজ-চক্রবর্ত্তীগণের পদচিহ্নানুসরণে, রাজা সামাজিক পাবিত্র্য রক্ষণে যত্নশীল থাকিলেও, ত্রেতাযুগে বিবিধ সমারোহজ পরিবর্ত্তন, অলক্ষ্যে, সমাজে প্রবেশ করিল। রাজবদান্যতায়

প্রজাকুল সতত রাজগৃহে সুপক্ব স্বাদু রাজভোগ্য বস্তুনিচয়ের আস্বাদ গ্রহণ করায়, মানবের আহারের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সত্য যুগে আর্য্যরমণীগণ রন্ধন-তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত থাকিয়াও, নাসিকা ও রসনা তৃপ্তির জন্য, মসলাদি সংযোগে গুরুপাক খাদ্য প্রস্তুত করিতেন না। ত্রেতাযুগে মানবগণ শরীর পোষণ মূল উদ্দেশ্যের সহিত, রসনা ও নাসিকাতোষণ খাদ্য গ্রহণের একটী আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। খাদ্য নির্ম্মাণ প্রণালী অনেকাংশে জটিল হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যললনাগণ বহুবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া রন্ধন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুবাস রুচিকর উপকরণ মিশ্রণে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমাজে এই সকল শিল্পের অতিশয় আদর হইতে লাগিল। আবার রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণের পরিধান-পরিপাটী-দৃষ্টান্তে সমাজে নূতন পরিচ্ছদ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। সত্যযুগের সরল বাসের পরিবর্ত্তে, মানবগণ সূক্ষ্ম বস্ত্র-নির্ম্মিত নানাপ্রকার গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অঙ্গশোভন জন্য উজ্জল ধাতু প্রস্তর নির্ম্মিত আভরণ ধারণ-প্রথা মানব মনে উদিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অল্পবয়স্ক পুরুষগণ যেমন কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল, হস্তে সুবর্ণ বলয় এবং করাঙ্গুলিতে হীরকাদি-খচিত স্বর্ণাঙ্গুরী ধারণ করিতে লাগিলেন, কুমারী ও পতিযুতা রমণীগণ, সেইরূপ, চাকচিক্যশালী অলঙ্কার-মালায় অঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে রন্ধন, বস্ত্রবয়ন, অলঙ্কার নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইল। নরনারীগণ স্রক্‌চন্দন ও অন্যান্য গন্ধ-বিলেপন প্রস্তুত করিয়া, সাদরে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ধনীগণের বাস ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ-পদ্ধতি সমারোহময়ী হইয়া উঠিল। তাঁহাদের বাসের জন্য হর্ম্ম্যরাজী, শয়ন জন্য পর্য্যঙ্কাবলী, উপবেশন জন্য বিবিধ আসন, গৃহ শোভন ও অন্যান্য ব্যবহার জন্য উত্তমকাষ্ঠ, গজদন্ত, মুক্তা, প্রবাল, ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ-সম্ভূত বহুবিধ মনোজ্ঞ দ্রব্য বিনির্ম্মিত হইতে লাগিল। তাঁহারা কুসুমোপবন এবং সুমিষ্ট-ফল-প্রসূবৃক্ষোদ্যান নির্ম্মাণ ও নির্ম্মলোদক-সরোবর নিকর খনিত করাইতে লাগিলেন। সুতরাং রাজকার্য্য এবং সম্পন্ন জনগণকার্য্যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সূত্রধর-কার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি শিল্পের বহুল প্রসার হইল।

আভরণ, পরিচ্ছদ, মুদ্রা প্রভৃতি দ্রব্যে সুবর্ণের অতিশয় ব্যবহার হওয়ায়, ত্রেতাযুগে রাজা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ ব্যতীত অপর কেহ সুবর্ণ পাত্রে পানভোজন করিতে পারিতেন না। সাধারণে বিশুদ্ধরজত-নির্ম্মিত পান ও

ভোজন পাত্র ব্যবহার করিতেন। সত্যযুগ অপেক্ষা ত্রেতাযুগে লৌহের অধিকতর ব্যবহার হইতে লাগিল। সত্যযুগ-ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র ভিন্ন মৃগয়ার্থ লৌহধনু ও লৌহশর নির্ম্মিত হইতে লাগিল। সত্যযুগে আর্য্যগণ আত্মরক্ষার্থ পশু হনন করিতেন; কিন্তু ত্রেতাযুগে রাজ-প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মাংস ভক্ষণার্থ পশু হনন আরম্ভ করিলেন। বনমধ্যে খাদ্যপশু অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদিগকে বধ করিতে হইত। এজন্য এই পশু-হনন-প্রথা মৃগয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইল। ধনুর্ব্বাণ দ্বারা, দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া, পশু হনন সহজসাধ্য। মৃগয়ায় যে কেবল খাদ্য পশু নিহত হইত, তাহা নহে। বিঘ্নকারী হিংস্রজন্তু নিচয়ও হত হইত। এতদ্ব্যতীত ব্যায়াম জন্য, লৌহ গোলক বা কন্দুক ও লৌহ মুদ্গরাদি নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তন স্বত্বেও, সমারোহ সহকারে সদনুষ্ঠান ও সুকার্য্যনিচয় সম্পাদন করণাভিলাষ ব্যতীত, ত্রেতাযুগে মানব প্রকৃতির আর কোন বিকৃতি সাধিত হয় নাই। পিতৃমাতৃ-ভক্তি, সন্তানবাৎসল্য, সহোদর-সহোদরা-স্নেহ, কৌটুম্বিক-প্রীতি, সামাজিকতা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক সদ্গুণ রাজি, আচার ব্যবহারের জটিলতা স্বত্বেও, অধিকাংশ মানবের মনে সত্যযুগের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। প্রত্যেক পরিবার, সমারোহচিহ্নসহ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা-জনিত শান্তিশ্রী ধারণ করিয়া, সাংসারিক সুখানুভব এবং পরিবারবর্গ পরস্পর পরস্পরে বিমল সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। মানবগণ বিলাসী হইয়াও, আলস্যপরতন্ত্র হন নাই। প্রত্যুত শ্রমক্লান্তি অপনোদন জন্য, তাঁহাদের বিলাস দ্রব্য গ্রহণের ঔচিত্য প্রতীয়মান হইত। সমাজ-হিত-কল্পে কার্য্য করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং মানবজাতির কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট সাংসারিক কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেন। দুষ্কৃতকারীগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে সামাজিক অশান্তির সূত্রপাত হইত মাত্র; কিন্তু রাজ-শাসনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রশমিত হইত। সাধারণতঃ মানব মন নির্ম্মল থাকায়, সুনীতি-ভঙ্গজনিত দোষে সমাজ পীড়িত হইত না। মানবগণ অভাব বা লালসা বশতঃ কোনও অপরাধ করিত না। এজন্য দেশে দস্যু বা তস্করের ভয় ছিল না। ব্যবসায়গত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ অনেক ত্রুটী সংঘটিত হইত; কিন্তু কেহই অসত্য দ্বারা ত্রুটী আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করিতেন না। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন এবং কেহই কাহাকেও অপদস্থ বা বিপজ্জড়িত করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতেন না।

এজন্য কর্ম্মবৈচিত্র্য স্বত্বেও, বন্ধুত্ব কিম্বা সামাজিক একতার হানি হয় নাই।

সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগের মানবগণ আতিথ্যপরায়ণ ছিলেন। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যুগধর্ম্মানুযায়ী, বৃহৎ অতিথিশালা নির্ম্মাণ এবং অধিক সংখ্যক অতিথির প্রতি আতিথ্য-সৎকার-পরাকাষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। তপোবনাগত ঋষিগণ এবং কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশাগত ব্যক্তিগণ ভিন্ন, অপর কেহ অতিথি হইতেন না। বিনাপ্রয়োজনে পরান্ন গ্রহণ বা পর বদান্যতায় জীবন ধারণ দ্বারা সমাজে আলস্যের প্রসার হয় বিবেচনা করিয়া, সাংসারিক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণ, অত্যাবশ্যকতা ব্যতিরেকে, কুত্রাপি আতিথ্য স্বীকার করিতেন না। কিন্তু, তথাপি, প্রয়োজন বশতঃ, অনেকের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইত। গৃহস্বামী অভ্যাগত অতিথিগণের প্রতি এতদূর বিনয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহাদের পূজা ও সৎকারান্তে তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া স্বয়ং ভোজন করিতেন না।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ সবর্ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পৌরোহিত্য এবং ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা-দান করিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকগণ ব্রাহ্মণ-শিক্ষকগণের নিকট ভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিয়া, ব্যবহার-শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা নানাপ্রকার ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুমারীগণকে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে তৎসংক্রান্ত বিদ্যা ও ভাষাব্যাকরণাদির প্রাথমিক পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইত। রুচি অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চাঙ্গীন বিদ্যাচর্চ্চাও করিতেন। ব্রাহ্মণ বালকগণ গৃহে প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া, উপনয়ন সংস্কারের পর, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ঋষিগণের নিকট শ্রুতি ও স্মৃতি শিক্ষা করিবার জন্য তপোবনে গমন করিতেন এবং তথায় জ্ঞান লাভ করিয়া, সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক, গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বন করিতেন এবং তপোবনে মুনিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতেন। ব্রাহ্মণ ললনাগণ বালিকাবয়স হইতে স্বস্ব গৃহে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন।

মানব জাতির যে প্রথমাপরাধ সত্যযুগলয় ও ত্রেতাযুগোৎপত্তির হেতু হইয়াছিল, তদবধি বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ আর্য্যসাধারণকে বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার পবিত্র স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত করিলেন। নিরাকার এবং অনন্তরূপী ঈশ্বর, ঋষিগণ ও জ্ঞানী ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য, যে যে রূপে তাঁহাদের

সমীপে সমুদিত হইতেন, তাঁহারা ত্রেতাযুগে মানবগণকে সেই সকল রূপের প্রতিকৃতি পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। কারণ, ঐশ্বরিক রূপ-প্রতিমা পূজনে ঈশ্বরের পূজা করা হয় এবং পরম পিতা প্রীত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন। দয়ার্দ্র ভগবান জাজ্জ্বল্যমানোদাহরণে সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যা কল্পে, তাঁহার এই সমস্ত পরম পবিত্র রূপ বিকাশ করিয়াছেন, সুতরাং পার্থিব পদার্থনির্ম্মিতা তৎপ্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানের রূপকালঙ্কার (allegory) এবং চিন্ময়ী প্রতিমা স্বরূপা। ফলতঃ সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা ত্রেতাযুগে মানবগণকে তাঁহার এইরূপ পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য, মহর্ষিগণ ও মহাত্মাগণের প্রতি আদেশ করিলেন এবং সন্তানগণের মঙ্গল জন্য এইরূপে তাঁহাদিগকে অমূল্য বর প্রদান করিয়া, কুশলী পরম ধন্য আনন্দময় পুনরায় তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। বাঞ্ছাময়ের বাঞ্ছা না হইলে, তাঁহার উপাসনার এই সর্ব্বোৎকৃষ্টা পদ্ধতি মর্ত্ত্যে অবতরণ করিত না। যাহাতে মানবমন বিস্মৃতি-প্রভাব দলিত করিয়া, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাভিমুখ হইতে পারে, তাহার উপায় স্বরূপ, জগদীশ্বর তাঁহার আরাধনার এই বিশুদ্ধা রীতি মানবগণকে প্রদান করিলেন। এজন্য তত্ত্বদর্শী-বিদিত ঐশ্বরিক রূপের জড় প্রতিমূর্ত্তি, স্বভাবতঃ, হিন্দুগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। এই পবিত্র প্রথার ছায়াবলম্বনে, আমরা প্রতিকৃতি মধ্য দিয়া দূরদেশ বা পরলোকগত আত্মীয়জনগণ-স্মৃতি-সুখানুভব করি এবং তজ্জন্য স্বজন প্রতিমূর্ত্তির আদর করিয়া থাকি। আবার, প্রতিকৃতি মধ্যদিয়া, আমরা রাজা ও গুরুজনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

বিধাতৃ বিধানে ত্রেতাযুগের মানবগণ, ঋত্বিকোপদেশানুসারে জ্ঞানীগণ দৃষ্ট ভগবদ্রূপ প্রতিমূর্ত্তি পূজন দ্বারা পরব্রহ্মোপাসনায় রত হইলেন। অপিচ, উন্নততর জীবজ্ঞানে, তাঁহারা দেবজ্ঞানেরও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। যুগপ্রভাবে তাঁহাদের পরাভক্তি বাহ্যসমারোহান্বিতা হইল। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন জন্য, রাজা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কারুকার্য্য-খচিত উচ্চচূড় উপাসনা-মন্দির নিচয় নির্ম্মাণ করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে মূল্যবান জ্যোতিষ্মান্ ধাতুপ্রস্তর-নির্ম্মিত ঐশ্বরিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইল। উপাসকগণ সাদরে এবং গৌরব ভরে, বস্ত্র, আভরণ এবং কুসুম-মালায় প্রতিমারাজী সুসজ্জিত করিতেন ; ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপদেশানুযায়ী পূতমন্ত্রে প্রতিমার পূজা করিতেন ; প্রতিমা সাক্ষাতে বাসনা বলি দিয়া পরম পিতার আরাধনা এবং তাঁহার উদ্দেশে বিবিধ সুভক্ষ্য ভোগ ও নৈবেদ্য প্রদান করিতেন ; সচন্দন পুষ্প ও গন্ধমাল্য প্রতিমাচরণে

এজন্য কর্ম্মবৈচিত্র্য স্বত্বেও, বন্ধুত্ব কিম্বা সামাজিক একতার হানি হয় নাই।

সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগের মানবগণ আতিথ্যপরায়ণ ছিলেন। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যুগধর্ম্মানুযায়ী, বৃহৎ অতিথিশালা নির্ম্মাণ এবং অধিক সংখ্যক অতিথির প্রতি আতিথ্য-সৎকার-পরাকাষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। তপোবনাগত ঋষিগণ এবং কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশাগত ব্যক্তিগণ ভিন্ন, অপর কেহ অতিথি হইতেন না। বিনাপ্রয়োজনে পরান্ন গ্রহণ বা পর বদান্যতায় জীবন ধারণ দ্বারা সমাজে আলস্যের প্রসার হয় বিবেচনা করিয়া, সাংসারিক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণ, অত্যাবশ্যকতা ব্যতিরেকে, কুত্রাপি আতিথ্য স্বীকার করিতেন না। কিন্তু, তথাপি, প্রয়োজন বশতঃ, অনেকের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইত। গৃহস্বামী অভ্যাগত অতিথিগণের প্রতি এতদূর বিনয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহাদের পূজা ও সৎকারান্তে তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া স্বয়ং ভোজন করিতেন না।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ সবর্ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পৌরোহিত্য এবং ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা-দান করিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকগণ ব্রাহ্মণ-শিক্ষকগণের নিকট ভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিয়া, ব্যবহার-শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা নানাপ্রকার ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুমারীগণকে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে তৎসংক্রান্ত বিদ্যা ও ভাষাব্যাকরণাদির প্রাথমিক পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইত। রুচি অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চাঙ্গীন বিদ্যাচর্চ্চাও করিতেন। ব্রাহ্মণ বালকগণ গৃহে প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া, উপনয়ন সংস্কারের পর, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ঋষিগণের নিকট শ্রুতি ও স্মৃতি শিক্ষা করিবার জন্য তপোবনে গমন করিতেন এবং তথায় জ্ঞান লাভ করিয়া, সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক, গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বন করিতেন এবং তপোবনে মুনিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতেন। ব্রাহ্মণ ললনাগণ বালিকাবয়স হইতে স্বস্ব গৃহে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন।

মানব জাতির যে প্রথমাপরাধ সত্যযুগলয় ও ত্রেতাযুগোৎপত্তির হেতু হইয়াছিল, তদবধি বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ আর্য্যসাধারণকে বাহেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার পবিত্র স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত করিলেন। নিরাকার এবং অনন্তরূপী ঈশ্বর, ঋষিগণ ও জ্ঞানী ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য, যে যে রূপে তাঁহাদের

সমীপে সমুদিত হইতেন, তাঁহারা ত্রেতাযুগে মানবগণকে সেই সকল রূপের প্রতিকৃতি পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। কারণ, ঐশ্বরিক রূপ-প্রতিমা পূজনে ঈশ্বরের পূজা করা হয় এবং পরম পিতা প্রীত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন। দয়ার্দ্র ভগবান জাজ্জ্বল্যমানোদাহরণে সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যা কল্পে, তাঁহার এই সমস্ত পরম পবিত্র রূপ বিকাশ করিয়াছেন, সুতরাং পার্থিব পদার্থনির্ম্মিতা তৎপ্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানের রূপকালঙ্কার (allegory) এবং চিন্ময়ী প্রতিমা স্বরূপা। ফলতঃ সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা ত্রেতাযুগে মানবগণকে তাঁহার এইরূপ পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য, মহর্ষিগণ ও মহাত্মাগণের প্রতি আদেশ করিলেন এবং সন্তানগণের মঙ্গল জন্য এইরূপে তাঁহাদিগকে অমূল্য বর প্রদান করিয়া, কুশলী পরম ধন্য আনন্দময় পুনরায় তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। বাঞ্ছাময়ের বাঞ্ছা না হইলে, তাঁহার উপাসনার এই সর্ব্বোৎকৃষ্টা পদ্ধতি মর্ত্ত্যে অবতরণ করিত না। যাহাতে মানবমন বিস্মৃতি-প্রভাব দলিত করিয়া, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাভিমুখ হইতে পারে, তাহার উপায় স্বরূপ, জগদীশ্বর তাঁহার আরাধনার এই বিশুদ্ধা রীতি মানবগণকে প্রদান করিলেন। এজন্য তত্ত্বদর্শী-বিদিত ঐশ্বরিক রূপের জড় প্রতিমূর্ত্তি, স্বভাবতঃ, হিন্দুগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। এই পবিত্র প্রথার ছায়াবলম্বনে, আমরা প্রতিকৃতি মধ্য দিয়া দূরদেশ বা পরলোকগত আত্মীয়জনগণ-স্মৃতি-সুখানুভব করি এবং তজ্জন্য স্বজন প্রতিমূর্ত্তির আদর করিয়া থাকি। আবার, প্রতিকৃতি মধ্যদিয়া, আমরা রাজা ও গুরুজনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

বিধাতৃ বিধানে ত্রেতাযুগের মানবগণ, ঋত্বিকোপদেশানুসারে জ্ঞানীগণ দৃষ্ট ভগবদ্রূপ প্রতিমূর্ত্তি পূজন দ্বারা পরব্রহ্মোপাসনায় রত হইলেন। অপিচ, উন্নততর জীবজ্ঞানে, তাঁহারা দেবজ্ঞানেরও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। যুগপ্রভাবে তাঁহাদের পরাভক্তি বাহ্যসমারোহান্বিতা হইল। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন জন্য, রাজা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কারুকার্য্য-খচিত উচ্চচূড় উপাসনা-মন্দির নিচয় নির্ম্মাণ করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে মূল্যবান জ্যোতিষ্মান্ ধাতুপ্রস্তর-নির্ম্মিত ঐশ্বরিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইল। উপাসকগণ সাদরে এবং গৌরব ভরে, বস্ত্র, আভরণ এবং কুসুম-মালায় প্রতিমারাজী সুসজ্জিত করিতেন; ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপদেশানুযায়ী পূতমন্ত্রে প্রতিমার পূজা করিতেন; প্রতিমা সাক্ষাতে বাসনা বলি দিয়া পরম পিতার আরাধনা এবং তাঁহার উদ্দেশে বিবিধ সুভক্ষ্য ভোগ ও নৈবেদ্য প্রদান করিতেন; সচন্দন পুষ্প ও গন্ধমাল্য প্রতিমাচরণে

উৎসর্গীকৃত করিতেন; ধূপ দীপাদি দ্বারা প্রতিমার আরতি করিতেন; মহিমা-সূচক বাক্যে পরম পিতা ও দেবগণের স্তুতি ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। পূজাকালে গুগ্‌গুলাদি সুগন্ধি দ্রব্য-সৌরভে বায়ু পবিত্রীকৃত হইত; বিমল স্নেহ-প্রদীপ জ্বালিত হইত এবং শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদি বাদিত হইত। এইরূপে ত্রেতাযুগে ভোগ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, বলি, পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ ও পুষ্প সহযোগে ঈশ্বর ও দেবপূজা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। শূদ্রগণ মহোল্লাসে পুষ্প চন্দনাদি উপকরণ সম্ভার সংগ্রহ করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের ঈশ্বর পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন এবং ঈশ্বরোপাসনার জন্য এই সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিতেন বলিয়া, বিশেষ গৌরবানুভব ও আপনাদিগকে কৃতার্থমন্য বিবেচনা করিতেন। পূজান্তে উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ যখন পরমপিতার মহিমানুকীর্ত্তন করিতেন, যখন উপস্থিত জনমণ্ডলী, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, নতজানু, বদ্ধাঞ্জলি ও গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, সমস্বরে পুরোহিত কথিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সারাৎসারের ধ্যান ও গুণ গান করিতেন এবং তৎপরে সকলে প্রতিমা সমক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। এইরূপে শূদ্রগণ ব্রহ্মোপাসনায় উপরিতন বর্ণগণ সহ যোগ দান করিতে পারিতেন। শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সহকারে পূজা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত; এমন কি, অশুচি দেহে কেহ পূজাস্থলে উপস্থিত হইতে বা পূজোপকরণাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগেও শ্রুতি ও স্মৃতি নিয়মে বিদ্যাভ্যাস, জ্ঞানচর্চ্চা ও অপরাপর কার্য্য নির্ব্বাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিচারালয়ে কায়স্থগণ অভিযোগ বৃত্তান্ত লিখন জন্য যে লেখনী ব্যবহার করিতেন, তদ্ভিন্ন আর কোনও সাংসারিক কার্য্যে লেখনী ব্যবহৃত হইত না। রাজার অসাক্ষাতে যে সকল অভিযোগ বিচার হইত, তৎসমস্ত রাজগোচরে আনয়ন করিতে হইত; এজন্য উহা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা ছিল। ত্রেতাযুগেও মানবগণ ঈদৃশ মেধাবী ছিলেন যে, যত বিস্তৃত বিষয় হউক না কেন, তাঁহারা তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন। জটিলতম বিষয়ের ব্যাখ্যাও তাঁহারা মনোনিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। বুদ্ধি প্রাখর্য্য হেতু, তাঁহারা সমস্ত বিষয় নিমেষে বোধগম্য করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণগণ-বিদিত শ্রুতি স্মৃতি জ্ঞানরাশি ব্যতীত ত্রেতাযুগে রাজধর্ম্মানুযায়ী যে সকল অগ্রন্থনিবদ্ধ ব্যবহার শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তৎসমস্ত, ছাত্রগণ শিক্ষকগণের নিকট বাচনিক ও দার্শনিক শিক্ষা লাভ করিয়া, সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতেন। ত্রেতাযুগে মানবীয় ধর্ম্মের এক চতুর্থাংশ বিস্মৃতি-

গ্রস্ত হইলেও, মানবগণের যে পরিমাণ মানসিক ক্ষমতা ছিল, তদ্বারা তাঁহারা পার্থিব জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিতেন। ত্রেতাযুগে মানবের শারীরিক বল পরমায়ুঃ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই, সত্যযুগের তুলনায় এক চতুর্থাংশ হীন হইয়াছিল।

মানব সমাজ ও মানব প্রকৃতির উল্লিখিত অবস্থায়, ব্রহ্ম, মারীচি, কাশ্যপ, সাবর্ণিক, মনু, ধনু, সুষেণ, বলী, হরিদাস, যৌবনাশ্ব, মুচুকুন্দ, শতবাহু প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ প্রজারঞ্জক সম্রাট্‌গণ রাজ-ধর্ম্মানুসারে ক্রমান্বয়ে ভারত ভূমে রাজত্ব করিলেন। অতঃপর সর্ব্বশক্তিমান রাজরাজেশ্বর ভগবান দৃষ্টান্ত দ্বারা অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অবিনয়ী, প্রজাপীড়ক ভূশাসকের শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন বাঞ্ছা করিলেন এবং ধরাতলে বেণ রাজার আবির্ভাব হইল। দুরাত্মা বেণ এরূপ গর্ব্বী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ধরিত্রী-স্বামী রাজাই ঈশ্বর; রাজা ব্যতীত আর কোনও ঈশ্বর নাই; রাজাকে মানবকুল ঈশ্বর বোধে উপাসনা করিবে, বেণ প্রজাবৃন্দের প্রতি এইরূপ আদেশ করিতেন। সদস্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করা যেমন রাজার পক্ষে অবমাননা, রাজাকে পরামর্শ প্রদান চেষ্টাও তেমনি সদস্যগণের পক্ষে ধৃষ্টতা, এই বিবেচনা করিয়া বেণ রাজা কাহারও সহিত রাজ কার্য্য বিষয়ক কোনও পরামর্শ করিতেন না। অমাত্যবর্গ ভয় প্রযুক্ত উগ্রমূর্ত্তি বেণের সমীপস্থ হইতে পারিতেন না এবং বেণ রাজত্বে 'রাজ সচিব' বাক্যের কোনও সার্থকতা ছিল না। বেণের ঔদ্ধত্য নিবন্ধন, ব্রাহ্মণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ রাজবাটীতে গমন করিতেন না। তোষামোদকারী অপরিণত-বয়স্ক পিশুনগণকে বেণ স্বকীয় পার্শ্বগ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহাদের দ্বারাই বেণ-রাজসভা গঠিত হইয়াছিল। ইহারা চাটু-বাক্য দ্বারা বেণের দাম্ভিকতা ও ইন্দ্রিয়-লালসার প্রশ্রয় প্রদান করিত। দাম্ভিক বেণ মহর্ষিগণকেও অবজ্ঞা করিতেন এবং কুসহচরগণের পরামর্শে ব্রাহ্মণগণের নির্য্যাতন করিতেন। প্রজাবৃন্দের কোপানলে পতিত হইবার জন্য, দুর্ভগ বেণ ত্রেতাযুগে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, এইরূপ বিস্মৃতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বেণ-সহচরগণের পাশবাচারে অনেক সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইল। বিলাসোন্মত্ত বেণ রমণীপরিবেষ্টিত ও গীত বাদ্যাসক্ত হইয়া রাজপুরী মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। হীরক, গারুত্মত, পুষ্পরাগমণি, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল, এই নবরত্নের মিশ্রিতাভালোকিত, চাকচিক্যময় গলিত ধাতু নিচয় চিত্রিত, সুরম্যোপকরণ সজ্জিত গৃহে বিলাসমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া, বেণ পারিষদ-বর্গ সহ

কুরঙ্গনয়না যুবতী অঙ্গনাগণের বিলোল কটাক্ষ, মধুর তানলয়যুত সঙ্গীত এবং অলঙ্কার শিঞ্জন-সমন্বিত নৃত্য সম্ভোগ করিতেন। কখনও কখনও বেণ সুসজ্জিত রথ বা অন্য কোনও যানে রমণী ও অনুচরগণ সহ বিলাসভ্রমণে বহির্গত হইয়া কুনীতির প্রসার করিতেন। প্রজাগণের অভাব বা অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, তাঁহাদের ধনশোষণে, বেণ বিলাসচর্য্যা করিতেন। প্রজাকুল বেণের দুর্ব্যবহারে এরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বেণকে অত্যাচারী দৈত্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, তাহার করাল কবল হইতে দেশ এবং সমাজের পরিত্রাণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেশ ও সমাজের মঙ্গল কল্পে অত্যা-চারী দুর্ব্বিনীত রাজা প্রজাকুলের বধ্য এবং এরূপ নরহত্যায় পাতক নাই, ব্রাহ্মণগণ ঈদৃশ অনুশাসনবাক্য প্রচার করিলেন। ইহাতেও দুরাশয় বেণের চৈতন্য হইল না। মূঢ় বেণ প্রকৃতিপুঞ্জের বিরক্তির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, অধিকতর দৃপ্তভাবে ইন্দ্রিয় সেবা, বিলাসচর্য্যা ও প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। বেণের ব্যবহার যখন প্রজাগর্গের একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা সানুচর বেণ ভূপতিকে তাড়িত করিয়া মৃত্যুর তিমিরাবৃত বদনগহ্বরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এইরূপে বেণরাজা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

বেণোবিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনি শ্চৈব সুমুখো নিমিরেবচ ॥৪১ ॥

মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়।

[নহুষরাজা ত্রেতাযুগের পরবর্ত্তী কালে এবং যবনকুল-সম্ভূত সুদাস, সুমুখ, এবং নিমি ভূপতিত্রয় দ্বাপর যুগের শেষভাগে অবিনয় ও প্রজাপীড়ন দোষে নিহত হইয়াছিলেন।]

হতভাগ্য বেণরাজ প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত মানব মনে আর্য্যাবর্ত্তে একছত্র রাজ শাসন প্রথা সম্বন্ধীয় বিবিধ আশঙ্কা আনয়ন করিল। আর্য্যগণ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ শাসনাধীন হইলে, রাজ-গণের পরস্পর দৃষ্টান্তে দেশে শাসন-সুব্যবস্থা হইতে পারে। বেণ রাজত্বের পর হইতে আর্য্যাবর্ত্ত কতিপয় রাজ্যে বিভক্ত হইল এবং পৃথু, ইক্ষ্বাকু, দ্যোতকর, কৃৎসর্প, শ্রেষ্ঠধর, কাকুৎস্থ, শতজীব, দণ্ড, হরিষ, বিজয়, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব. মৃত্যুঞ্জয়, মহাপদ্ম, ত্রিশঙ্কু, উচ্চাঙ্গদ, মরুৎ, অনাবঙ্গ, বিকর্ণবাহু, সগর, অংশুমান, অসমঞ্জা, ভগীরথ, অশ্বঞ্জয়,মণি, দিলীপ, রঘু, অজ,জনক, দশরথ প্রভৃতি খ্যাতনামা

রাজগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বস্ব রাজ্যে রাজত্ব করিয়া দেশ ও সমাজের সুখ ও শান্তি বিধান করিলেন। এই সকল ভূপালগণের কেহ কেহ এরূপ পবিত্র চরিত্র ছিলেন যে, তাঁহাদের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্য পালনার্থ, রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক, দীনবৃত্তি পরম্পরা আশ্রয় করিয়াছিলেন। পরমপিতা হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রবল প্রদর্শন জন্য, তাঁহাকে যে ভীষণ পরীক্ষাধীন করিয়াছিলেন, মহাভারত গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অদ্যাপি ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ অন্তরের কালিমা বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে, সাগ্রহে মহামহিম নির্ম্মলচেতা হরিশ্চন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী জীবনবৃত্ত শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। মিথিলাধিপতি পুণ্যকীর্ত্তি মহারাজ জনক রাজসম্পদ্ মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভোগ বাসনা নিরাকৃত করিয়া, অতুল মানসিক বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রশান্তচিত্তে সংসারে যোগী জীবন যাপন করিয়া রাজর্ষি নামে ধন্য হইয়াছিলেন। তথাপি এই সমস্ত মহাসত্ত্বনৃপতিগণ মানব সমক্ষে আদর্শ রাজচরিত্র-চিত্র প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হন নাই। যাহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে জীবের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, যাহাতে বাহ্যস্থূলদেহ রাজ ভূষণে ভূষিত হইলেও, অন্তরস্থ সূক্ষ্ম শরীর প্রত্যেক প্রজার দাস্য ভাব অবলম্বন করে, যাহাতে প্রজাতোষণ যজ্ঞে আত্মবলি প্রদান করিতে হয়,অথবা প্রজাহিতে আত্মবিদ্যমানতা নিমজ্জিত করিয়া, স্বার্থ পরার্থের একীকরণ করিতে হয়, যাহাতে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাকুল প্রতিপালন করিতে হয়,এরূপ আদর্শ রাজ প্রকৃতি বিকাশ সমাধান হেতু ভগবজ্জ্যোতিঃ পুণ্যাত্মা মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার স্বরূপ অযোধ্যা নগরীতে সমুদিত এবং রামনামে পরিকীর্ত্তিত হইলেন। ঋষিগণ মঙ্গলাবির্ভাব সূচনায় পূর্ব্ব হইতেই আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; পরন্তু, অসেচনক শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবে সকলে তাঁহার দর্শনে পুলকিত হইলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তৎকালেই, তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের মঙ্গলময় রাজা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই মানবকুলচূড়ামণির রামনামকরণ সার্থক হইয়াছিল। অপিচ, মনস্বী পুরাণকারগণ, রামাবির্ভাব ও রামরাজত্ব-মহিমান্বিত ত্রেতাযুগের যে রামনামে প্রসিদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত।

অলৌকিক ক্ষমতাশালী শ্রীরামচন্দ্র মানবের বৈধধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া, স্বর্গীয় কুশলতার সহিত লৌকিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকাণ্ড নিষ্পাদন দ্বারা স্বীয় আদর্শ মানবত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সাংসারিক ধর্ম্মানুসারে বিনয়, সৌজন্য, গুরু-

জনশ্রদ্ধা, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য,দাম্পত্য প্রেম, প্রশান্ততা, সম্পদে অলিপ্সা, বিপদে সাহস এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়, রাজা হইবার পূর্ব্বেই, বাল্য এবং কৈশোর অবস্থায়, রাম তৎসকলের পরাকাষ্ঠা সাধন পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্রোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বালক রাম শারীরিক বিক্রম, জাতীয় বিশেষ বিদ্যা এবং সাধারণ ব্যবহারিক বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে পারিতেন না। তথাপি, তিনি, মানবগণনায়, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিষ্ট ও অমায়িক বালক ছিলেন। বালকরাম পিতৃরাজ-সভাগত বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, জাবালি, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ সমক্ষে, তাঁহাদের আদেশ ক্রমে, সংসারের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব, মানবের বিস্তৃতি ও মোহ প্রভৃতি গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয়ে বিনীতালাপন করিতেন। ঋষিগণ নির্ব্বাক্ হইয়া, আনন্দ-নিমগ্ন-চিত্তে বালক-রামের বচনামৃত পান করিতেন এবং তাঁহাকে প্রশংসা করিবার উপযুক্ত বাক্যা-হরণ করিতে পারিতেন না। তথাপি মহারাজ কুমাররাম আপনাকে মহর্ষি-গণের পদরজরেণু-কল্প বিবেচনা করিয়া, গলদশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলি পুটে, পরম-গুরুজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট জ্ঞান-ভিক্ষা যাচ্‌ঞা করিতেন। জীবনের সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র, জনকজননী ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের তুষ্টি বিধানার্থ, ঋষিগণের অনুজ্ঞায়, বিদেহ রাজনন্দিনী সুলক্ষণা সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা দশরথ এবং রাজ্ঞী কৌশল্যা তাঁহাদের তপস্যালব্ধ পুত্ররত্নের জন্ম হইতে, তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার যে বাসনা পরমাদরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, প্রজাগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, রামের উনবিংশ বর্ষ বয়সে, তাহা ফলবতী করিবার চেষ্টা করিলেন। রামরাজ্যাভিষেক জন্য শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত হইল। মহা সমারোহ সহকারে অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। সুবিস্তৃত অযোধ্যারাজ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং অযোধ্যানগরী সুরপুরী সদৃশী প্রতিভাতা হইতে লাগিল। এই সমস্ত আহ্লাদ চিহ্ন যে শীঘ্রই বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছাদিত হইবে, রাজ্যাভিষেক আয়োজনে যে রাম নির্ব্বাসন সম্পন্ন হইবে, নাগরিক বা জানপদগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ফলতঃ রাজ্যাভিষেক রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, বিকট পরীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখীন হইল। চরম বৈপরীত্য সংঘর্ষে সংসার ক্ষেত্রে বীরপুরুষগণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। চরম হর্ষ এবং চরম বিষাদ, চরম সুখ এবং চরম দুঃখ প্রভৃতি বিপরীত ভাবনিচয়ের যুগপৎ সমাবেশে যাঁহাদের

চিত্ততুলাদণ্ড স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তাঁহারাই সাংসারিক মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামচন্দ্র আজীবন ভীষণ সাংসারিক পরীক্ষাপরম্পরাধীন হইয়া, প্রত্যেক পরীক্ষায় এরূপ গৌরবের সহিত সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন যে, জ্ঞানীগণ, সংসারচারী হিতকামী ব্যক্তিগণ পক্ষে, তাঁহার সুদৃষ্টান্ত-মালা সর্ব্বতো-ভাবে অনুকরণীয় বিবেচনা করেন। বহুজন-বাঞ্ছিত রামরাজ্যাভিষেক-কল্পে যে শুভদিন স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্ব দিবস, রাজা দশরথের মধ্যমা ভার্য্যা রাণী কৈকেয়ী, দুষ্টা ভৃত্যা মন্থরার কুপরামর্শে, ভর্ত্তার নিকট পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বরদ্বয় যাচ্ঞা করিয়া, একবরে সপত্নীসুত রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এবং বরান্তরে স্বীয়তনয় ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্যে রাজা দশরথ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। কারণ, একদিকে প্রতিশ্রুতির অপালনে সত্য ভঙ্গ যেমন পাপ ও লজ্জাজনক, অন্যদিকে, পত্নী মন্ত্রণায় লোকপ্রিয় পুত্ররত্নের নির্ব্বাসন ও দীর্ঘকাল বনবাসাদেশ তেমনি ভয়া-নক নিন্দাকর ও শোকাবহ। দশরথ কৈকেয়ীকে কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না; কিন্তু পিতার ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ ভার রামচন্দ্র স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। রাম প্রশান্ত চিত্তে স্বীয় বনযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং যে দিবস তাঁহার রাজ্যাভিষেক জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, সেই দিবসে, অভিষেকায়োজনের মধ্য দিয়া অম্লান বদনে অযোধ্যাপরিত্যাগ পূর্ব্বক বন গমন করিলেন। ভার্য্যা মৈথিলী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তাঁহার অনুগামী হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, রাম চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বনবাস-যাত্রায় তাঁহাদিগকে সমভি-ব্যাহারে লইয়াছিলেন।

অমিত-মানসিক বিক্রম প্রভাবে অরণ্য গমন করিয়া, রাম বিশ্বের কাল গাত্রে যে সুমহান্ নৈতিক উপদেশ নিচয় চিত্রিত করিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডাবসান পর্য্যন্ত তাহা কথনও হীনপ্রভ হইবে না। পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা পরম গুরু। পিতাকে সত্য-ঋণ-মুক্ত করিবার জন্য, রামচন্দ্র রাজ্য ও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া কাননবাসী হইলেন। জিতেন্দ্রিয় রামের নিকট ইন্দ্রিয়বিলাস ভোগ অতি তুচ্ছ পদার্থ ছিল। পতিমুখে বনবাস কষ্ট বিবরণ শুনিয়াও, জানকী যখন রামানুগমনে কৃতসংকল্পা হইলেন, রাম তখন তাঁহার বনগমনে বাধা দিলেন না। কারণ সাধ্বী স্ত্রী সম্পদ অপেক্ষা বিপদে পতিসেবা করিয়া, যে অধিকতর পরিতোষ প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিতা করা দাম্পত্য ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। আবার, ভার্য্যা সতত পতিরক্ষণীয়া। স্ত্রী, স্বামীসহ কাননগামিনী হইয়া,

স্বামীরক্ষণাধীনা হইবার ইচ্ছা করিলে, দাম্পত্য ধর্ম্মানুসারে, তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ করা ভর্ত্তার একান্ত কর্ত্তব্য। রামসহ লক্ষ্মণের বনবাসে, সুমিত্রা মাতা ও উর্ম্মিলা বধূর মনোবেদনা এবং সুকুমার লক্ষ্মণের শারীরিক কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বনগমনে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার সে আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইল, তখন, তিনি লক্ষ্মণকে সৌভ্রাত্র-প্রদর্শনের অবকাশ দিবার জন্যই, তাঁহাকে বনযাত্রায় সমভিব্যাহারী করিলেন। দশরথ তনয়গণ-মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, অযোধ্যা রাজ্যে একমাত্র রামেরই শাস্ত্রসম্মত অধিকার থাকা স্বত্বেও, ভরতের অনুকূলে সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া, রাম অসামান্যা উদারতা ও ভ্রাতৃপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিলেন।

ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে, আর্য্যসভ্যতালোক কিয়ৎপরিমাণে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেও আর্য্যগণ তৎকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথের সহিত মুখ্যভাবে কোনও সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন নাই। ত্রেতাযুগের শেষ ভাগেও, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যবসতি বিস্তার হয় নাই। ত্রেতাযুগাধিকৃত সময়ে ভারতের বিন্ধ্যাচলদক্ষিণবর্ত্তীভূভাগ সম্পূর্ণরূপে অনার্য্যগণাধ্যাসিত ছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে, আর্য্যাবর্ত্তের সহিত দাক্ষিণাত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লোকরঞ্জন রাম দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিলে, তথাকার অধিবাসীগণ তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গুহক মহাশয় সর্ব্বাগ্রে পরম যত্নে শ্রীরামচন্দ্রের অতিথিসৎকার করেন। রাম, হৃদয়বান গুহকের আতিথ্যে অতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন দান ও মিত্র সম্বোধন করিলেন। ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য নরপতিগণ এবং প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রীরামচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও অনুচর হইলেন। লঙ্কাধিপ দুরাত্মা দশানন সীতা দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধারে, এই সকল ব্যক্তিগণই রামের সহায়তা করিয়াছিলেন। এইরূপে, রাম দক্ষিণাপথে সম্পূর্ণরূপে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র ভারতভূমির আদর্শ অধীশ্বর হওয়া বিধাতৃ বিহিত হইয়াছিল; এজন্য, রাম, রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে, বনবাস ছলনায়, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের একত্রীকরণ সম্পাদন করিলেন।

বনবাস হইতে অযোধ্যানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রাম রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। মহারাজ দশরথ পুত্রবিচ্ছেদশোকবহ্নিভস্মীভূত হইয়া, রাম-বনগমনের অব্যবহিত পরেই, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। প্রজাকুল

রাম নির্ব্বাসনে যে মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বপুর প্রত্যাগমন মাত্র, তাহা বিস্মৃত হইলেন। রাম এরূপে প্রকৃতি পালন করিতে লাগিলেন যে, কোনও প্রজা কোনও প্রকার অভাব অনুভব করিতেন না। রাম রাজা সর্ব্বপ্রকার ঐহিক মঙ্গলের আধার স্বরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন এবং প্রজা-বর্গ সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ধন, মান, বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে রামরাজার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিলেন। স্বচ্ছদর্পণ সদৃশ রামান্তঃকরণে, তাঁহার বিরাট রাষ্ট্র মূর্ত্তি এবং প্রত্যেক প্রজার মানসিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। রাজকীয় সমারোহ ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সত্যযুগের পবিত্র সামাজিক ভাব আসিয়া মিশ্রিত হইল। রামরাজ্য এক অভূতপূর্ব্ব এবং অভাবনীয় সুখ-নিলয় হইয়া উঠিল এবং তথাকার অধিবাসী বৃন্দ অমরনিকেতন বাসের আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। রাম-রাজত্ব খ্যাতি প্রভায় সমগ্র জম্বুদ্বীপ আলোকিত হইয়া উঠিল এবং এই দিব্যালোকছটা, ক্রমশঃ, অবশিষ্ট দ্বীপমালায় প্রবেশ করিল। কিন্তু রাম যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বার্থত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠায় তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া, আত্মাহুতি প্রদান দ্বারা তাহার উদ্‌যাপন করিতে হয়। আত্ম-বলিদান রূপ ভীষণ পরীক্ষা রামের সম্মুখীন হইল এবং রাম তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন। রাবণাপহৃতা সীতা উদ্ধার-প্রাপ্তা না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্কাপুরে বাস করিয়াছিলেন। পরাপহৃতা এবং পরগৃহ-বাস-পূর্ব্বা ভার্য্যাসহ রামের ধর্ম্মাচরণ কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে প্রজাকুল মধ্যে কেহ কেহ সমালোচনা করিতে লাগিলেন এবং রাম তাহা অবগত হইলেন। যাহাতে দাম্পত্যবিধি সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহসূচক দৃষ্টান্ত প্রবর্ত্তিত না হইতে পারে, তজ্জন্য, রাম সীতা বর্জ্জন করিয়া, লোকরঞ্জনে আত্মোৎসর্গ করিলেন। রাম জানকীর পবিত্র চরিত্রে অণুমাত্রও সন্দিহান হন নাই এবং তাঁহাকে প্রাণ তুল্য ভালবাসিতেন। তথাপি, কেবল প্রজাতোষণ জন্য, স্বীয় জীবন-কল্পা সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিলেন। রামসীতার বাহ্যদেহে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, উভয়ের আত্মায় কোনও প্রভেদ ছিল না; অথবা সীতারাম একাত্মক। প্রজাকুল রামের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়-তর ছিলেন। এজন্য, তাঁহাদের প্রীত্যর্থে, রাম স্বীয় আত্মা এবং অর্দ্ধাবয়ব সীতাকে উৎসর্গ করিলেন। মানবাভিহিত মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে প্রজাপালন করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা মানবের সাধ্যায়ত্ত। অতএব রামরাজ্যশাসন ভূতলে আদর্শ রাজত্ব পরিগণিত হয়। ক্ষিতিপালগণ রামদৃষ্টান্তানুসারে রামের ন্যায় রাজত্ব করিতে পারেন এবং তাহাতেই রাজধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালন করা

হয়। এখনও রামচরিত পাঠ বা তদাকর্ণনে, স্বপ্নাবির্ভূত মনোরম দৃশ্যের ন্যায় রাম-রাজত্ব-ছবি আমাদের মানসপটে সমুদিত হয় এবং সুস্বপ্নাবেশ-বিচ্যুত ব্যক্তি জাগরণে স্বপ্নাভিনয় দর্শনবঞ্চিত হইয়া যেরূপ আক্ষোভিত হন, ভারতবাসী হিন্দুগণ অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে সেইরূপ আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকেন, 'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।'

রাম যেমন পুরুষ জাতির আদর্শ, তদীয় গুণবতী ভার্য্যা ললনাললাম-ভূতা মৈথিলী সেইরূপ স্ত্রী জাতির আদর্শস্বরূপা। সহধর্ম্মিণী রূপে রামের সাহচর্য্য করিয়া সংসার আলোকিত করিবার জন্য, রাজর্ষি জনকের পবিত্র ঔরসে এই সতীত্ব ও পাতিব্রত্য প্রতিমার জন্ম হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, অদ্যাপি, দৈনিক মঙ্গলোদ্বোধন মানসে, প্রাতঃকালীন শয্যাত্যাগ সময়ে, পুণ্যশ্লোকা বৈদেহীর নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। জনকরাজনন্দিনী মহারাজ দশরথের অসূর্য্যস্পশ্যরূপা কুসুমপেলবা পুত্রবধূ দীর্ঘকাল বনচারিণী হইয়া গহন কাননে পতিসেবা করিয়াছিলেন, এই বিমল কীর্ত্তিবাণী পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে। সুবর্ণ যেমন বারম্বার অগ্নিনিক্ষিপ্ত হইয়া, অধিকতর উজ্জ্বল হয়, তেমনি উপর্য্যুপরি কঠোর পরীক্ষাধীন হইয়া, এই দেবী-চরিত্রের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশিত হইয়াছিল। অশোক বনে রামধ্যানপরায়ণা জানকীকে দেখিয়া আসিয়া, হনুমান রামকে তাঁহার এবম্বিধ সংবাদ নিবেদন করিয়াছিলেন। 'দেব! আমি জননী সীতাকে আপনাতে সংযুক্তা দেখিয়া আসিলাম। তাঁহার বাহ্যদেহ বোধ নাই।' বনবাসের পর অযোধ্যায় আসিয়া, সীতা রাজমহিষী হইয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ বধূগণ যেমন সংসার ধর্ম্মানুযায়ী গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন, সীতাও সেইরূপ সরল পারিবারিক জীবন যাপন করিতেন। পরন্তু, সীতা এরূপ নিপুণতার সহিত সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিতেন যে, লোকে তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতাপন্না বিবেচনা করিয়া, প্রত্যেক গৃহকর্ম্মে তাঁহার সুনীতি অনুসরণ করাই স্ত্রীজাতির একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন। এইরূপে সাধারণ গৃহকর্য্যে সীতার অসাধারণত্ব এবং সাধারণ স্ত্রীজাতি মধ্যে তাঁহার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত। একদিকে সারল্য ও কোমলতা যেমন পবিত্র সীতা-চরিত্রের মাধুর্য্য, অন্যদিকে অভাবনীয় সহিষ্ণুতা তেমনি ইহার মাহাত্ম্য। কোমলপ্রাণা সীতা বনবাসকালে মৃগশাবকগণকে স্বহস্তে প্রতিপালন করিতেন, কোনও প্রাণীর উপর অত্যাচার দর্শন করিলে মর্ম্মব্যথিতা হইতেন, সহকারের সহিত মাধবী লতার সম্মিলন করাইয়া দিতেন, অযোধ্যারাজান্তঃপুরে মাতার ন্যায় সক-

লকে স্নেহ করিতেন, দাসীর ন্যায় সকলের পরিচর্য্যা করিতেন এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে কাহারও ক্রটী দেখিলে স্বয়ং লজ্জায় ম্রিয়মানা হইতেন। সরলপ্রাণা সীতা বালিকার ন্যায় সকলকে বিশ্বাস করিতেন; কাহারও কৈতব ব্যবহার বুঝিতে পারিতেন না। তপোবন দর্শন ছলনায় জানকী-নির্ব্বাসন-কল্পে, লক্ষ্মণ আচম্বিতে আসিয়া, যখন মৈথিলীকে নিবেদন করিলেন, 'দেবি! আপনি যে তপোবন দর্শন বাসনা করিয়াছেন, তজ্জন্য রথ প্রস্তুত হইতেছে; আমি আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তপোবনে যাইব,' সীতা তৎক্ষণাৎ দেবরের বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে রথে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। জানকীকে বাল্মীকির আশ্রম সমীপে লইয়া গিয়া, সৌমিত্রি যখন বিষাদভারপীড়িতান্তঃকরণে, গদগদ বচনে নিদারুণ নির্ব্বাসন-বার্ত্তা তাঁহার জ্ঞাপন করিলেন, সীতা তখন অণুমাত্রও চিত্তচাঞ্চল্য প্রদর্শন করেন নাই। প্রত্যুত, সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা, লক্ষ্মণকে ত্বরিত অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনে প্রেরণা করিয়াছিলেন। গহন বনস্থলী মধ্যে জানকী লক্ষ্মণের বিষাদ অপনোদন জন্য তাঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন:—"সুশীল লক্ষ্মণ! তুমি বারম্বার আমাকে অভাগিনী বলিয়া ব্যথিতা করিও না। আমি যখন আর্য্যপুত্রকে স্বামীলাভ করিয়াছি, তখন, আমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী রমণী ভুবনে দ্বিতীয়া আর কে আছে? আমার দুঃখে তোমার কাতর হইবারও কোনও কারণ নাই; যেহেতু আমার কোনও দুঃখ নাই। আমি আর্য্যপুত্রের মন জানি। তিনি আমাকে নির্ব্বাসিতা করেন নাই; প্রজাতোষণ জন্য আমার স্থূলবাহ্যদেহ অন্তরিত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার সরল মনোভূমে, তিনি তাঁহার এ অযোগ্যা দাসীকে আজীবন নিবসতি করিতে দিবেন। আমার হৃদয়াসনে, আমি গৌরব সহকারে আর্য্যপুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি। আজীবন আমার সমৃদ্ধ অন্তঃকরণ সে রত্নবিচ্যুত হইবে না। আমার বাহ্যকায় যেরূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হউক, আমার সমস্ত মন আর্য্যপুত্রে সংযুক্ত থাকিবে। অতএব হে বীর! তুমি খেদ করিও না। অযোধ্যারাজ্য ও রাজ পরিবারের কুশল হেতু তুমি নিশ্চিন্ত মনে সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন কর।' ফলতঃ, রাবণাপহৃতা হইয়া রামপ্রিয়া দশাননের অশোক কাননে যেরূপ রামপদ ধ্যানে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, সাধ্বী, সেইরূপ, সতত রামগতচিত্তে প্রশান্ত ভাবে বাল্মীকির তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে, অনুতাপদগ্ধ প্রজাবর্গ সীতাদেবীকে অযোধ্যানয়নে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তদ্ধেতু জানকী অযোধ্যায় আনীতা হইলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় মৈথিলীর জীবনা-

ভিনয় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অলোকসামান্যা সীতা অযোধ্যা-রাজ-গৃহে আসিয়া, বিস্ফারিত চর্ম্মনেত্রে প্রাণকান্ত শ্রীরামচন্দ্রের মধুর কান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তদবস্থায় তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহাধার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্তে মিশিয়া গেল।

দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য, সীতা-নির্ব্বাসন হইতে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার সুবর্ণপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন এবং প্রিয়া ভার্য্যার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি বামে স্থাপন করিয়া যাবতীয় ধর্ম্মচর্য্যা নির্ব্বাহ করিতেন। জানকীর জীবনাবসানে, স্বীয় জীবিতকাল পর্য্যন্ত, রাম একই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

নিসর্গে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া যে বিমল ভাববিলাস সম্ভোগ করা যায়, সাংসারিক মানবগণ কৃত্রিম উপায়ে মনের নিম্নতর স্তরে তাহার আভাব উপলব্ধি করিবার জন্য, সত্যযুগ হইতে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত বাদ্যাদি চর্চ্চা করিয়া আসিতেছিলেন। ত্রেতাযুগে মনুষ্যগণ, ক্রমশঃ, অধিকতর সংসারকর্ম্ম-ব্যাপৃত থাকায় মহামুনি বাল্মীকি কাব্যরসে মানবমন সরস করিবার অভিপ্রায়ে, পবিত্র রামচরিত্র অবলম্বনে, রামায়ণ মহাকাব্য বিরচন করিলেন। ভাবুকগণ সৃষ্টিরহস্তে যে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তরস পান করিয়া প্রেমোন্মাদনাবিষ্ট হন, সংসারচারী ব্যক্তিগণ আদি-কবি-কবিতায় সেই নবরসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, পরম পুলকিত হইলেন। কবিগুরু বাল্মীকি সংসারে কাব্য রচনা শিক্ষাদিবার জন্য, রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এই হেতু উহা এত মধুর ও প্রাঞ্জল। রামরাজত্ব হইতে এ পর্য্যন্ত, রামায়ণ গীত, অধীত ও শ্রুত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু হিন্দুগণের নিকট ইহা কখনও পুরাতন প্রতীয়মান হয় না, কিম্বা এতৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের তৃষ্ণামান্দ্য সংঘটিত হয় না। রাম ও জানকীর সুধাময় জীবনবৃত্ত ও তৎপ্রসঙ্গে কীর্ত্তিমান মানব সমূহের শিক্ষাপ্রদ আখ্যানরাজি ভিন্ন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় অনেক গূঢ় তত্ত্ব দ্বারা রামায়ণের সুবৃহৎ কলেবর সমলঙ্কৃত হওয়ায়, সংসার-তাপ-দগ্ধ মানবের পক্ষে, ইহা শান্তির উৎস স্বরূপ প্রমিত হয়। বাল্মীকি-নির্ম্মিত এই মহাতরণি আশ্রয় করিলে, ঝটিকাতরঙ্গসমাকুলিত সংসার-বারিধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এজন্য, হিন্দুগণ কেবল যে রামায়ণের প্রকৃষ্ট কাব্যরসে আনন্দিত হন, এমন নহে; পরন্তু, ইহাকে, ধর্ম্মশাস্ত্র বিবেচনায়, শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধানান্তর, নরপালগণ তৎপ্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে ভারত-

ভূমে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম না হইলেও, মানবগণের অন্তঃকরণে এক দারুণ বেদনানুভূতি হইতে লাগিল। আর্য্য ও অনার্য্য সকলেই ঐকমতে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সতীত্ব প্রতিমূর্ত্তি জানকী দেবীর চরিত্রে সন্দিহান্ হইয়া মানব জাতি যে ভীষণ অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য সর্ব্বনিয়ন্তার অপরিহার্য্য কোপ তাহাদের উপর আপতিত হইবে। দশানন কর্ত্তৃক সীতাপ্রতি অন্যায়াচরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব; রাবণাপহৃতা হইয়া তদ্গৃহ বাসে সীতাচরিত্রে কোনও প্রকার কালিমা স্পর্শ করে নাই এবং জানকী-চরিত্র মানব সংশয়াতীত; এই সকল পবিত্র বিশ্বাস, স্বতঃই, তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। মৈথিলীর বিমল চরিত্রে ভ্রান্তমানবের সংশয় নিবন্ধন, তাঁহার যে নির্যাতন পরম্পরা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহাতে মানব জাতির অপরাধ আরও গুরুতর হইয়াছে, সকলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সুতরাং, শোক, অনুতাপ ও বিধাতৃ দণ্ডাশঙ্কায় মানবগণ স্ফূর্ত্তিহীন জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই জাতীয় বিষাদ-ছায়া-সমন্বিত ভারতবর্ষে, লবকুশাদি কতিপয় রাজন্যবর্গের পুরুষানুক্রমিক সুশৃঙ্খল রাজত্বাবসানে, ত্রেতাযুগবিলয়াবিলম্বসূচনাস্বরূপ ধূমকেতন-কল্প নহুষ নৃপতির আবির্ভাব হইল। রাজা নহুষ অধিকতর উৎসাহভরে বেণরাজত্বের পুনরভিনয় করিয়া, সমসাময়িক ভারত-ভূপালগণ সমক্ষে জীবন্ত কুদৃষ্টান্ত-মালা উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে লাগিল। সত্যযুগাবসান প্রাক্কালে যেমন পরবর্ত্তী যুগের আভাব-চিহ্ন ক্ষীণভাবে উদিত হইয়াছিল, সাধারণের অজ্ঞাতসারে, সেইরূপ ভবিষ্যৎ যুগের অস্ফুট লক্ষণ কালগাত্রে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। প্রজাকুল নহুষের অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া, প্রতিকার পন্থানুসন্ধিৎসু হইলেন। হতভাগ্য নহুষ পতঙ্গবৎ প্রজা-কোপানলে পতিত হইয়া, বেণের ন্যায় শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বেণ বিনাশের পর, আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ দেশ ও সমাজোন্নতির যে শুভচিহ্ন পরম্পরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, নহুষ নিধনের পর, সেরূপ কোনও ভবিষ্য মঙ্গল চিহ্ন প্রজাকুল সমক্ষে উপস্থিত হইল না। প্রত্যুত, ধর্ম্মব্যতিক্রমে ক্রমশঃ মানবের মানসিক অবনতি সাধিত হইতে লাগিল। ত্রেতাযুগের এই পতদ্দশায় নহুষতনয় যযাতি, যযাতিপুত্র যদু এবং তাঁহাদের সহভূপতিগণ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহারা সময়ের খরস্রোতোবেগ পরাহত করিতে সমর্থ হন নাই। আবর্ত্তপ্রভাবে, ভাসমান বস্তু যেমন ক্রমদ্রুততরবেগে ধাবিত হইয়া,

ঘূর্ণীজলনিমগ্ন হয়, নহুষ-রাজত্বকাল হইতে বিলয়াভিমুখী হইয়া, ত্রেতাযুগ সেইরূপ, ঝটিতি, খণ্ডপ্রলয়-কবলগত হইল। পরব্রহ্মেচ্ছায় যতকাল ধরাতলে ত্রেতাযুগের বিদ্যমানতা ছিল, পুরাণকারগণ পার্থিব গণনায় ১২৯৬০০০ বর্ষ তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন এবং ইহা সত্যযুগস্থিতি কালের ত্রিচতুর্থাংশ পরিমিত।

দ্বাপর যুগ এবং সমরধর্ম্ম।

খণ্ডপ্রলয় দুর্দ্দিন-মুক্ত জীবকুল বক্ষে ধারণ করিয়া, বিবিধায়ুধবপু বীরযুগ ধরণীপৃষ্ঠে পদার্পণ করিল এবং ঋষিগণ দ্বিযুগান্তর বিধিপ্রেরিত নবযুগের 'দ্বাপর' নামকরণ করিলেন। ভারতের অস্ত্র ঝন্ঝণায় জম্বুদ্বীপ শব্দায়িত এবং শূরদাপটে বসুন্ধরা কম্পিতা হইল। সর্ব্বত্র, বাহুশক্তিচালনায়, ভীষণ বলসংঘর্ষ হইতে লাগিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিল; মানবে মানবে বিক্রম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। বলগৌরবে দেশে বীরপূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইল। বিক্রম-শালী ব্যক্তিগণ, সর্ব্বত্র, সম্মানিত হইতে লাগিলেন। যুগপ্রভাবে ললনাগণও বীরত্বের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাজকুমারীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাজয়ী বীর-পুরুষকে পতিনির্ব্বাচনে দৃঢ়সঙ্কল্পা হওয়ায়, স্বয়ম্বরা প্রথার বহুল প্রসার হইল। মানবমন বাহ্যপদার্থে এতাদৃশ আসক্ত হওয়ায়, মানব জাতির মানসিক সমৃদ্ধি, সত্যযুগ তুলনায়, অর্দ্ধপরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্তা হইল এবং আয়ুঃ, ভোগ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মানব প্রকৃতিলক্ষণা, তত্তুলনায়, অর্দ্ধাংশমাত্র বিদ্যমান রহিল। এজন্য পুরাণ-কারগণ, যেমন একদিকে, এই বলদৃপ্ত যুগের 'বলরাম' আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন, অপরদিকে, তেমনি, দ্বাপরযুগে মানব-প্রকৃতি বা ধর্ম্মের অর্দ্ধবিদ্যমানতার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

বলরাম যুগে শারীরিক বিক্রমের এইরূপ গৌরব হইলেও, বলপ্রয়োগ বা অস্ত্রচালনা সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারিতা ছিল না। 'প্রকৃত দেহবল ও রণনৈপুণ্য পরীক্ষাজন্য প্রকৃষ্ট নিয়মাবলি সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মবিধিবৎ এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইত। মল্লক্রীড়া, আপ্তরণ, দ্বন্দ্বাহব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বল-চর্য্যায় বিহিত পদ্ধতির অণুমাত্র উপেক্ষা বা ব্যতিক্রম হইত না। হীনাস্ত্র বা স্থান-বৈষম্যে হীনাবস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করা নীতিবিরুদ্ধ পরিগণিত

হইত। কুট এবং গুপ্তাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকরণ ধর্ম্মনিবিদ্ধ ছিল। নকূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্। ন কর্ণিভির্ন্নাপিদিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিত তেজনৈঃ॥ ৯০॥ মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়। ব্যুহরচন ও অস্ত্রচালন নৈপুণ্যভিন্ন আর কোনও কুট বা কপট প্রক্রিয়া সমরবিদ্যার অঙ্গ পরিগণিত হইত না। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী-গণের সম্মুখ-যুদ্ধই ন্যায়ানুমোদিত প্রশস্ত যুদ্ধ পরিকীর্ত্তিত হইত। অজ্ঞাতসারে শত্রু আক্রমণ করা, গোপনে শিবিরে অগ্নিসংযোগে শত্রুনাশ করা, কৃত্রিমাবরণ-মণ্ডিত গহ্বরে পাতিত করিয়া শত্রু নিধন করা, খাদ্যাগমনিরোধে শত্রু বশীভূত করা প্রভৃতি যাবতীয় অবীরোচিত প্রতারণ-কৌশল ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাপুরুষত্ব বিবেচিত হইত। সংযুগে শারীরিক বিক্রম ও অস্ত্রচালন নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্যই আয়ুধের ব্যবহার হইত। উৎকৃষ্ট অস্ত্রযোগে দৈহিকবলের খর্ব্বতা বা সামরিক-বিদ্যার অল্পতা খণ্ডনপ্রয়াস অবগণিত হইত। বিনাবাহুবলে ত্বরিত শত্রুবধজন্য নিধন যন্ত্রস্বরূপ কেহ কোনও অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। শরীরের স্থান বিশেষে অস্ত্রবিশেষ প্রয়োগের বিধি নির্দ্ধারিত ছিল এবং তদুল্লঙ্ঘন পাপানুষ্ঠান বিবেচিত হইত। যুধ্যমান অরাতি, বিপাকবশে, হঠাৎ ভগ্নাস্ত্র বা নিরস্ত্র হইয়া পড়িলে, তাঁহার প্রতি অস্ত্রক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। রণাহত ব্যক্তি বিপক্ষকরগত হইলেও, পক্ষপাত-শূন্যভাবে, উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইতেন। জেতা, পরাজিত ও বশীকৃত অরিকে অবধীরণ করিতেন না; প্রত্যুত, শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার প্রতি মিত্রের ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন। যুদ্ধ দর্শনার্থ রণস্থলে সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রতি হিংসাচরণ নিবারণে সতর্কতা অবলম্বিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষেড়া ও উপদ্রব ব্যতীত সমর সময়ে পুর বা জনপদবাসী জনগণের শান্তিবিঘ্নজনক কোনও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এবম্ভূত বিশুদ্ধনীতি মালায় সমরধর্ম্মের কলেবর গঠিত হইয়া দ্বাপর যুগারম্ভে ভারতবর্ষে তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নিষ্পাদিতা হইয়াছিল। সুতরাং, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার হেতু শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধ আদৌ ধর্ম্মবহির্ভূত গর্হিত কার্য্য বিবেচিত হইতে পারে না। অপিচ, ইন্দ্রজিতের মেঘান্তরালে অবস্থিতি পূর্ব্বক যুদ্ধ করার আখ্যানে, ত্রেতাযুগে ভারতবর্ষে কুটযুদ্ধনীতির অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন। মহামুনি বাল্মীকি, ত্রেতাযুগসাময়িক আর্য্যসভ্যতাবর্জ্জিত লঙ্কাবাসী নরগণকে রাক্ষস এবং মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ, ঐ সময়ে লঙ্কাবাসী অনার্য্যগণ শঠতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি নিচয় অন্তঃকরণে পোষণ করিয়া, হিংস্রপশু-জীবন যাপন করিত। লঙ্কাধিপ দশানন রাজনীতিবিশারদ হইলেও, তাঁহার

অনার্য্যজনোচিত মলিন হৃদয় ছিল। মেঘনাদ কপটতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জাতীয় কদাচার ও নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে আর্য্যগণ ঈদৃশ রাক্ষসাচার হেয়জ্ঞান করিতেন। সুতরাং ঐ সময়ে ভারতবর্ষে তাহার বিদ্যমানতা অসম্ভব। প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, রাক্ষসগণ বিবিধ চাতুর্য্য অবলম্বন করিলেও, রাম এবং লক্ষ্মণ আদর্শবীরোচিত সাহস ও বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, লঙ্কায় আর্য্যমাহাত্ম্য ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। পরন্তু, ওষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণের শক্তিশেল বিষাপনয়নে, লঙ্কাদ্বীপে আর্য্যসভ্যতাছটা বিকীর্ণ হইয়াছিল।

ত্রেতাযুগে রাজধর্ম্মোদয়ে সত্যযুগ-প্রতিষ্ঠিত সমাজধর্ম্ম যাদৃশ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, দ্বাপরযুগে সমরধর্ম্মাবির্ভাবে ত্রেতাযুগ-প্রতিষ্ঠিত রাজধর্ম্ম সেইরূপ মলিন হইয়া গেল। অপিচ, সমাজধর্ম্মের বল ত্রেতাযুগাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ভারত নরপতিগণ দ্বাপরযুগে সমরধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা, রাষ্ট্রসংরক্ষণ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতিকার্য্যে এরূপ ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন যে, রাজধর্ম্মের মূলসূত্র প্রজাতোষণ বিষয়ে তাদৃশ মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। রাজাগণ স্ব স্ব রাজ্যে সময়োপযোগী বিচক্ষণ ব্যবস্থা-সচিব নিয়োগ করিলেন। রাষ্ট্রদুর্গ সকল সুদৃঢ়ীকৃত হইল। বেতনভোগী সশস্ত্র সেনানিয়োগে প্রত্যেক রাজ্যে চমূকলেবর পরিপুষ্ট হইল। এই সকল রাজ্যাঙ্গীন ব্যয়সংকুলনার্থ, রাজকোষ-প্রতুলতা প্রতি ভূপালবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্টা হইল। মানবীয় আচার ব্যবহারের জটিলত্ব নিবন্ধন, কঠোর শাসন প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। ত্রেতাযুগের ব্যবহারবিধি সম্পূর্ণ পরিগৃহীত হওয়া ব্যতীত, তদ্বর্দ্ধন ও অভিনব বিরচনে অনেক শাসন বিধান নির্ম্মিত হইল। কার্য্যাধিক্য হেতু ত্রেতাপেক্ষা দ্বাপরযুগে ভারতবর্ষে বিচারালয় ও প্রাড়্বিবাক রাজকর্ম্মচারী সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইল। ত্রেতাযুগের শেষার্দ্ধে, ভিন্নরাজ-সভায় সংবাদাদানপ্রদান জন্য যে রাজদূতনিয়োগ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, দ্বাপরযুগে তাহা সংরক্ষিত হইল; অধিকন্তু পররাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবগতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্যে ভৃতিভুক্ গুপ্তচর নিযুক্ত হইল।

ত্রেতাযুগে সামাজিক সমন্বয় সংস্থাপনে মানবের যে বর্ণবিভাগ নিষ্পাদিত হইয়াছিল, সমর ধর্ম্মপ্রভাবে দ্বাপর যুগে তাহা নানা উপবিভাগে বিভক্ত হইল; অপরন্তু, সাধারণতঃ ত্রেতানিষ্পন্ন কর্ম্ম বিভাগ সমাদৃত হইলেও, সমর-বিদ্যানুরাগ-প্রাবল্যে দ্বাপরসমাজে স্থল বিশেষে বর্ণগত কর্ম্মবৈষম্য সংঘটিত হইয়াছিল। ত্রেতাযুগে যেমন মহাভাগ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করি-

য়াও, প্রবল তপশ্চর্য্যা দ্বারা মহর্ষি-জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দ্বাপরাখ্য বলরাম-যুগে সেইরূপ অনেক ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রকুল-সম্ভূত পরাক্রমশীল মানব, ক্ষাত্র-জনোচিত রণবিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা বীর-গৌরবে ভূষিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, একদিকে দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি সাংযুগীন অধ্যাপকগণ যেমন অস্ত্রশিক্ষা দান ও সংগ্রামে বীরত্ব প্রদর্শন দ্বারা বিমল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সূতপুত্র মহোজস্বী কর্ণ, তেমনি, যুযুধান, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি খ্যাতনামা ক্ষাত্র বীরগণ সহ সমাসনে সুশোভিত হইয়াছিলেন। আবার, যুদ্ধবিদ্যা-লিপ্সায় বৈশ্যগণের স্ববৃত্তিনিরতি শ্লথ হইলে, অনেক উপবর্ণ বাণিজ্য ব্যবসায় আশ্রয় করিলেন। ত্রেতাযুগ অপেক্ষা দ্বাপরযুগে সঙ্করবর্ণের অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সঙ্করবর্ণ-নিচয় ত্রেতাযুগে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়া, উচ্চবৃত্ত্যভিলাষী হন নাই; কিন্তু দ্বাপরে সঙ্করগণ সুযোগ বুঝিয়া, সামাজিক উন্নত কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারস্থাপনপ্রয়াসী হইলেন। ফলতঃ, বৃহৎ ব্যবসায় বৈশ্যগণের আয়ত্তাধীন থাকিলেও,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় সঙ্করবর্গের করগত হইল। ত্রৈতেয় মানবাপেক্ষা দ্বাপরিক নর সমধিক সমারোহপ্রিয় হওয়ায়, বিলাস সম্ভোগহেতু, দ্বাপরযুগে ভারত-সমাজে এবম্বিধ দ্রব্যসম্ভারের ব্যবহার-প্রয়োজন সমুত্থিত হইল, যাহা দেশ মধ্যে সংগৃহীত হইতে পারিত না। এজন্য দ্বাপরযুগে বহির্ব্বাণিজ্যের আবির্ভাব ও প্রসার হইল। স্ববৃত্তিপর সমৃদ্ধিশালী বৈশ্যগণ অর্ণবযান সংযাত্রায় দ্বীপান্তর সহ বাণিজ্য করিয়া, স্বদেশীয় দ্রব্য বিনিময়ে বহুবিধ বৈদেশিক বস্তু সংগ্রহ করিতেন। স্থল পথেও বহুবিধ বিদেশজাত দ্রব্য ভারতবর্ষে আনীত হইত। স্বল্পঋদ্ধ বৈশ্য ও সঙ্করগণ বিপণি সংস্থাপনে স্বদেশজাত এবং বিদেশাগত পণ্যদ্রব্য ব্যবসায়ে অন্তর্ব্বাণিজ্যস্রোত প্রবহমান রাখিতেন। এইরূপে, মানবের বর্ণকর্ম্ম, বিপর্য্যয় স্বত্বেও, বস্তুর আগম নিগমে, দ্বাপরযুগে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

যুগধর্ম্ম লক্ষণানুসারে দ্বাপরে, স্বভাবতঃ ক্ষত্রিয়গণের সমধিক সামাজিক প্রতিপত্তি হইল। ইঁহাদের মধ্যেও আবার শস্ত্রব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়গণ ব্যবহার বা লিপিজীবী ক্ষত্রিয়গণাপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইতেন। দ্বাপরযুগে বিধিদর্শী অক্ষরচণ উচ্চপদস্থ ক্ষত্রিয় রাজ-কর্ম্মচারীগণও, ত্রেতাযুগের রাজসদস্যগণের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন না। অল্প বিদ্যাবান ক্ষত্রিয়গণ লেখক স্বরূপ বণিকগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়া, ততোধিক শ্লাঘাহীন হইলেন। জাতীয় প্রতিভাবলে ক্ষত্রিয়গণ, প্রায়শঃ, যুগাদৃত যুদ্ধবিদ্যা-পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন, যে অল্প সংখ্যক ক্ষত্রিয় শস্ত্র ধারণে অপারক হইয়াছিলেন, তাঁহারা শাস্তবিদ্যাচর্চ্চাদ্বারা, উপরোক্তরূপে, জীবিকার্জ্জন করিতেন। যুদ্ধেতর ব্যবহারিক বিস্তার অগৌরবে, সংখ্যাবলশূন্য এই সকল ক্ষত্রিয়গণ দ্বাপর-সমাজে যশস্বী হইতে পারেন নাই। ক্রমশঃ, ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ সমররঙ্গ যত প্রবল হইতে লাগিল, এই সমস্ত নিরীহ ক্ষত্রিয়গণের জাতীয় মর্য্যাদা ততই খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল। ইঁহারা ক্ষাত্রধর্ম্ম বর্জ্জিত কাপুরুষ স্বরূপ পরিগণিত হইতেন এবং শস্ত্রনিপুণ ক্ষত্রিয়গণ ইঁহাদের সাগোত্র্য স্বীকারে লজ্জা বোধ করিতেন। ক্ষত্রিয়শ্রেণীবিচ্যুত হইয়া, তন্নিম্নবর্ণে রূপান্তরিত হওয়ায় ইঁহাদের সামাজিক অধোগতি পর্য্যবসিত হইল। অথচ, ইঁহারা পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত কোনও নিম্নতর বর্ণভুক্ত বা নূতন বর্ণ স্বরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন না। এইরূপে, যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ত্রেতাযুগে রাজধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, বিভীষণ সমরাকুলিত বলরাম যুগে যাঁহারা রাষ্ট্ররক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ অমিশ্রিত হিন্দুরাজত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রাজনীতি চর্চ্চা ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রক্ষণ দ্বারা ভারতীয় রাজকার্য্যে সমধিক সহায়তা করিয়াছেন, কালচক্রে, তাঁহারা দ্বাপরযুগে ঈদৃশ সামাজিক কালিমাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহা কালস্রোতে বিধৌত বা অপনীত হয় নাই।

ব্রাহ্মণবৃত্তি অপর বর্ণের অননুকৃতা হইলেও, সমাজ-বিপ্লবে দ্বাপরব্রাহ্মণগণ কিয়ৎ পরিমাণে জাতীয় সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ জীবমঙ্গল-সাধনক্ষম ছিলেন, এই বিশ্বাসে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মঙ্গলানুষ্ঠানে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের উপদেশানুসারে হোম যজ্ঞাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। দ্বাপরযুগে, একদিকে যেমন যাগাদি অনুষ্ঠানে দ্বিজাতীয়গণের তৃষ্ণামান্দ্য হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি সঙ্কর ও শূদ্রগণ দ্বিজোচিত আচার অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভকামী হইয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্কট সময়ে, সাংসারিক ব্রাহ্মণগণ উপজীবিকা সংস্থান কল্পে, পৌরোহিত ক্রিয়া যাজন ব্যবসায়ে পরিণত করিলেন এবং এই বিচিত্র ব্যবসায়ে তাঁহাদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। দ্বাপরযুগে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব যজমান আহরণে সচেষ্ট হইলেন। ধর্ম্মাচারনিষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ সকল দ্বিজাতীয়গণ কর্ত্তৃক পৌরোহিত্যে বৃত হইলে, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা যুগাদৃত কোনও উপজীব্যাশ্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা, অগত্যা, শূদ্র ও সঙ্করগণের যাজনক্রিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সকল সঙ্কর ও শূদ্রযাজ্ঞিকগণ

বর্ণব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং সমাজে অবজ্ঞাত হইলেন। সঙ্কর ও শূদ্রগণের শ্রেণী বিভাগের সহিত বর্ণব্রাহ্মণগণেরও বহু শ্রেণীবিভাগ নিষ্পাদন হইয়াছিল। অথবা, শূদ্র ও সঙ্করগণ মধ্যে যে সকল শ্রেণী এই সময়ে দ্বিজাচারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাপরযুগে সর্ব্বোচ্চ জাতির অবনতি এবং সর্ব্ব নিম্ন জাতির উন্নতি দ্বারা ভারতবর্ষে সামাজিক সমবায় নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

বলবিরোধ-চঞ্চল দ্বাপরযুগে মানবমন মাৎসর্য্য ভারাক্রান্ত হওয়ায়, ভারতবর্ষে জনসাধারণ মধ্যে পরস্পরানুরক্তি মলীমস হইলেও, কুত্রাপি কৌটুম্বিক স্নেহ-বন্ধন শিথিল হয় নাই। আত্মীয়-পরভেদে যত্নতারতম্যে দ্বাপর মানবের মানসিক সঙ্কীর্ণতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। সাম্পর্কিক ব্যক্তিগণ মধ্যে সৌহার্দ্দের অভাব ছিল না। একক পরিবার মধ্যে পিতৃমাতৃশ্রদ্ধা, সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃভগিনী স্নেহ ত্রেতাযুগের ন্যায় সরস ছিল এবং সম্বন্ধ-গ্রথিত পরিবারবর্গ পরস্পরে অকৃত্রিম সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন। সত্যের আদর যেমন অর্দ্ধপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল, লৌকিক ব্যবহারে তেমনি অর্দ্ধপরিমাণে কাপট্য প্রবেশ করিয়াছিল। সামাজিকতা, ব্যবসায়, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে ত্রেতাযুগের ন্যায় বিশুদ্ধি ছিল না। মানবগণের বাহ্যসমারোহ দ্বারা সুনামার্জ্জন-স্পৃহা বলবতী হওয়ায়, দ্বাপরিক আড়ম্বরমালা ত্রেতাযুগের সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর সারহীনা ও চাকচিক্যময়ী হইয়াছিল। চিত্তমালিন্যহেতু, মনুষ্যকর্ত্তৃক দ্বাপরে ঈশ্বরপূজার বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বিত হইল এবং উপচার বাহুল্যে পূজনোপচয় বিচারিত হইত। বণিকগণ পণ্যদ্রব্যের গুণ ব্যাখ্যান ও বিপণি সজ্জায় আমোদ উপভোগ করিতেন। সাধারণ জনগণ কার্য্যদ্বারা পরস্পরের উপকার করা অপেক্ষা বচনে শিষ্টাচার প্রদর্শন প্রথার অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অশন, বসন, ও ভূষণে নানাবিধ অনাবশ্যকীয় পরিপাটী প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, ত্রেতাপেক্ষা দ্বাপরযুগে সামাজিকধারা ভূয়সী জটিলা নিষ্পাদিতা হইল। যে সকল খাদ্যে নয়ন, নাসিকা ও রসনা, এই ত্রি-ইন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টি সমাহিত হইত, তাহাই উপাদেয় উপাধি প্রাপ্ত হইত। পাকবিদ্যাভিমানিনী রমণীগণ বিবিধ উপকরণ যোগে স্বাদু, সুঘ্রাণ এবং নয়নমোদন মিষ্টৌদন ও অন্যান্য ভোজ্যপেয় প্রস্তুত করিয়া, সমাজে শ্লাঘাবতী হইতেন। এতদ্ব্যতীত মিষ্টান্নব্যবসায়ীগণ নানাবিধ সুদৃশ্যখাদ্যদ্রব্যে পণ্যবীথী সজ্জিত করিয়া জনগণের লালসা সমুৎপাদন করিতেন। কার্পাস, পট্টাদিবৃক্ষত্বক্, পশুলোম ও কীটগুটিকা সমুত্থিত ঊর্ণাজাত বস্ত্রে বিলাসিতা

পরিণদ্ধা না হওয়ায়, রজতকাঞ্চনাদি ধাতব তন্তুমণ্ডিত গাত্রবাস্ সাদরে ব্যবহৃত হইত। অলঙ্কার ধারণে, ত্রেতাযুগাপেক্ষা দ্বাপরে পুরুষ ও অঙ্গনাগণ অধিকতর গরিমা প্রদর্শন করিতেন এবং সূক্ষ্মকারুকার্য্য-খচিত আভরণ-সম্ভার বাল, কিশোর, যুবক, বালিকা ও সধবা ললনাগণের অঙ্গরাগবর্দ্ধন করিত। সুরভি-লেপন স্বরূপ সুগন্ধি দারুনির্য্যাস এবং ওষধিরস বহুল ব্যবহৃত হইত। মানবগণ কোমল শয্যায় শয়ন এবং কোমলাসনে উপবেশন-জনিত সুখলিপ্সু হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে বাহ্যসমারোহ স্বত্বেও মানবমনে বিকার উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু দ্বাপরে বিলাস স্রোত এতাবান্ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, এই বলদৃপ্ত যুগেও, ইন্দ্রিয়জ স্থূলানন্দ উপভোগ জন্য মনুষ্যের মন বহির্মুখ ও জড় পদার্থে ব্যাপৃত হইয়াছিল। অথবা, দেবপ্রদত্ত সরলসভ্যতা দ্বাপরযুগে অর্দ্ধবিস্মৃতিগ্রস্তা হওয়ায়, লোকযাত্রা এইরূপ স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছিল।

ত্রেতাযুগে অলঙ্কার নির্ম্মাণ বিষয়ে, ধাতুমধ্যে কেবলমাত্র স্বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং সুবর্ণে রাজমুদ্রা বিনির্ম্মিতা হইত। দ্বাপরে মানবগণ অধিকতর বিলাসী হওয়ায়, এই দুই দ্রব্যের আদর নিতরাং পরিবর্দ্ধিত হইল এবং সমাজের অলঙ্কারমুদ্রাতৃষ্ণায় স্বর্ণাভরণমুদ্রা অপর্য্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায়, তন্নিম্নতর ধাতু রৌপ্যও উভয়ের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। দ্বাপরযুগে ভারতবর্ষে বেশভূষায় যেমন রজত কাঞ্চনের অতিশয় ব্যবহার হইত, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে রাজমুদ্রা নির্ম্মাণে এই দুই প্রধান ধাতুর ভূরিব্যয় নিষ্পন্ন হইত। রৌপ্যের এবং, ততোধিক, স্বর্ণের মহার্ঘতা নিবন্ধন, রাজা এবং বিশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত, অপর সকলেই তাম্রপাত্র ব্যবহার করিতেন। সুতরাং, সাধারণতঃ, দ্বাপরে ঔডুম্বরাধার ব্যবহার্য্য হইল। ফলতঃ, রন্ধন, ভোজন, পান, দ্রব্যরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে, সর্ব্বাপেক্ষা উডুম্বর পাত্রের সমধিক ব্যবহারে, দ্বাপরিক বিরাটাড়ম্বরক্রিয়ানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইত। ত্রেতাযুগ অপেক্ষাও দ্বাপরে লৌহের ব্যবহার অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কেননা, আহব এবং আখেটক এতদুভয় শস্ত্রসাধ্য বিষয়েই, ত্রেতাযুগ দ্বাপর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অতিক্রান্ত হইয়াছিল। পৌরাণিকগণ, কাল-পর্য্যায়ে আনুক্রমিক হীনতর ধাতু-পাত্র ব্যবহার ও হিংসালুঅয়স্চর্য্যাতিশয্যজ যুগ-বৈশিষ্ট্যমানদণ্ডে মানবমনশ্চাটুল্য তৌল করিয়া, সভ্যতার ক্রমবিকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুগাবর্ত্তনে মানবমন যত ক্লেদযুক্ত হইয়াছে, সাধারণ ব্যবহারে তত অধিকতর সমল পদার্থ প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে এবং, মোহবশতঃ, মানবজাতি তুচ্ছ পদার্থ

ব্যবহারাধিক্যে ক্রমশঃ সভ্যতার প্রসার কল্পনা করিয়া আসিতেছে। অসূয়া, ঈর্ষা, লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষ বশে, নরকুল যুগচক্রে লৌহদ্বারা নব নব ব্যাপাদনাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া হননকুশলতার উপায়োদ্ভাবন-জনিত গর্ব্বানুভব করিয়া আসিতেছে। ভোজন ও পানপাত্র ব্যতীত, বিলাসিতা পরিতৃপ্তি হেতু, ত্রেতাপেক্ষা দ্বাপরযুগে অনেক অকিঞ্চিৎকর গৃহ সামগ্রীর ব্যবহার হইত।

দেশব্যাপিনী রণবিদ্যালোচনায় দ্বাপরে সমরধর্ম্মলক্ষণা পরিব্যঞ্জিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যে সাংযুগীন অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইলেন এবং রাজা, রাজকুমার ও ক্ষত্রিয়গণ ইঁহাদের নিকট নিয়মিতরূপে যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করিতেন। পরন্তু, যুগধর্ম্মপ্রভাবে, অপরাপর বর্ণভুক্ত ওজস্বীব্যক্তিগণ বীরবৃত্তি উড্ডামর বিবেচনা করিয়া, তদনুধাবনজন্য, সমরাচার্য্যগণের অনুগ্রহ ভিক্ষার্থী হইতেন এবং এই সকল উদাত্ত অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগকে রণবিদ্যা শিক্ষাপ্রদানে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন না। শিষ্যগণ শিক্ষকগণের নিকট গদা, ভল্ল, কন্দুক, করবালাদি অস্ত্রচালন, গাণ্ডীব যোগে ইষুক্ষেপ, আত্মত্রাণোপায়, ব্যূহরচন-কৌশল, সৈন্য-সমাবেশ-পদ্ধতি, অভিযান ও প্রত্যাবর্ত্তনরীতি প্রভৃতি বিক্রম ও নৈপুণ্যসাধ্য অঙ্গভূত সাগরিকবিদ্যাভ্যাস করিতেন। যাবতীয় অস্ত্রচর্য্যামধ্যে ধনুর্ব্বিদ্যা, সুকৌশল-সম্পন্নতা হেতু, গরীয়সী মন্যমানা ও সমাদৃতা হইত। ফলতঃ, শরদ্বারা দূরবর্ত্তী লক্ষ্যবেধ, যে কোনও করাঙ্গুলি সাহায্যে মুহুর্মুহুঃ বাণ নিক্ষেপ, একবারে বিভিন্নদিকে বহু তীর চালন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বাপরিক কার্ম্মুকীগণ যেরূপ হস্তসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেন, জগতে অন্য কোনও সময়ে তাহার তুলনা সংঘটিত হয় নাই।

দ্বাপর যুগে যে সকল মেধাবান ও উদ্যমশীল গুরুশিষ্য দ্বারা সামরিক বিদ্যা-লয় রাজি সমলঙ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রাজ্ঞ মতিমান্ দ্রোণ অধ্যাপকত্বে এবং মহাসত্ত্ব অর্জ্জুন শিষ্যত্বে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রবীণ সমরাচার্য্য দ্রোণ মহাশয় যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ও যত্ন সহকারে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন, প্রতিভাশালী পার্থ সেইরূপ একাগ্রচিত্তে গুরূপদেশ অভিহরণ ও আয়ত্তীকৃত করিতেন। বিশেষতঃ, ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুন এরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, বীরকুল তাঁহাকে সব্যসাচী উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। পবিত্র দ্রোণ-জীবন স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আচার্য্য হইবার পূর্ব্বে, যদিও দ্রোণের সাংসারিক অবস্থা শোচনীয় ছিল, তথাপি, তিনি সামান্য কোনও বিষ-য়ের জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইতেন না। এই চরিত্র-মাহাত্ম্য হেতু, একটী সাধারণ গার্হস্থ্য ঘটনায়, দ্রোণ বীরব্রত উপজীব্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। একদা দ্রোণ-

পুত্র বালক অশ্বত্থামা, প্রতিবাসী কোনও বালককে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া, গৃহে আসিয়া পিতামাতার নিকট দুগ্ধপানেচ্ছা জ্ঞাপন এবং তজ্জন্য উপদ্রব আরম্ভ করিল। তনয়গত-প্রাণা দ্রোণভার্য্যা কৃপী কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য, ভর্ত্তাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কৃপী ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর পক্ষে কিঞ্চিৎ গব্যদুগ্ধ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য; কেননা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব দ্রোণ কাহারও নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করিলে, অনতিবিলম্বে তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। যাহা হউক, দ্রোণের দৃঢ় চিত্ত পুত্রবাৎসল্যে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি তনয়ের জন্য অপরের নিকট দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে যাইতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইলেন। বালকের দৌরাত্ম্য নিবারণ কল্পে, দ্রোণ এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিলেন; সলিলের সহিত তণ্ডুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, পুত্রকে তাহা পান করিতে দিলেন। বালক অশ্বত্থামা শ্বেতবর্ণ পটবাসোদক পান করিয়া, 'দুগ্ধ পান করিলাম' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পল্লীস্থ কতিপয় দুষ্ট বালক এই কৌতুকাবহ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া, প্রথমতঃ পরিহাস এবং পরে দারিদ্র্য হেতু দ্রোণের অবজ্ঞান করিল। বালকগণের মুখে এইরূপ দারিদ্র্যনিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া, স্বস্থদ্রোণ যুগাদৃত বিদ্যাসেবায় স্বীয় সাংসারিক অবস্থোন্নতি সাধন সংকল্প করিলেন এবং নানা স্থানে বিবিধ অস্ত্রচর্য্যা ও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়া, রণবিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন। প্রভবিষ্ণু দ্রোণ অনেক রাজ্যে সমরাচার্য্যের কার্য্য করিয়া, অবশেষে কৌরব রাজ্যের সমরাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুনন্দনগণকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দ্রোণ যদিও এইরূপে অধ্যাপক-জীবনের শেষভাগে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমরগুরু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তথাপি, বিরাট কুরুক্ষেত্র সমরের খ্যাতনামা মহারথ সেনাপতিগণের অধিকাংশই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। যিনি বাল্যে দুগ্ধ বিশ্বাসে পিষ্ট তণ্ডুলবারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অশ্বত্থামা পিতৃ শিক্ষাবলে যৌবনে এরূপ শূর ও সুদক্ষ যোদ্ধা হইয়াছিলেন যে, সুঘোষিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে একটী অত্যাবশ্যকীয় বীরাভিনয় ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইয়াছিল এবং দ্রোণনন্দন প্রভূত বিক্রম ও অদম্য উৎসাহে তদভিনয় সম্পন্ন করিয়া, বিশ্বজনগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

দ্বাপরিক উর্জ্জস্বল বীরকুল মধ্যে, আদর্শ-চরিত্রবান শান্তনব সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। শৈলশ্রেণী মধ্যে হিমাচল এবং তরুকুল মধ্যে অভ্রঙ্কষ সর্জ্জবৃক্ষের ন্যায় উদারধী ভীষ্ম বীরসংহতি মধ্যে প্রতিভাত ও উদাহৃত হইতেন। সৌরচক্রে

মরীচিমালী যেরূপ শোভাপ্রাপ্ত হন, বীরকুল চক্রবর্ত্তী ভীষ্ম দ্বাপরিক সমর ধর্ম্ম-মণ্ডলে সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইতেন। সুবাস কুসুম সৌরভে যেরূপ পূতিগন্ধ বিলুপ্ত হয়, পবিত্র ভীষ্মচরিত-প্রভাবে সেইরূপ দ্বাপরের গ্লানি ও কলুষ কলাপ বিশোষিত হইয়াছিল। মহান্ ভীষ্মাখ্যানে অন্তঃকরণ এরূপ পুলকিত হয় যে, সাধারণ মানবস্বভাব-মালিন্য ও সামাজিক বৈকৃতজনিত দ্বাপরিক আবিলতা সম্ভার আদৌ মানস-পটে উদিত হয় না। এই দেবপ্রকৃতিদ্যুতি ধারণে অমর মহাভারত গ্রন্থ আলোকিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। ফলতঃ ভীষ্মের ন্যায় উন্নতচেতা মহাবীর ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি আবির্ভূত হন নাই। জীবনের প্রথম সময় হইতেই, ভীষ্মচরিত্রে অলোকসামান্য ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, দাক্ষিণ্য ও গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মহারাজ শান্তনু সুন্দরী সত্যবতীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে,সত্যবতীর পিতা দাশরাজ তাঁহাকে এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেনঃ 'সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র হস্তিনা রাজ্য প্রাপ্ত হইবে' হস্তিনেশ্বর শান্তনু এই অঙ্গীকার করিলে, দাশরাজ তাঁহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবেন। অমিতবিক্রম লোকবিশ্রুত তনয় ভীষ্মের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া, সত্যবতী লাভবাসনা চরিতার্থ করা, ন্যায়বান শান্তনুর প্রবৃত্তি-সম্মত হয় নাই এবং তিনি ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত ভীষ্ম এই বিষয় অবগত হইবামাত্র, স্বয়ং দাশরাজ সমীপে গিয়া, 'রাজ্যগ্রহণ করিবেন না' প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাশরাজ ইহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া, ভীষ্মের নিকট আর একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। দৃঢ়চেতা ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইবেন,সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভবিষ্যতে ভীষ্মের পুত্র স্বাধিকার প্রভাবে হস্তিনা-রাজ্য গ্রহণেচ্ছু হইলে, সত্যবতী গর্ভজাত সন্তানের রাজ্যপ্রাপ্তি ও রাজ্য ভোগ দুর্ঘট ও সঙ্কটময় হইবে, দাশরাজ এইরূপ ইঙ্গিত প্রদর্শন করিলেন। জীতেন্দ্রিয় ভীষ্ম তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া,পুনরায় তাঁহার নিকট 'দারপরিগ্রহ করিবেন না' এই দ্বিতীয় শপথ করিলেন। দাশরাজ ভীষ্মবচনে পরমাপ্যায়িত হইলেন এবং তাঁহার সত্যঙ্কার বিষয় শান্তনুর গোচরে আনয়ন না করিয়া, আশ্বস্তচিত্তে স্বীয় দুহিতাকে হস্তিনা-রাজ-হস্তে সমর্পণ করিলেন। সত্যাবতার ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয় করিয়া, বীরব্রতোদ্যাপন করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক বিমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ভীষ্ম অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। চিত্রাঙ্গদ অল্পবয়সে প্রাণত্যাগ করেন এবং মহারাজ শান্তনুর দেহাবসানে, বালক বিচিত্রবীর্য্য বিশাল হস্তিনারাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। সত্যবতীর অনুরোধে,

বিচিত্রবীর্য্যের সাংসারিক অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্য্যন্ত, ভীষ্মদেব তাঁহার রাজ কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মহানুভব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভীষ্ম নিস্পৃহ ও অনাসক্ত ভাবে সংসারে অবস্থিতি পূর্ব্বক, ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত লৌকিক কর্ম্মপরম্পরা নির্ব্বাহ করিতেন। বিচিত্রবীর্য্যতনয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুরনন্দনগণকে, ভীষ্ম যত্ন সহকারে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন এবং সম্পর্কগণনায় সকলকেই সমভাবে স্নেহ করিতেন। তথাপি, কৌরব ও পাণ্ডবগণের চরিত্রগত দোষগুণ এই নিরপেক্ষ সুবিজ্ঞ সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসীমা-বহির্ভূত হইতে পারিত না। সভামধ্যে নির্ভীক সরল-হৃদয় ভীষ্ম যেমন প্রফুল্ল বদনে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরায়ণতা, ভীমের বিক্রম, এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীববিদ্যা-পারদর্শিতার প্রশংসা করিতেন, তেমনি ভ্রূকুটীভঙ্গে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কৌটিল্য ও পাণ্ডবনির্য্যাতনদুরভিসন্ধির অপবাদ ঘোষণা করিতেন। দুর্য্যোধনের নির্ব্বিন্ধাতিশয়ে প্রবীণ ভীষ্ম পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভায় যোগদান করিয়া, তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং পণজয়ে দ্রৌপদী লাভ করিতে পারিলে, কৃষ্ণাকুমারীকে দুর্য্যোধন-বধূ করিবার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া, লক্ষ্যবেধ-কল্পে শরাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্যবেধে অকৃতকার্য্য হীনমতি দুর্য্যোধনকে জামাতৃ পদে বরণ করা দ্রুপদ রাজের রুচিগত হয় নাই। পরন্তু, অব্যর্থসন্ধান ভীষ্মের শরব্যুৎপত্তি তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঈদৃশ সঙ্কটে, প্রত্যুৎপন্নমতি পঞ্চাল-রাজ সত্যপরায়ণ ভীষ্মের কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার জন্য, স্বীয় নপুংসক পুত্র শিখণ্ডিকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কারণ, শাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্ম অমঙ্গল দর্শন করিলে, কোনও বীরানুষ্ঠান সাধন করিতেন না, এবং তাঁহার এ চরিত্ররীতি সর্ব্বদেশবিশ্রুত হইয়াছিল। ধীর ভীষ্ম শিখণ্ডির মুখ সন্দর্শন করিবামাত্র গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন ছদ্মবেশী অর্জ্জুন সংশয়াতীত রূপে লক্ষ্যভেদ করিয়া, দ্রুপদ-দুহিতাকে লাভ করিয়াছিলেন, সভাস্থ অন্যান্য সকলে তাঁহার স্বরূপাবধারণে অকৃতকার্য্য হইলেও, ভীষ্মদেব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস সমাধানান্তর তাঁহাদের স্বাধিকারগতরাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য, মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধঘটন নিবারণ কল্পে, কুরুকুল-ধুরন্ধর ভীষ্ম অনেক চেষ্টা ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, পরিশেষে এই কুলধ্বংসকারী প্রলয়োপম সমরে ঝটিতি দেহোৎসর্গ করণ মানসে, বীরপ্রবর ভীষ্ম দুর্য্যোধন পক্ষ আশ্রয় করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ

দিবস বীরাহুতি গ্রহণ করিয়া যে সমরানলের তৃষ্ণা প্রশমিতা হইয়াছিল, কুরুভূমে যে দিন তাহার লোলশিখা সর্ব্বাপেক্ষা প্রদীপ্তা হইয়া উঠিয়াছিল, বীরগর্জ্জন ও অস্ত্রনির্ঘোষমিশ্রিত ভীমনিনাদে দিগ্‌দিগন্ত মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং রণপ্রভঞ্জনে সমরনীতিপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেইদিন রুদ্রোপম ভীষ্ম উদাসীন ভাবে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রগগণ এক বিসদৃশ তিমিরিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং যিনি অক্ষত শরীরে সহস্র সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরকেশরী বাস্তব যুদ্ধ করিবার জন্যই আহবে উপস্থিত হইয়াছেন, এই মনে করিয়া, পাণ্ডবচমূ ভীষ্মের প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে আপাদমস্তক বাণবিদ্ধ হইয়া, শুক্লকেশ ভীষ্ম শর-শয্যায় শায়িত হইলেন। এই রূপে বীরবৃন্দিষ্ঠ, কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিখ্যাত পিতামহ ক্ষাত্র ধর্ম্মানুযায়ী স্থূলদেহ বিসর্জ্জন করিয়া, অক্ষয়ধামে গমন করিয়াছিলেন।

দ্বাপরে সাধারণ মানবমন বিস্মৃত জড়িত হইয়া এতদূর মেধাহীন হইয়াছিল যে, শ্রুতি ও স্মৃতি নিয়মে মানব-শিক্ষাবিধান-সৌকর্য্য ক্রমশঃ মন্দতর হইয়া অবশেষে এককালীন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ত্রেতাযুগাপেক্ষা দ্বাপরে মানবের ধারণা ও স্মরণ শক্তির বহুল খর্ব্বতা নিবন্ধন, ঋষিগণ প্রজাপতি দশকের জ্ঞানোপদেশ রাশি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিলেন। কেননা, তত্ত্বদর্শী পুণ্যাত্মা ঋষিগণ ক্রমাধিক তিমিরাভ্রিয়মান সংসারের কল্যাণ বিধান কল্পে, ইহাই সমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন। যুগে যুগে ঋষিগণ অক্ষয় জ্ঞানের আধার স্বরূপ থাকিয়া, তাহার রশ্মি বিস্তারে সাংসারিক জনগণের চিত্ত পবিত্রীকৃত করিয়া আসিতেছিলেন; এক্ষণে অধিকতর ব্যাপ্ত ভাবে জ্ঞানপ্রভা মানবকুলের হৃদ্‌গ্রাহ্য করিবার জন্য, তাঁহারা তাহা গ্রন্থরূপ দ্বিতীয় আধারে সংন্যস্ত করিলেন এবং অধ্যাপনা সাহায্যে অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানশিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। সূর্য্য ও চন্দ্রের অভাবে, তারকামালার ক্ষীণালোকে পথিকগণ যেরূপ গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, ঋষিগণের অভাবে, তাঁহাদের প্রণীত এই সকল পবিত্র গ্রন্থদ্বারা, মুমুক্ষু মানবগণ, সেইরূপ, নৈশান্ধকারাবৃত সংসারে মঙ্গলোপায় অবধারণ করিতে পারেন। ফলতঃ ঈশ্বর-প্রেরিত জ্ঞানালোক, ঋষিগণসঙ্কলিত গ্রন্থাকার ধারণ করিয়া, মোহতমসাচ্ছন্নসংসার-সাগরোত্তরণযাত্রীগণের নিকট দিঙ্‌নির্ণয় সাহায্যকারী নক্ষত্র নিচয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

দ্বাপর যুগের শেষভাগে, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাস শ্রুতি ও স্মৃতি নিয়ম

চর্চ্চিত জ্ঞানতত্ব গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করিয়া, তাহা বেদ-পুস্তক স্বরূপ প্রচারিত করিলেন। কারণ, মানবগণের অবগতির জন্য, পরম পিতা ভূমণ্ডলে যে বেদ বা জ্ঞান বিস্তার করেন, বাদরায়ণের গ্রন্থনিবদ্ধবিষয় তাহা হইতে অভিন্ন। দ্বৈপায়ন তাঁহার বিরাট বেদ গ্রন্থের বোধসৌকর্য্যার্থ, উহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। পরন্তু, জ্ঞানের অধিকতর ব্যক্তি করিবার জন্য, ব্যাসদেব বেদান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এতদ্ব্যতীত, মুনি-বৃন্দারক বেদব্যাস, সাধারণের জ্ঞানোন্মেষ কল্পে, অদ্বিতীয় মহাভারত গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন। মহাভারতের ন্যায় সারগর্ভ বিপুল গ্রন্থ ভূমণ্ডলে আর আবির্ভূত হয় নাই। অধ্যাত্ম ও নিখিল পুরাতত্বরূপউপকরণ সমাবেশে আদর্শ স্থপতির কুশলী করে বিনির্ম্মিত হইয়া, এই বিচিত্র মনোরম গ্রন্থ জগতে জ্ঞানস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। মহাভারত ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস এবং ব্রহ্মনিলয়ের সোপান সদৃশ। যে সুধী সমালোচক নিম্নলিখিত রূপে মহাভারতের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে অতিপ্রসঙ্গী অভিহিত করা যায় না ঃ—

‘একতশ্চতুরোবেদা ভারতঞ্চৈ তদেকতঃ।
পুরাকিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমস্য তুলয়াধৃতং ॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোঽভ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে ॥’

কপিলমুনি যোগ মার্গে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের উপায় বিবৃত করিয়া, গ্রন্থাকারে সাঙ্খ্য দর্শন প্রণয়ন করিলেন। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগবলে ব্রহ্ম স্বরূপ নিরূপণ এবং অষ্টসিদ্ধি লাভ তত্ব ব্যক্ত করিয়া, পাতঞ্জল শাস্ত্র বিরচিত করিলেন। গৌতম ঋষি কার্য্য কারণ ভাবে ব্রহ্মবাদ প্রতিপাদন করিয়া, বিখ্যাত ন্যায় শাস্ত্রের জন্মদান করিলেন। কণাদ মুনি বিশেষ পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরস্বরূপানুভূতির উপায় ব্যাখ্যা করিয়া বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিলেন। জৈমিনি ঋষি কর্ম্মযোগে ব্রহ্মলাভ সিদ্ধান্ত করিয়া, মীমাংসা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে দ্বাপর যুগে ভারতভূমে বিকৃতনয়ন মানবগণের পরিবীক্ষণ স্বরূপ ষড়্দর্শনের আবির্ভাব হইল। পুরা, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য তত্বের আলোচনায়, বিভিন্ন ঋষিগণ, ক্রমশঃ ব্রহ্ম, পদ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, অগ্নি, বিষ্ণু, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শিব, লিঙ্গ, নারদ, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, বামন ও ভাগবত, এই অষ্টাদশ পুরাণ ও সংহিতারাজি বা স্মৃতি শাস্ত্রের প্রণয়ন করিলেন। অতীত কালে জ্ঞানীগণ যে সকল পবিত্র মন্ত্রে ভগবদারাধনা করিতেন, তদবলম্বনে মুনিগণ তদ্ব্যাখ্যা সহ

তন্ত্র শাস্ত্র প্রচারিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত, ত্রেতাযুগে মহামুনি বাল্মীকি যে মধুর রামায়ণ রচন ও বশিষ্ঠ ঋষি রামচরিত অবলম্বনে যে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং যে সকল ব্যবহার শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তৎ সমস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ফলতঃ, দুর্ব্বলমনা মনুষ্যগণের স্মরণ ও সংবিদুদ্দীপন জন্য যত প্রকার প্রক্রিয়া আবশ্যক, ঋষিগণ তাহার অনুষ্ঠান সমাধান করিলেন।

ত্রেতাযুগে যেরূপ দীপ্তিমান গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ রাজ-সভায় নানাবিধ জ্ঞানানুশীলন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে ঋষিগণ আসিয়া, জ্ঞানোপদেশ দানে রাজসভা সমালোকিত করিতেন, দ্বাপরিক নৃপতিবৃন্দ স্বস্ব সভায় সর্ব্বদা রাজনীতি চর্চ্চাপর থাকায়, দ্বাপরযুগে সেরূপ প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু সমাজে নানাবিষয়িনী ব্যবহারিক-বিদ্যান্দোলন জন্য যেমন বহু পাঠাগার সংস্থাপিত হইয়াছিল, ঋষিগণ তেমনি প্রায়শঃ তপোবনে সমবেত হইয়া, গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচন এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণাদি আদান প্রদান করিতেন। মহাভারতে, দ্বাপর যুগে নৈমিষাদি অরণ্যে শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের পবিত্র সম্মিলনের অনেক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত জ্ঞানগরিষ্ঠ সমবেত ঋষিগণ আত্মতত্ত্ব ভিন্ন, প্রত্যক্ষীকৃত ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গণিত, স্বরতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুমিষ্টালাপন করিতেন এবং যাবতীয় ব্যবহারিক বিদ্যাবিষয়ে ইঁহাদের অভ্রান্ত মীমাংসা গ্রন্থনিবদ্ধ হইয়া, সমাজে প্রচলিত হইত।

সংসারে সত্যজ্ঞান রক্ষা ও মানবের তৎশিক্ষাবিধান কল্পে ঋষিগণ দ্বাপরে গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিলেও, তাঁহারা উহার মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতি অনুমোদন করেন নাই। মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা তৎকালে প্রকৃত জ্ঞানবিস্তারের পথ অধিকতর প্রশস্ত হওয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহারা যে হস্তলিখিত পুস্তকের পরিবর্ত্তে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থের প্রচলন করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা, মুদ্রাঙ্কন প্রণালীর উদ্ভাবন করা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের সাধ্যাতীত হইত না। দ্বাপরে যে ঋষিগণ হস্তলিখিত পুস্তক ব্যবহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার দুইটী কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ সত্যযুগ তুলনায় দ্বাপরে মানবের মেধাশক্তি অর্দ্ধপরিমাণে খর্ব্ব হইলেও, উহা এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, মানবগণ যে কোন লিখিত বিষয় স্বল্পাবৃত্তি দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এজন্য, গ্রন্থ সুদীর্ঘ কালস্থায়ী করণ কল্পে কোন প্রক্রিয়াবলম্বনের আবশ্যকতা ছিল না। শিক্ষার্থীকে কোনও বিষয়

বুঝাইতে হইলে, তাহা এতদূর ব্যাপ্ত বা স্থূল করা কর্ত্তব্য, যাহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় ছাত্রের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। ততোধিক ব্যাপ্তি এবং তাহার দীর্ঘবিস্তমানতা, উভয়ই সুশিক্ষার অন্তরায়। কেননা, তদুভয়ই ছাত্রের বুদ্ধি পরিচালনার বিঘ্নোৎপাদন এবং আলস্যের প্রশ্রয় প্রদান করে। শিষ্য কোনও বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার পর, গুরু যদি তাহাকে বলেন, 'পুনরায় আমার নিকট আসিও, আমি আরও বিশদরূপে ইহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব' কিম্বা সেই বিষয় লিখিয়া দিয়া, তাহা বারম্বার দৃষ্টি করিতে শিষ্যকে উপদেশ দেন, তাহা হইলে হৃদ্গত বিষয় মনে দৃঢ়ভাবে রক্ষিত করিতে বা আনুষঙ্গিক অপরাপর তত্ত্ব চিন্তা করিতে ছাত্রের যত্ন হয় না। দ্বাপরে মানবগণ উচ্চ তত্ত্বরাজি শিক্ষক প্রমুখাৎ শ্রবণ কবিয়া, মনে ধারণা করিতে পারিতেন না ; কিন্তু ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়া, অধিকতর ব্যাপ্ত হইলে, অধ্যয়ন দ্বারা তাহা শিক্ষা করিতে পারিতেন। এই আধ্যয়নিক শিক্ষায় গুরুর প্রথম বাচনিক উপদেশ পর্য্যাপ্ত হইত। দ্বিতীয়তঃ, বিষয় যত ব্যাপ্ত হয়, ততই তন্মধ্যে বিস্মৃতি প্রবেশ করে। এজন্য, ঋষিগণ, যে পরিমাণ ব্যাপ্তি দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয়, ততোধিক ব্যাপ্তি অনুমোদন করিতেন না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে, তাঁহারা স্বহস্তে গ্রন্থে যে সত্যের অবতারণা করিতেন, মুদ্রণ কার্য্যে বহুভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হইয়া, তাহার অনেক অপচয় হইত। আবার, মুদ্রিত পুস্তকের বহুল প্রচারে, অনধিকারীগণ তাহার দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়ের কদর্থ সাধন করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, পরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ অনেক উদাহরণ সংঘটিত হইয়াছে। ঋষিগণ হস্তলিখিত গ্রন্থদ্বারা কোনও সুতত্ত্ব প্রকট করিলে, প্রকৃত শিক্ষার্থীগণ আগ্রহ, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, যেরূপেই হউক, তাহা বিদিত হইতে পারিতেন। কিন্তু অনধিকারীগণ উহা নীরস ও সারহীন বিবেচনা করিয়া, তদ্বিজ্ঞাননে আয়াস স্বীকারে বিরত থাকিতেন। অপিচ, এইসকল অলস মুখর ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ হস্তগত করিয়া, তাহার তীব্র কদালোচনা করিবার অবকাশ পাইতেন না। বিস্মৃতি বা অবিদ্যার ছায়াপাতে সত্যের যে মলিনতা হয়, ব্যাপ্তিই তাহার একমাত্র কারণ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এক ব্যক্তি যাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে, অনেকাংশে, যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে উহা বলিতে গেলে, ততোধিক সত্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে, বিষয় জন পরম্পরায় যত ব্যক্ত হয়, ততই উহা বিস্মৃতির আবরণগ্রস্ত হয়। জ্ঞানবান ঋষিগণ মহত্তত্ত্ব রাজির সত্যবল

সংরক্ষণার্থ, তদ্ব্যাপ্তিপরিমাণসংযমে যে বিশেষ সমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ধীরবুদ্ধি বিচারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পুত্তলি-ক্রীড়াকর যেমন যবনিকান্তরালে থাকিয়া, বিভিন্ন জড়পুত্তলিকাদ্বারা চৈতন্যচেষ্টিত প্রদর্শন করে,সেইরূপ, ঘটনা বৈচিত্র্যময় দ্বাপর যুগে এক মহাপুরুষ দ্বারা ভারতবর্ষে মানবকার্য্যাবলী নিয়ামিত হইয়াছিল। দ্বাপরের প্রত্যেক সাংসারিক মহদনুষ্ঠানে এই বিস্ময়কর্ম্মা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দৃশ্যতঃ অসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, কারণ স্বরূপ প্রতিপন্ন হইতেন। দ্বাপরিক দাম্ভিক বীরগণ ইঁহার অসাধারণ শৌর্য্যে ইঁহার নিকট নতশির হইতেন। প্রেমিকগণ ইঁহার প্রেমে উন্মত্ত এবং সংসার ও দেহবোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া, ইঁহার সহিত মিলিত হইতেন। এই চিরস্মরণীয় পরম পুরুষের মধুর প্রেম-প্রস্রবণ হইতে ভারতবর্ষে এক পবিত্র ধর্ম্মসরিৎ প্রবাহিত হইয়াছে। ইঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে কূটসংসারনীতিজ্ঞগণের বৈভববুদ্ধিচাতুর্য্য পরাহত হইত। ইনি অসামান্য কার্য্যপরম্পরা সম্পাদন দ্বারা জনগণের ভীতি সঞ্চার ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। বাল্যে পূতনাবধ, কালীয়-দমন ও গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া, ইনি মানবের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। ইনি, সামাজিক শান্তি সংস্থাপন জন্য, দুর্বৃত্ত দস্যু বককে নিহত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসাম্য সংরক্ষণার্থ, ইনি প্রজাপীড়ক মহীপাল কংস,জরাসন্ধ ও শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মথুরারাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মানব বসতি বিস্তারকল্পে, ইনি বিস্তীর্ণ খাণ্ডবারণ্য দাহ করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণের সখা হইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন। ইনি অনুপম সুন্দর ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। ধর্ম্মবিপ্লব ও অধর্ম্ম প্রভাববান দ্বাপরে সাধুগণের রক্ষা এবং দুষ্টগণের বিনাশজনিত ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু, ইনি যে নরদেহ ধারণ করিয়া দৈবকীবসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ঋষিগণ পূর্ব্বেই তাহা বিদিত হইয়াছিলেন এবং ইনি স্বীয় বাক্য ও কার্য্যদ্বারা জগদাদিকারণ সর্ব্বনিয়ন্তার সহিত নিজাদ্বৈত প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ইনি ইঁহার মঙ্গলাবির্ভাব-বার্ত্তা অন্তরঙ্গগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং যে যে সময়ে বিস্মৃতিকবলে সত্য-গ্লানি সঞ্জাত হইয়া, বিকার-মূলক সৃষ্টি-বৈষম্য সংঘটিত হইবে, তখনই দয়াময় অনন্ত সান্ত নর রূপে আবির্ভূত হইয়া, বাহেন্দ্রিয় গ্রাহ্যভাবে প্রকৃতি রক্ষা করিবেন, এই পরম পবিত্র আশ্বাসবাণী মানব-সংসারে ঘোষণা করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন জলদখণ্ড ক্রমশঃ একত্রিত হইয়া, যেমন অবশেষে প্রবল ঝঞ্ঝামারুত

বুঝাইতে হইলে, তাহা এতদূর ব্যাপ্ত বা স্থূল করা কর্ত্তব্য, যাহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় ছাত্রের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। ততোধিক ব্যাপ্তি এবং তাহার দীর্ঘবিস্তমানতা, উভয়ই সুশিক্ষার অন্তরায়। কেননা, তদুভয়ই ছাত্রের বুদ্ধি পরিচালনার বিঘ্নোৎপাদন এবং আলস্যের প্রশ্রয় প্রদান করে। শিষ্য কোনও বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার পর, গুরু যদি তাহাকে বলেন, 'পুনরায় আমার নিকট আসিও, আমি আরও বিশদরূপে ইহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব' কিম্বা সেই বিষয় লিখিয়া দিয়া, তাহা বারম্বার দৃষ্টি করিতে শিষ্যকে উপদেশ দেন, তাহা হইলে হৃদ্গত বিষয় মনে দৃঢ়ভাবে রক্ষিত করিতে বা আনুষঙ্গিক অপরাপর তত্ত্ব চিন্তা করিতে ছাত্রের যত্ন হয় না। দ্বাপরে মানবগণ উচ্চ তত্ত্বরাজি শিক্ষক প্রমুখাৎ শ্রবণ কবিয়া, মনে ধারণা করিতে পারিতেন না ; কিন্তু ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়া, অধিকতর ব্যাপ্ত হইলে, অধ্যয়ন দ্বারা তাহা শিক্ষা করিতে পারিতেন। এই আধ্যয়নিক শিক্ষায় গুরুর প্রথম বাচনিক উপদেশ পর্য্যাপ্ত হইত। দ্বিতীয়তঃ, বিষয় যত ব্যাপ্ত হয়, ততই তন্মধ্যে বিস্মৃতি প্রবেশ করে। এজন্য, ঋষিগণ, যে পরিমাণ ব্যাপ্তি দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয়, ততোধিক ব্যাপ্তি অনুমোদন করিতেন না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে, তাঁহারা স্বহস্তে গ্রন্থে যে সত্যের অবতারণা করিতেন, মুদ্রণ কার্য্যে বহুভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হইয়া, তাহার অনেক অপচয় হইত। আবার, মুদ্রিত পুস্তকের বহুল প্রচারে, অনধিকারীগণ তাহার দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়ের কদর্থ সাধন করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, পরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ অনেক উদাহরণ সংঘটিত হইয়াছে। ঋষিগণ হস্তলিখিত গ্রন্থদ্বারা কোনও সুতত্ত্ব প্রকট করিলে, প্রকৃত শিক্ষার্থীগণ আগ্রহ, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, যেরূপেই হউক, তাহা বিদিত হইতে পারিতেন। কিন্তু অনধিকারীগণ উহা নীরস ও সারহীন বিবেচনা করিয়া, তদ্বিজ্ঞানে আয়াস স্বীকারে বিরত থাকিতেন। অপিচ, এই সকল অলস মুখর ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ হস্তগত করিয়া, তাহার তীব্র কদালোচনা করিবার অবকাশ পাইতেন না। বিস্মৃতি বা অবিদ্যার ছায়াপাতে সত্যের যে মলিনতা হয়, ব্যাপ্তিই তাহার একমাত্র কারণ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এক ব্যক্তি যাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে, অনেকাংশে, যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে উহা বলিতে গেলে, ততোধিক সত্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে, বিষয় জন পরম্পরায় যত ব্যক্ত হয়, ততই উহা বিস্মৃতির আবরণগ্রস্ত হয়। জ্ঞানবান ঋষিগণ মহত্তত্ত্ব রাজির সত্যবল

সংরক্ষণার্থ, তদ্ব্যাপ্তিপরিমাণসংযমে যে বিশেষ সমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ধীরবুদ্ধি বিচারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পুত্তলি-ক্রীড়াকর যেমন যবনিকান্তরালে থাকিয়া, বিভিন্ন জড়পুত্তলিকাদ্বারা চৈতন্যচেষ্টিত প্রদর্শন করে,সেইরূপ, ঘটনা বৈচিত্র্যময় দ্বাপর যুগে এক মহাপুরুষ দ্বারা ভারতবর্ষে মানবকার্য্যাবলী নিয়ামিত হইয়াছিল। দ্বাপরের প্রত্যেক সাংসারিক মহদনুষ্ঠানে এই বিস্ময়কর্ম্মা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দৃশ্যতঃ অসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, কারণ স্বরূপ প্রতিপন্ন হইতেন। দ্বাপরিক দাম্ভিক বীরগণ ইঁহার অসাধারণ শৌর্য্যে ইঁহার নিকট নতশির হইতেন। প্রেমিকগণ ইঁহার প্রেমে উন্মত্ত এবং সংসার ও দেহবোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া, ইঁহার সহিত মিলিত হইতেন। এই চিরস্মরণীয় পরম পুরুষের মধুর প্রেম-প্রস্রবণ হইতে ভারতবর্ষে এক পবিত্র ধর্ম্মসরিৎ প্রবাহিত হইয়াছে। ইঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে কুটসংসারনীতিজ্ঞগণের বৈভববুদ্ধিচাতুর্য্য পরাহত হইত। ইনি অসামান্য কার্য্যপরম্পরা সম্পাদন দ্বারা জনগণের ভীতি সঞ্চার ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। বাল্যে পূতনাবধ, কালীয়-দমন ও গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া, ইনি মানবের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। ইনি, সামাজিক শান্তি সংস্থাপন জন্য, দুর্বৃত্ত দস্যু বককে নিহত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসাম্য সংরক্ষণার্থ, ইনি প্রজাপীড়ক মহীপাল কংস,জরাসন্ধ ও শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মথুরারাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মানব বসতি বিস্তারকল্পে, ইনি বিস্তীর্ণ খাণ্ডবারণ্য দাহ করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণের সখা হইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন। ইনি অনুপম সুন্দর ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। ধর্ম্মবিপ্লব ও অধর্ম্ম প্রভাববান দ্বাপরে সাধুগণের রক্ষা এবং দুষ্টগণের বিনাশজনিত ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু, ইনি যে নরদেহ ধারণ করিয়া দৈবকীবসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ঋষিগণ পূর্ব্বেই তাহা বিদিত হইয়াছিলেন এবং ইনি স্বীয় বাক্য ও কার্য্যদ্বারা জগদাদিকারণ সর্ব্বনিয়ন্তার সহিত নিজাদ্বৈত প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ইনি ইঁহার মঙ্গলাবির্ভাব-বার্ত্তা অন্তরঙ্গগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং যে যে সময়ে বিস্মৃতিকবলে সত্য-গ্লানি সঞ্জাত হইয়া, বিকার-মূলক সৃষ্টি-বৈষম্য সংঘটিত হইবে, তখনই দয়াময় অনন্ত সান্ত নর রূপে আবির্ভূত হইয়া, বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্যভাবে প্রকৃতি রক্ষা করিবেন, এই পরম পবিত্র আশ্বাসবাণী মানব-সংসারে ঘোষণা করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন জলদখণ্ড ক্রমশঃ একত্রিত হইয়া, যেমন অবশেষে প্রবল ঝঞ্ঝামারুত

করিতেন। দুঃখের হলাহল গাঢ়তররূপে আস্বাদন করিবার জন্য, তরুণ বয়সেই কুগ্রহগ্রস্ত পরিক্ষিতের সাংসারিক অভিজ্ঞতার উন্মেষ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। সৎ এবং সুদক্ষ সদস্যগণের উপর রাজকার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া, নিরীহ পরিক্ষিৎ একাকী বিষণ্ণবদনে স্বীয় দুষ্ট ভাগ্যলিপি পর্য্যালোচনা করিতেন। 'সুপ্রসিদ্ধ মহাকুলে কীর্ত্তিমান বীরপূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর স্বরূপ কীট পরিক্ষিতের কেন জন্ম হইয়াছিল? সংসারে হাস্যাস্পদ ও অপযশোভাগী হইবার জন্য, কুল গৌরবক্ষণে অসমর্থ অধম পরিক্ষিতের উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার ভাগ্যবিদ্রূপ সহ্য করিবার জন্য, দুঃস্থ পরিক্ষিৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। পাতকী পরিক্ষিৎ ভুবনবিখ্যাত জনকরত্ন লাভ করিয়াও, তাঁহার আদর প্রাপ্ত হইল না; কিম্বা তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বাসনা-নিবৃত্তি করিতে পারিল না; পরন্তু, স্নেহপ্রবণ পিতামহগণ কর্ত্তৃক বাল্যে পরিত্যক্ত হইল। নারকী পরিক্ষিতের জন্য অনল-শয্যাকল্প হস্তিনারাজসিংহাসন বিহিত হইয়াছে। যে স্থানে প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহগণ প্রশান্তচিত্তে তরুতলে বাস করিতেছেন, তথায় তাঁহাদের পাদমূলে উপবেশন করিয়া, পরিক্ষিৎ কত সুখী হইতে পারিত! অথবা, কোনও সাধারণ ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, পরিজনস্নেহানুবিদ্ধ হইয়া দীনবৃত্তি দ্বারাও পরিক্ষিৎ কতসুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত!' এবম্বিধ চিন্তা-তরঙ্গনিচয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, হস্তিনা-রাজ্যেশ্বর পরিক্ষিৎ সর্ব্বদা আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন। পূর্ব্ব-পুরুষগণের স্মৃতি কাতর পরিক্ষিতের শোকোচ্ছ্বাস-বহ্নির ইন্ধন স্বরূপ ছিল; আবার তাঁহাদের গুণানুসন্ধিৎসায় তাঁহার মনস্তাপ প্রশমিত হইত। পাণ্ডব, ধার্ত্তরাষ্ট্রেয় ও অপরাপর কৌরবগণের বিচিত্র আখ্যানাবলীর আকর্ণন-কর্ম্মে পরিতপ্ত পরিক্ষিৎ স্বীয় প্রায়শ্চিত্তাবধারণ করিয়াছিলেন। বিষাদভারাক্রান্ত পরিক্ষিৎ বয়োজরাভিভূত না হইয়াও স্থবির হইয়াছিলেন। এইরূপে চিরব্যথিত পরিক্ষিৎ দুঃখ-তক্ষক দংশনে নরলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

পরিক্ষিতের দেহাত্যয়ে তৎপুত্র জনমেজয় পিতৃত্যক্ত সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন; কিন্তু ইনিও স্বীয় জনকের ন্যায় কোমলান্তঃকরণ ও খেদপরায়ণ ছিলেন। পরিক্ষিতের ন্যায় জনমেজয়েরও কোন প্রকার বিধিৎসা ছিলনা। পিতৃছন্দানুবর্ত্তী হইয়া, মহারাজ জনমেজয় পূর্ব্বপুরুষগণের স্বপ্নোপমা বীরকাহিনী শ্রবণ করিতেন এবং সংসারের ভীম ভ্রূকুটী ভঙ্গে সময়-স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, যে উদ্যম ও পরাক্রম লক্ষণে দ্বাপরিক মানবের বিশেষত্ব সূচিত হইত, পরিক্ষিৎ ও জনমেজয় তদুভয়গুণ বিবর্জ্জিত ছিলেন।

পরিক্ষিৎ ও জনমেজয়ের রাজত্ব সময়ে কোনও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। যাহা হউক, ধরাতল আসন্ন প্রলয়-তমিস্রা-পরিবৃত হইবার পূর্ব্বে, রাজা জনমেজয়ের দুর্গত জীবনের অবসান হইয়াছিল।

প্রভঞ্জনান্তে প্রকৃতি যেরূপ স্থিরভাব ধারণ করে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ও পাণ্ডবগণের মহা প্রস্থানের পর, পরিক্ষিৎ ও জনমেজয়ের রাজত্বকালে, ভারতভূমিস্থ দুর্ব্বল আর্য্য-সমাজ ও রাজ্য-নিচয়ে সেইরূপ গাঢ়নিস্তব্ধতা বিরাজ করিয়াছিল। জনমেজয়ের লোকান্তর গমন হইতে ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গগনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা সমুদিত হইয়া, সর্ব্বত্র অজস্র উপদ্রব বর্ষণ করিতে লাগিল। নরপতিগণ সঙ্কীর্ণান্তঃকরণ, পররাষ্ট্রলোলুপ ও অবৈধবিলাস-পরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। লোভ ও বিলাসিতা হেতু, ভূপালবৃন্দের পরস্পর-বিদ্বেষ ও প্রজা-পীড়ন-পাপ অতি মাত্রায় সমুত্থিত হইল। রাজন্যবর্গ মোহান্ধ হইয়া, যে ঈর্ষামূলক সমরানল প্রজ্বালিত করিলেন, তাহাতে আপনারাই ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন। নেতা এবং শাসকের অভাবে নানাবিধ সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। হীনমতি ব্যক্তিগণ অর্থ ও শারীরিক বলে সমাজে প্রভুত্ব স্থাপন প্রয়াসী হইল। দস্যু-তস্কর-প্রাদুর্ভাবে মানবের ধন প্রাণ বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। এই বিপ্লব-যোগাবলম্বনে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সুদাস, সুমুখ, নিমি প্রভৃতি অনার্য্যগণ স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিলেন। ইঁহারা আপনাদিগকে তত্তৎ প্রদেশের রাজা ঘোষণা করিয়া, দেশলুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইলেন। আপামর সাধারণ ইঁহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, ইঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং এই সকল দুর্ব্বিনীত, ধনশোষক ও প্রজাপীড়ক ভূপতিকে সংহার করিয়াছিল। তথাপি, শিথিলবদ্ধ সামান্য জনপ্রতান দীর্ঘকাল সংহত ভাবে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া, অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মানবকুল বিরোধপরায়ণ হইয়া, পরস্পর হিংসায় প্রবৃত্ত হইল। কাল-সাগরে ঈদৃশ ঘটনা স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, জীর্ণ দ্বাপর যুগ খণ্ডপ্রলয়াবর্ত্তগর্ভে বিনিমজ্জিত হইল।

সত্য যুগের অর্দ্ধ এবং ত্রেতা যুগের ত্রিচতুর্থাংশ ৮৬৪০০০ বর্ষ পরিমাণ কাল ধরাতলে অবস্থিতি করিয়া, দ্বাপর যুগ অবসিত হইয়াছিল। পূর্ব্বগত যুগদ্বয় বিলোপকালের ন্যায়, দ্বাপরাবসান সময়েও, অগণন জীবক্ষয় ও নৈসর্গিক বিভীষিকা সংঘটিত হইয়াছিল। তথাপি, জগতের ভবিষ্যঘনান্ধকারসূচনা স্বরূপ ঋষিগণের অন্তর্ধান হেতু দ্বাপরযুগবিলয় অধিকতর শোচনীয় ও বিষাদময়।

যুগান্তকালে ঋষিগণ অতীত যুগশক্তি ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং পর যুগাবির্ভাবে তাঁহারা তাহাতে, যথাসম্ভব, সেই শক্তির সঞ্চার করিতেন। এইরূপে মর্ত্ত্যধামে বিধিনিঃসৃত জ্ঞান-প্রবাহক্রমমন্দবেগে দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। দ্বাপরাত্যয় সময়ে,যে কতিপয় তাপস ভূমণ্ডলে বিরাজ করিতেছিলেন, কলির ভবিতব্য তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। কলিযুগ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আশ্রিতা ব্রহ্মবিদ্যাশক্তি যে পরিচালিতা হইবে না, তাহা তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য, এই সকল বিপশ্চিৎ মুনিগণ জীবের মঙ্গল হেতু আগামী যুগবিবরণ ইঙ্গিত করিয়া এবং তদ্বিষয়ে মানবগণকে সতর্ক হইবার উপদেশ দিয়া, দ্বাপর যুগ সহ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ঋষিগণ পূর্ব্বেই এই ভবিষ্যৎ যুগের বিষয় গণনা ও অবধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা 'কলি' আখ্যা প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছে (কল্ = গণনা করা) এবং দ্বাপরিক গ্রন্থনিচয়ে যে কলি যুগের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই তাহার কারণ। ঋষিগণের তিরোভাব হেতু দ্বাপর ও কলিযুগ মধ্যে এমন এক বিজাতীয় পার্থক্য অনুভূত হয়, যাহা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের পরস্পর মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান মরীচিমালীর গভস্তি সদৃশ ছিলেন। অহ্ন পর্য্যায়ে দিবালোক বিকাশের ন্যায়, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ইঁহাদের দ্বারাই জ্ঞানপ্রভাবিস্তারে, ভুবন আলোকিত হইয়াছিল। কাশ্যপ খণ্ডে জ্ঞানসূর্য্যের পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যবসিত হইলে, ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ক্রমান্বয়ে ইহার মধ্যাহ্ন, পরাহ্ণ ও অপরাহ্ণ ক্ষেপিত হয়। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান-রবি মধ্যে মধ্যে মোহজলদাবৃত হইলেও, পরক্ষণেই মেঘমুক্ত হইয়া, ইহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইত। সুতরাং, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানদিবাকর-করোজ্জ্বল ছিল। পরন্তু ঋষিগণের অন্তর্ধানে কলিযুগ অজ্ঞান-রজনী-তিমিরে চিরসমাচ্ছন্ন।

কলিযুগ এবং ধর্ম্মবিপর্য্যয়।

দ্বাপরযুগাবসানপ্রাক্কালে যে ভবিষ্যৎ অন্ধ-যুগ-সংবাদ মানব-রোমাঞ্চ সমুৎপাদন করিত, বিধি-নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সেই ঋষিপ্রোক্ত ভীষণ কলিযুগ ভূমণ্ডলে অধিকার স্থাপন করিল এবং অল্পকাল মধ্যেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ কলির কঠোর অধিকার পৃথিবীতে বদ্ধমূল হইল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ছয় দানব লইয়া কলির মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইল এবং অসূয়া, কাপট্য, বিদ্বেষ, লাম্পট্য, অহমহমিকা, প্রাগল্ভ্য প্রভৃতি যাতুধানগণ বিপুল কৃষ্ণবৈজয়ন্তি হস্তে

ধারণ করিয়া, নবযুগের জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল। অর্থলিপ্সা ও বিলাসিতা কলির চামরধারিণী নিযুক্তা হইল এবং চাটুকিঙ্কর স্মিতবদনে বিমোহন যুগ-শিরে বিচিত্র আতপত্র ধারণ করিল। এবম্বিধ অভ্যুদয়োদ্যোগে প্রভববান কলি শাসন-দণ্ড-পরিচালন আরম্ভ করিলেন। রাষ্ট্র মধ্যে রাজধানীতে রাজপ্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। বিধাতৃ-বিধানে ভারতভূমি ধরা-শাসক যুগরাজগণের রাজধানী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং, অন্যান্য যুগ-প্রতাপের ন্যায় কলিযুগ-প্রভাব ভাতবর্ষে সমধিক অনুভব-যোগ্য।

জীবনধারণ জন্য মানবের যে ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপাল্য, সেই সত্যযুগপ্রতিষ্ঠিত পবিত্র সমাজধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া, এক চতুর্থাংশে পর্য্যবসিত হইল। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দাম্পত্যপ্রেম, স্নেহ, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি প্রভৃতি নরহৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি-নিচয়, বিস্মৃতির বিষম প্রভাবে কৃত্রিমভাব ধারণ করিল। পূজ্য বোধে কাহারও প্রতি আন্তরিক অনুরাগ উপস্থিত না হইলেও, যাঁহারা সংসারে নমস্য কথিত হন, লোকব্যবহারসিদ্ধি হেতু, তাঁহাদের প্রতি বাহ্য-সম্ভ্রম-প্রদর্শন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। স্থূলেন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভর্ত্তৃজায়ানুরক্তির মূল-সূত্র পরিগণিত হইতে লাগিল। জনকজননীগণ স্ব স্ব সন্তানবর্গের মানসিক উন্নতি বিধান অপেক্ষা, তাহাদের সামারৌহিক ভরণ পোষণে অধিকতর আমোদ উপভোগ এবং ইহাই প্রকৃত বাৎসল্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বাহ্য ব্যবহারে পিতৃমাতৃস্নেহ পরি-মিত হওয়ায়, সোদরপ্রীতি বিদ্বেষ-মিশ্রিত ও মলিন হইয়া উঠিল। ভ্রাতা-ভগিনীগণ মধ্যে কেহ পিতামাতার নিকট হইতে স্নেহচিহ্নজ্ঞাপক কোনও দ্রব্য অধিকমাত্রায় প্রাপ্ত হইলে, অপর সকলে তৎপ্রতি আক্রোশ এবং পিতামাতার পক্ষপাত চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে যুগপ্রভাবে, শৈশবেই মানব-মনে স্বাতন্ত্র্য-বীজ উপ্ত হইয়া, রুধিরজ সম্পর্ক শিথিল এবং পারিবারিক অনৈক্য ও অশান্তির অঙ্কুরোৎপাদন করিতে লাগিল। হৃদয়ের সাদৃশ্য হেতু, মর্ত্ত্যধামে ভিন্ন-নর-দেহাশ্রয়ী আত্মার মিলনে যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইত, মলিনান্তঃকরণ মানবগণ পরস্পর সাহায্যে পরস্পরের অভাব মোচনার্থ একতা-সূত্রে গ্রথিত ও বন্ধু পদবাচ্য হইয়া, তাহার বিকৃতিসাধন করিল। অর্দ্ধশুষ্ক প্রাণে আন্তরিক হর্ষ বা বেদনানুভব না হইলেও, মনুষ্যগণ লৌকিকতা রক্ষা হেতু, অপরের শ্রীবৃদ্ধি বা বিপদে, শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরে আমোদ বা খেদ প্রকাশ করিয়া, কপট সহানুভূতি প্রদর্শন-প্রয়াসী হইল। ফলতঃ মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজড়িত হওয়ায়, দুর্ব্বল ও অপবিত্র হইয়া গেল। এমন কি, সন্তান-বাৎসল্য

মধ্যেও, পিতামাতার ভবিষ্যতে সন্তান কর্ত্তৃক ইহসংসারে উপকৃত হইবার আশা লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বিশ্বাস-নেত্র দ্বারা জগতে শান্তি দর্শন করা যায়। স্বার্থপরতা-মসির প্রলেপনে মানবের বিশ্বাসচক্ষু মুদ্রিত হয়। যাহাতে মানব পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি দর্শন করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে, মানবের বিশ্বাস নয়ন নিমীলন করণ জন্য, দুষ্ট কলি তাহাতে স্বার্থপরতার বিষময় মসি বিলিপ্ত করিয়া দিল। কলির প্রতাপ যত প্রচণ্ড হইতেছে, স্বার্থানুসন্ধিৎসা প্রভাবে মানবের বিশ্বাসাক্ষি ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। সংসারাশ্রমে সুখ ভোগ করিতে হইলে, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের উপর সম্পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করা আবশ্যক; কেননা, পরিবার ও সমাজগত ব্যক্তি সমূহের পরস্পর সহায়তা ব্যতীত সাংসারিক সুখলাভ করা যায় না। কলিযুগে মানবগণ সুখপিপাসু হইয়াও, স্বার্থহানি আশঙ্কায়, পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস করে। এজন্য কেহই, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যানুভব করিতে পারে না। সন্তান-বাৎসল্য সাংসারিক স্নেহনিচয় মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল; কিন্তু কলিযুগে পিতামাতার স্বার্থসিদ্ধিবাসনা-মণ্ডিত হইয়া, উহা প্রতিক্ষণ মলিন ও নিস্তেজ হইতেছে। সাংসারিক লাভাপচয় গণনায়, সন্তান দ্বারা তৎসমাধান সম্ভাবনা তারতম্যে, পিতামাতাগণ সন্তানগণের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। অধুনা, ভদ্র সমাজে কন্যা পাত্রস্থা করা ভূরিব্যয়সাধ্য; এজন্য পিতামাতা কন্যাগণের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। পুত্রগণের প্রতিও, স্বার্থসিদ্ধি বা তৎসম্বন্ধীয় আশার অনুপাতে পিতৃমাতৃ-স্নেহের ন্যূনাধিক্য প্রমাণিত হয়। জনক জননীগণের ঈদৃশ হেলাচরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সন্তানগণও লব্ধস্নেহ তৌলে তাঁহাদিগকে কৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রতিদান করে। এইরূপে পিতামাতা ও সন্তানগণ মধ্যে কপটাচরণ অনুষ্ঠিত হয় এবং একদিকে পিতামাতাগণ যেমন বিবেচনা করেন, সন্তানগণ তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তানভাব প্রদর্শন করে না, অন্যদিকে সন্তানগণও জনক জননীর বিমল স্নেহপ্রাপ্তি বিষয়ে সন্দিহান হয়। অবিদ্যাবিলাসভোগলিপ্সু দম্পতি পরস্পর পরস্পরের নিকট স্থূলেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আচরণ প্রত্যাশা করেন; কিন্তু অভীষ্ট পূর্ণ না হওয়ায়, অভিমান দগ্ধ হইয়া, অন্যোন্যে অবিশ্বাস এবং মনোবেদনা অনুভব করেন। দাম্পত্যানুরাগ বিকারে স্বামী স্ত্রী যেরূপ অশান্তি উপভোগ করেন, তজ্জাত সন্তানগণও সেইরূপ রুগ্নমনা ও অহঙ্কারপরায়ণ হয়। সাংসারিক জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ অপ-

রিণত ভেদবুদ্ধি প্রভাবে পরস্পর মধ্যে যে সাময়িক অসদ্ভাব অনুভব করে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্বার্থবোধ পরিপক্ক হইয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে তাহা সোদর বিদ্বেষে পরিণত হয়। যাহাদের ধমনী মধ্যে এক পিতৃ শোণিত প্রবাহিত হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যাহারা এক জননী জঠরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, কালবশে সেই সকল মানব, সংসার ক্ষেত্রে তুচ্ছ পদার্থের জন্য ঘোরবিরোধব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বহিরঙ্গাচরণ করে। স্বার্থহানি আশঙ্কায়, ভ্রাতা ভ্রাতার দারুণ বৈরী ও সমধিক সংশয়-পাত্র বিবেচিত হয়। সংসারে পরস্পরাপেক্ষায় বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য, কতকগুলি প্রাণী একত্রে বিধি কর্ত্তৃক ঐকপারিবারিক বৃত্তাভ্যন্তরে স্থাপিত হয়। মানবগণ, কলিযুগে, মনোমালিন্য বশতঃ, বিধাতার পবিত্র অভিপ্রায় চিহ্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; প্রত্যুত পরিজনবর্গ পরস্পর কলহ করিয়া, পাপ তাপে জর্জ্জরিত হয়।

পরম পিতা ইহসংসারে তাঁহার সন্তানগণের অবলম্বন স্বরূপ, 'পরিবার' ও 'সমাজ' এই দুই ঐককেন্দ্র মহাবৃত্ত নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। পরিধিবিশিষ্ট সমাজ বৃত্ত মধ্যে, মানব কর্ম্মদ্বারা পরিবারবৃত্তায়তনের সঙ্কোচনপ্রসারণ সাধন করিতে পারে। কিন্তু পরিবার-বৃত্তপ্রসার কখনও সমাজ-বৃত্ত-পরিধি অতিক্রম করিতে পারে না। সত্যযুগে উদারধী মানবগণ, প্রথম বৃত্তপরিধি দ্বিতীয় বৃত্ত পরিধির সহিত সম্মিলিত করিয়া, উভয় বৃত্তায়তনের সমতা সমাধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পারিবারিক জনগণকে যেমন সত্যস্নেহ করিতেন, সমাজগত ব্যক্তিগণকেও সেইরূপ স্বপরিবার ভুক্তের ন্যায় বিবেচনা করিতেন। ত্রেতাযুগে পরিবার বৃত্ত পরিধিরেখা সমাজ বৃত্ত পরিধিরেখাবিচ্যুত হইয়া, প্রথম বৃত্তায়তন কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। ত্রৈতেয় মানব সমাজগত ব্যক্তিবর্গকে স্বপরিবার-ভুক্ত জনগণ হইতে ভিন্ন বিবেচনা করিয়া, পারিবারিক জনগণের প্রতি সম্পূর্ণ সৎ এবং পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তিগণের প্রতি ত্রিচতুর্থাংশ সত্য ও একচতুর্থাংশ কৃত্রিম ব্যবহার করিতেন। দ্বাপরযুগে মানবগণ সমাজগত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিনিচয় হইতে আরও অধিক দূর সম্পর্কীয় বিবেচনা করিতেন; এজন্য ত্রেতাযুগ অপেক্ষা দ্বাপরে পরিবারবৃত্তায়তন অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়াছিল। দ্বাপরিক মানব পরিবারগত স্বজনগণের প্রতি সম্পূর্ণ সৎ ব্যবহার করিতেন; কিন্তু পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তিগণের প্রতি অৰ্দ্ধ সত্য ও অৰ্দ্ধ কৃত্রিম আচরণ করিতেন। সুতরাং সত্যত্রেতাদ্বাপর যুগত্রয়ে মানবগণ পরিবার ও সমাজ চক্রের অস্তিত্ব বিষয় অবগত থাকিয়া, মানসিক দৃষ্টি শক্তি অনুসারে, উভয় চক্রের ভেদ ও পরিধি

ব্যবধান নির্দ্দেশ করিতেন। কলিযুগে স্বার্থান্ধ মানবগণ এই দুই বিশাল বৃত্তের একতরেরও অস্তিত্বোপলব্ধি করিতে পারে না এবং কি পরিবারগত, কি তদ্বহির্ভূত সকল ব্যক্তির প্রতিই কৃত্রিম ব্যবহার করে। মোহবশতঃ, অধুনা মানবগণ সময়ে সময়ে, স্বামী-স্ত্রী কেন্দ্র ও সন্তান পরিধি লইয়া, সঙ্কীর্ণ পরিবার-বৃত্ত কল্পনা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বার্থ প্রভাবে একদিকে যেমন দম্পতির ঐকত্রবিচ্যুতিবশতঃ কেন্দ্র বিন্দুর দ্বিত্ব সংঘটিত হয়, অন্যদিকে সেইরূপ সন্তানগণের অনৈক্যে পরিধিবিন্দুর বহুত্ব সঞ্জাত হয়। সুতরাং সতত কেন্দ্র পরিধিবিন্দু-চাঞ্চল্যে পরিবারবৃত্ত কল্পনা পরিস্ফুট হয় না।

সর্ব্বশক্তিমান ধাতা সমাজধর্ম্মস্নেহ ও সত্যসভ্যতাদশায় শান্তিপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া, তাহা পরিবার ও সমাজবৃত্ত কেন্দ্রে স্থাপিত করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই বিশাল দীপালোকবৃত্তদ্বারা সমাজ-বৃত্তাভ্যন্তরে পারিবারিকবৃত্তসীমা নিয়ামিতা হইয়াছে। যখন মানব-সংসারে স্বার্থবোধকুহেলিকার আবির্ভাব হয় নাই এবং পরিবার ও সমাজবৃত্ত সমবিস্তৃত ছিল, সেই পবিত্র সত্যযুগে শান্তি-দীপের বিমল আভায়, আর্য্য-পরিবার ও আর্য্য-সমাজ সমভাবে আলোকিত হইয়াছিল। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে, স্বার্থবোধ কুজ্ঝটিকার ঘনত্বানুপাতে একদিকে শান্তিদীপালোকবৃত্তের সঙ্কীর্ণতা ও তাহাতে পরিবার বৃত্তের উদ্ভাসন এবং অন্যদিকে পরিবারবৃত্তপারে সমাজবৃত্তের ক্রমালোকহীনতা সমাহিত হইয়াছে। সুতরাং যুগ পর্য্যায়ে পরিবারবৃত্তায়তন শমালোকবৃত্তায়তনানুগামী হইয়া, যত সঙ্কুচিত হইয়াছে, সমাজবৃত্ত তত অন্ধকারময় ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়াছে। কলিযুগে স্বার্থাবরণ এরূপ কঠিন ও অস্বচ্ছ হইয়াছে যে, শান্তিদীপালোক তাহা ভেদ করিতে পারে না। ক্বচিৎ, আবরণগাত্রে ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রছিদ্রোদ্ভূত হইলে, তন্মধ্যদিয়া যে শান্তিরশ্মি বহির্গত হয়, তাহা স্বল্প লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং তদ্বারা নিয়মিত আলোকবৃত্ত সঞ্জাত হয় না। এজন্য বর্ত্তমান যুগে শান্তিদীপালোক-বৃত্তের অনুভূতি নাই এবং তন্নিয়ামিত পরিবারবৃত্তেরও অস্তিত্ব নাই। অপরঞ্চ, সত্যযুগে যেরূপ তমালোকোদ্ভাসে পরিবারবৃত্ত ও সমাজবৃত্ত সমীকৃত হইয়াছিল, কলিযুগে তদ্বিপরীত ভাবে অশান্তিতিমিরাবরণে উভয় বৃত্তের একীভূতত্ব নিষ্পাদিত হইয়াছে।

অতএব কলিযুগে, সাধারণতঃ, মানবের পারিবারিক জীবনের ন্যায় সামাজিক জীবনও ঘোর অন্ধকারময়। সমাজে কাহারও সহিত কাহারও সম্প্রীতি নাই; কেহ কাহারও জন্য আন্তরিক সুখদুঃখ অনুভব করে না; প্রত্যুত প্রত্যেক ব্যক্তি

ব্যবহারস্পৃশ্য অপর সকলকে প্রতারিত করিয়া, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি ও চেষ্টা করে। এজন্য মানবের সর্ব্ববিধ সামাজিক আচরণ অত্যন্ত কপট,জটিল ও আড়ম্বর-পূর্ণ হইয়াছে। ব্যবহারগত পক্ষগণের মনোমালিন্যে, কোনও পক্ষই আচরিত ব্যবহারের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না; পরন্তু সকলেই তাহার তিক্তস্বাদ গ্রহণ করে। বসতিনৈকট্যবশতঃ, মানবগণের পরস্পর মধ্যে যে সহজভাব ও ব্যবহার-সৌকর্য্য থাকা আবশ্যক, তাহা সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া, নৈকট্যানুপাতে মানবের পরস্পর বিদ্বেষ ও কলহ পরিপুষ্ট হইয়াছে। প্রতিবাসী প্রতিবাসীর মুখ দর্শন করে না এবং একস্থলবাসীগণ, পরস্পর পরস্পরের নিন্দাচর্চ্চা ও অনিষ্ট চিন্তায় ব্যাপৃত। একপক্ষে মানবগণ যেমন সামর্থ্য থাকিতেও অতিথি সৎকার-বিমুখ, অন্যপক্ষে আবশ্যকতাভাবেও, অনেকে আতিথ্যগ্রহণলিপ্সু। ঈদৃশা-বস্থায় কলিযুগে সুনামার্জ্জন-স্পৃহায় যে আতিথ্যানুষ্ঠিত হয়, তাহাতে অতিথি ও আতিথ্যকার কেহই সুখানুভব করিতে পারেন না। কলিযুগের দানাদি ক্রিয়াও এইরূপ অসরল ও মলিন। ক্রেতা যেমন অল্প মূল্যে উত্তম দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করেন, বিক্রেতা সেইরূপ অধিক মূল্যে মন্দ পণ্য বিক্রয় করিবার আশা করেন। এজন্য, কলিযুগে বাণিজ্যানুষ্ঠান অত্যন্ত নীরস এবং উহা কৃত্রিম উপায়ে সরস করিবার জন্য, আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হয়। অপরাপর ব্যবসায়ও এইরূপ আবিল ও কাপট্যপূর্ণ। আবার, সমব্যবসায়ীগণ, মাৎসর্য্য-প্রভাবে, পরস্পর পরস্পরের হিংসানিরত। প্রভু তৎপ্রদত্ত বেতন পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের নিকট অভীপ্সিত কার্য্যোদ্ধরণ আকাঙ্ক্ষা করেন। পক্ষান্তরে, ভৃত্য প্রভুকে মূল্যাতিরিক্ত কার্য্যলাভকামী ও স্বীয় বেতন অযথেষ্ট বিবেচনা করিয়া, প্রভু-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মনির্ব্বাহে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। এইরূপে, প্রভুভক্তি ও ভৃত্যবাৎসল্য-বিকারে, কলিযুগে প্রভু ভৃত্যে সদ্ভাব নাই। স্বার্থডোরবদ্ধ তথাকথিত বন্ধুগণ, প্রায়শঃ, পরস্পর দ্বন্দ্ব ও আন্তরিক যাতনানুভব করেন এবং পরিশেষে তাঁহাদের বিচ্ছিত্তি সংঘটিত হয়। কারণ, স্বার্থ-পাশ অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও, কণ্টক-বিশিষ্ট। মোহান্ধ ব্যক্তিগণ পরস্পর সহায়তায়, আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধি কল্পে একত্রিত হয়, কিন্তু পদে পদে অভীষ্ট সাহায্য-প্রাপ্তি-বিঘাতে দারুণ নৈরাশ্য ভোগ করে এবং অচিরে ব্যার্থদ্দেশ্য ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মানবমন ঈদৃশ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, পবিত্র ধর্ম্মের নামে প্রবঞ্চনাচরণ করিয়া, মানবগণ ধনলালসা ও বিলাসিতা পরিতৃপ্ত করে। ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য হইয়াও, সকলে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত; কিন্তু কেহই ধর্ম্ম-তথ্যাহরণে প্রস্তুত নহে।

ধর্ম্মধ্বজী কপট ভক্ত ও কপট যোগী দ্বারা কলি সংসার সমাকুল। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপর সকলের ধর্ম্মমত ভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগকে ঘৃণা ও উপহাস করে। এক সম্প্রদায় মধ্যেও পরস্পর পরস্পরের নিন্দাপটু।

আনন্দ-ভোগ-বাঞ্ছা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশভব প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ। মানবসংসারে উচ্চকর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালন দ্বারা বিমল আনন্দ সম্ভোগ করা যায়। কলিযুগে উচ্চ কর্ম্মপ্রবৃত্তিনিচয় বিস্মৃতিকবলে বিকৃত হওয়ায়, মানব তজ্জাত বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে না পারিয়া, বাহ্যজগৎসংস্পর্শে সুখ সংগ্রহকরণলালসায় স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে আসক্ত হয় এবং পৃথিবীকেই নিত্যনিকেতন স্বরূপ বিবেচনা করে। যেমন তক্রপানে দুগ্ধের স্বাদ গ্রহ বা দুগ্ধ পিপাসার শান্তি হয় না, সেইরূপ স্থূলেন্দ্রিয় চর্য্যায় মানব প্রকৃত সুখানুভব করিতে পারে না বা মানবের সুখ-পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। প্রত্যুত মানবের সুখাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে সুখ-মরীচিকায় পতিত হইয়া, মানবগণ কলিযুগের মরুভূত সংসারে অস্থির ভাবে বিচরণ করে। নরনারী মানসিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বাহ্যরূপ লাবণ্য, আন্তরিক বৈভব অপেক্ষা বিত্তজঋদ্ধি এবং নিসর্গ অপেক্ষা কৃত্রিম অনুকার সমধিক ইন্দ্রিয়-সুখকর বিবেচনা করিয়া, তদনুসরণে ধাবমান হয়। আহারনিদ্রামৈথুনব্যাপারত্রিতয়কে চরম সুখের উৎস স্বরূপ কল্পনা করিয়া, মানবগণ, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও যথেচ্ছ ভাবে এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠান সাধন করিতে পারে, সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হয় এবং যে ব্যক্তি যত আড়ম্বর সহকারে এই কর্ম্মত্রয় নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে তত মনুষ্যত্বশালী বিবেচিত হয়। এমন কি, আহারনিদ্রামৈথুনক্রিয়াপদ্ধতিবৈষম্যে মানব ও পশুর প্রধান জাতীয় পার্থক্য বিচারিত হয়। ফলতঃ, কলিযুগে সাধারণ মানব আহার নিদ্রামৈথুনবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া, সংসার কার্য্যে ব্রতী হয়। বিলাসিতা এবং যশঃ, মান ও প্রভুত্ব-প্রাপ্তি বাসনা এই প্রধানা প্রবৃত্তির আনুচর্য্য করে। নরনারীগণ নানা প্রকার রুচিকর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ দ্বারা আহারে, কারু কর্ম্ম-খচিত বহুতল প্রাসাদে উত্তম শয্যায় শয়ন দ্বারা নিদ্রায় এবং কামোত্তেজক সজ্জাপরিচ্ছদ ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা মৈথুনে বিলাসিতা প্রদর্শন বাঞ্ছা করে। যশঃ, মান ও প্রভুত্ব দ্বারা বিলাসিতা সহকারে আহার নিদ্রামৈথুন নির্ব্বাহ করিবার আশায়, মানব যশঃ, মান ও প্রভুত্ব কামনা করে। অন্তর্জগতের প্রতি অনাস্থা ও বাহ্যজগতে অত্যাসক্তি বশতঃ, কলিযুগে মানব-মন অতিশয় কঠিন এবং মানবের ঈশ্বর বিশ্বাস যৎপরো-

নাস্তি মন্দীভূত হইয়াছে। দুরুদ্দেশ্য সাধন কল্পে সততসচেষ্টমানবনিচয় স্বস্ব উদ্যম, অধ্যবসায়, কর্ম্মনিপুণতা প্রভৃতি শক্তির গর্ব্বানুভব করিয়া, সংসার-ক্ষেত্রে আপনাদিগকে কর্ত্তাস্বরূপ বিবেচনা করে। মানবের দুষ্কৃতি প্রভাবে, কলিযুগে সংসার-ক্ষেত্রের কোনও স্থল সমতল বা সুগম নাই। ইহার অনেকাংশ যেমন মানব কঠোরতায় অত্যন্ত বন্ধুর, অবশিষ্ট ভাগ, তেমনি, মানব কাপট্যে নিতরাং পিচ্ছিল। লালসাচঞ্চলান্তঃকরণে ঈদৃশ-ক্ষেত্র-বিচরণে, পদে পদে মানবের পদস্খলন ও চেষ্টাবিঘাত সংঘটিত হয়। তথাপি, অনধিগম্য সুখান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া, মানবকুল আজীবন দারুণ দুঃখ পরম্পরা সহ্য করে।

কলি-তমিস্রায় স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া, মানবগণ উল্লিখিত প্রকারে সুখ-কল্পনা-নিরত হয়। পরন্তু, অর্থকে এই সকল উচ্ছৃঙ্খলকল্পনাসাধনের নিদান ও সর্ব্বশক্তিধর বিবেচনা করিয়া, গাঢ় ভক্তি সহকারে অর্থের উপাসনা এবং যাবতীয় সৎপ্রবৃত্তি তদুদ্দেশ্যে বলিদান করে। কেহ কেহ অর্থরূপছটায় এতাবান্ আকৃষ্ট হয় যে, তদ্বিনিময়ে ইন্দ্রিয়সুখলাভাপেক্ষা অর্থসঞ্চয়করণ অধিকতর তৃপ্তিজনক বিবেচনা করে। এই রূপে, অর্থ স্থলবিশেষে স্বয়ং অভীষ্ট এবং প্রায় সর্ব্বত্র অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়-ভূত প্রতীয়মান হওয়ায়, কলিযুগে অর্থলাভই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য পরিগণিত হয়। অর্থতৃষ্ণায় শুষ্কপ্রাণ ও ব্যাকুল হইয়া, মানবগণ পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খল ভগ্ন করে। পূর্ব্বে যে পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তির উল্লেখ হইয়াছে, মানবের অর্থ-গৃধ্নুতা তাহার অন্যতম কারণ। কেননা, সাংসারিক সম্পর্কানুরাগ অর্থজ সুখলালসা-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া, ক্রৌর্য্যাঙ্গার ও বিদ্বেষভস্মে পরিণত হয়। মানব কল্পিতসুখ করায়ত্ত করিয়া, তাহা বিনা বণ্টনে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার আশায়, অর্থলাভ ও অর্থরক্ষণ চেষ্টায় ব্যাপৃত হয় এবং তৎ ক্রিয়ায় স্বপরিবার ও স্বসমাজগত ব্যক্তিবর্গের প্রতি সতত কপট ও নিষ্ঠুরাচরণ করে। পাশবিক প্রবৃত্তি সহকারে অর্থাহরণ ও স্থূলেন্দ্রিয়-চর্য্যায় তদ্বিনিয়োগ-জনিত অর্থব্যবহার, কলিযুগে, অর্থনীতিসঙ্গত বিবেচিত হয়। কুলক্ষ্যসাধন-বাঞ্ছিত অর্থ কদুপায়ে ব্যবহৃত হয়। মানবগণ আহারনিদ্রামৈথুনবিলাস-সমারোহে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াও, বিলাসিতার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না; কিম্বা সাধ্যানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়াও কৃপণের অর্থরূপদর্শনলালসার নিবৃত্তি হয় না। আপাত দৃষ্টিতে, অর্থব্যয়ে কলিপ্রচলিত ব্যবহারিক বিদ্যাভ্যাসে অর্থের সদ্ব্যবহার-সমাধান প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, কলির বিদ্যাশিক্ষাপদ্ধতি ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন এবং তদ্দ্বারা

স্থূলেন্দ্রিয় সুখলাভোদ্দেশ্যে পরিচালিতা। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আশানুযায়ী অর্থোপার্জ্জনক্ষম না হইলে মনুষ্যত্বহীন বিবেচিত হন, ইহাই তাহার প্রমাণ। আবার প্রয়োজনানুযায়ী বিদ্যালাভান্তর, যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন-পটু হন, তাঁহারাও সাধারণ সাংসারিক নিয়মে স্থূলেন্দ্রিয়চর্য্যাভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে অর্থের ব্যবহার করেন না।

এইরূপে, মানসিক সদ্‌গুণরাজির পরিবর্ত্তে আহার-নিদ্রা-মৈথুন-বিলাস-সমারোহ সামাজিক-প্রতিপত্তির ভিত্তি স্বরূপ বিবেচিত হওয়ায়, কলিনরচরিত সম্বন্ধে ঋষিগণের ভাবী নির্দ্দেশ সম্পূর্ণরূপে ঘটনান্বিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে সাধুগণের অবধীরণ এবং দুর্জ্জনের প্রভাব অবশ্যম্ভবৎ। অর্থ ও বিলাসিতার মন্ত্র প্রভাবে কর্ম্মবৈলক্ষণ্যে বর্ণবৈলক্ষণ্য পরিগণিত হয় না। যে কর্ম্মে অর্থ ও বিলাসিতার সংস্থান হয়, মানবগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাহাতে ব্যাপৃত হয়। অর্থলাভ-কল্পে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করা স্বত্ত্বেও, বৃত্তিবিপর্য্যয়ে মানবসাধারণ দারিদ্র্যপ্রপীড়িত হইতেছে। পুরুষপরম্পরাগত বৃত্তিনিচয় পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যগণ নব নব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং কোনও ব্যবসায়েই উন্নতি সাধন করিতে পারে না। দৈন্য-জর্জ্জরিত হইয়াও, মনুজকুল বিলাসিতার স্বাদ গ্রহণে সমুৎসুক এবং বহিরাড়ম্বরে আভ্যন্তরিক অকিঞ্চনত্ব সমাচ্ছাদিত করিয়া, স্ফূর্ত্তি-চিহ্ন প্রদর্শনে সচেষ্ট। নরনারী অন্নাভাবক্লেশ সহ্য করিয়া, শীর্ণতনু বসন ভূষণে মণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করে এবং বিলাসসজ্জায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্ব-প্রদর্শন-প্রয়াসী হয়। অর্থকৃচ্ছ্রতা বাসনার বিঘ্নোৎপাদন করায়, মানবগণ সারহীন বাহ্য চাকচিক্যময় স্বল্পমূল্য দ্রব্যদ্বারা বিলাসিতার অর্চ্চনা করিতে বাধ্য হয়। এজন্য, কলিযুগে ব্যবহার-পাত্রের অবধারণ নাই। কাচ, অপবিত্র মৃত্তিকা এবং নানা-বিধ অপরিচ্ছন্ন কৃত্রিম ধাতুদ্বারা বহুবর্ণ সংযোগে যত প্রকার ভঙ্গশীল ক্ষণস্থায়ী অলঙ্কার পাত্র বিনির্ম্মিত হইতেছে, মানবগণ তৎসমস্তই সাগ্রহে ব্যবহার করি-তেছে। আভরণপরিচ্ছদব্যবহার সম্বন্ধেও, তুল্য বৈশৃঙ্খল আচরিত হয় এবং বিকৃতরুচিসম্মত এই সকল অকিঞ্চিৎকর পদার্থের আবির্ভাব হেতু মনুষ্যগণ সভ্যতা ও শিল্পোন্নতির ভূরিপ্রশংসা ও সাধুবাদ প্রদান করে। মানবের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে স্বল্পমূল্যমুদ্রানিচয়ের আবশ্যকতা সমুত্থিত হওয়ায়, নানাবিধ অপকৃষ্ট ধাতু ও হীন পদার্থ রাজমুদ্রার উপাদানস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূলেন্দ্রিয়বৃত্তি-তাড়নে পুরুষগণ স্ত্রীবশগ এবং নারীগণ নিরঙ্কুশা ও চঞ্চলা। এই সমস্ত কারণে মানবগণ খর্ব্বায়তন, অদীর্ঘজীবী, দুর্ব্বল ও অন্নগত-প্রাণ। উপবাসাদি কায়িক

ক্লেশ সহনে সামর্থ্যহীন হইয়াও, কলিকুহকচক্রে বিলাসিতার পশ্চাদ্ধাবনে তৎসমস্ত সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া, মানব দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করে; কিন্তু কৃত্রিম স্বস্থতা প্রদর্শন জন্য, ঘুণাক্ষরেও তাহা ব্যক্ত করে না।

ভারত ভূমে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যে জাতি সংসারাশ্রমে জ্ঞানালম্ব ও সুনীতি-প্রবর্ত্তক পরিগণিত হইতেন এবং যে জাতির নিষ্পাপাচরণানুসরণে সমাজ চরিত্র গঠিত হইত, কলির প্রারম্ভ হইতে সেই আদর্শ-জাতির ত্বরিত অধঃপতন হইতে লাগিল। বর্ণগুরু ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মণগণ কালপ্রভাবে, প্রায়শঃ, লোভপরবশ, বিলাসিতাপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিলেন। দ্বাপরের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণগণ সঙ্কর ও শূদ্রযাজী হইলেও, অনার্য্য জাতির যাজন স্বীকার করেন নাই। এই সকল ব্রাহ্মণের কেহ কেহ কলির প্রারম্ভে, অর্থলোভে অনার্য্যজাতিনিচয়ের পৌরোহিত্য অবলম্বন করিয়া হীনতর বর্ণব্রাহ্মণ পরিগণিত হইলেন। প্রথমতঃ জাতীয় বৃত্তিদ্বারা ধনলালসা ও বিলাসিতা চরিতার্থ করণা-ভিলাষে ইঁহারা ঈশ্বরোপাসনাপদ্ধতির দুরূহ জটিলত্ব নিষ্পাদন করিলেন। দ্বাপরা-পেক্ষা কলিযুগে পূজ্য দেবদেবী সংখ্যা ও প্রত্যেক পূজার উপচারাড়ম্বর অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইল। যাহাতে বিশেষরূপে ব্রাহ্মণে দান এবং ব্রাহ্মণসেবা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এইরূপ বহুব্রত-ক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইল। ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা লোকের ভক্তি আকর্ষণ করা অপেক্ষা, ব্রাহ্মণগণ, সাধারণতঃ আভি-জাত্য ও স্থূলবিদ্যা বলে নিম্নতর বর্ণগণের উপর প্রভুত্ব পরিচালন-প্রয়াসী হইলেন। দ্বাপর যুগে তত্ত্বদর্শী মহাজনগণ কর্ত্তৃক যে সকল জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রগ্রন্থ বিরচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণ জাতীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে, তৎসকলের অনেক বৈকৃত সাধন ও কদর্থ নিষ্পাদন করিলেন। বেদ, পুরাণ, সংহিতা, দর্শন, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র নিচয়ের বহু অংশ পরিবর্ত্তিত এবং কোনও কোনও অংশ পরিবর্জ্জিত হইল। এমন কি, জগতের পবিত্র ইতিহাস দ্বৈপায়নিক মহাভারতের অনেক বিবরণ উৎখাত এবং তৎ স্থানে নিকৃষ্ট রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। দ্বাপরের অনেক গ্রন্থ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়া কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। কালপদ্ধতি অনুসারে, ব্রহ্মবিদ্যাচর্চ্চায় জীবনযাত্রানির্ব্বাহের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহারিকবিদ্যার প্রচলন দ্বারা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ও খ্যাতিলাভে যত্নপর হইলেন। কালিদাস, ভবভূতি, বররুচি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, পাণিনি, বরাহ, মিহির,

ভাস্করাচার্য্য, খনা, লীলাবতী, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর এবং অন্যান্য বিদ্বান্ ও বিদুষীগণ, মনের নিয়ন্তর সঙ্গত গদ্য-পদ্য-সাহিত্য, ব্যাকরণ, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, পরিমিতি, ও জড়বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণগণ যেমন ব্রহ্মজ্ঞান-নির্ঝর ছিলেন, কলিযুগে ইঁহারা, সেইরূপ, ঐহিক বিদ্যার উৎসস্বরূপ হইলেন। এইরূপে স্থূলবিদ্যার প্রসার প্রতিষ্ঠা করিয়া, ব্রাহ্মণগণ বহুদিবস যাবৎ নিরুদ্বেগে যাজন ও অধ্যাপন ব্যবসায় পরিচালন করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যবহারিক বিদ্যাপ্রভাবে মানবমন যত বাহ্য পদার্থে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, যজন ক্রিয়ায়, ততই, মানবের বিতৃষ্ণা হইতে লাগিল। অবশেষে জীবিকার্জ্জন ও ধনলালসা পরিতৃপ্তি করণ জন্য, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে যাজনেতর নানা বৃত্তি আশ্রয় করিয়া, জাতীয় প্রতিভাবলে, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন। জীবন-সংগ্রামে জাতীয় বৃত্তিত্যাগী ব্রাহ্মণের সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ কলিযুগে ধর্ম্মাচার-ভ্রষ্ট ও ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হইয়াছেন।

তথাপি পরাবিদ্যার ছায়া ও হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বল অস্তিত্ব ভারতভূমে অদ্যাপি যাহা অনুভব করা যায়, ব্রাহ্মণগণই তাহার হেতু। ব্রহ্মজ্ঞানের অপসারণ ও হিন্দু ধর্ম্মের অবনতি-সাধন সুব্রাহ্মণগণের অভিপ্রেত ছিলনা। অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণগণও, প্রথমতঃ, উক্তজ্ঞান ও ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। স্বার্থসিদ্ধি-কল্পে পরমতত্ত্বের পরিবর্ত্তে স্থূলবিদ্যাবিস্তার ও ধর্ম্মব্যবহারের কৌটিল্য-পাদন করিতে বাধ্য হইয়াও, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যা ও সনাতন ধর্ম্মের মহিমা এককালীন বিস্মৃত হন নাই এবং পুরুষ পরম্পরায় ব্রাহ্মণ-গণের স্মৃতিগত হইয়া, তন্মাহাত্ম্য অদ্যাপি ক্ষীণভাবে ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের উল্লিখিত স্বার্থপ্রণোদিত পাপ-চেষ্টিত স্বত্বেও, তাঁহারা হিন্দুগণের ধন্যবাদার্হ। ফলতঃ, এতদুপকার-সাধন এবং সাংসারিক বিদ্যা-বুদ্ধির ঔৎকর্ষ নিবন্ধন, ব্রাহ্মণ জাতি এখনও তথাকথিত হিন্দুসমাজে আধিপত্য করিতেছেন।

ত্রেতা-প্রতিষ্ঠিত রাজধর্ম্ম দ্বাপরে একচতুর্থাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। কলি-যুগে উহা ততোধিক অপচিত হইয়া, অৰ্দ্ধ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। সাধারণতঃ, কলিনৃপতিকুল দ্বাপররাজবৃন্দ অপেক্ষা সমধিক স্থূলেন্দ্রিয়বিলাসপ্রিয় ও অর্থগৃধ্নু। তাঁহারা প্রজার্থ-শোষণে বিলাসিতা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কেহ

কেহ ধনলিপ্সাপরিতৃপ্তিকরণ জন্য, বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন। প্রজাপালন অপেক্ষা বাহু প্রতাপে কঠোর নিয়মে রাজ্য শাসন করাই কলিনৃপালগণ বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন। আবার বিভিন্ন দেশীয় নরপতিগণ বহুলরূপে পরস্পর বিদ্বেষী হওয়ায়, একদিকে যেমন কূট রাজনীতির প্রবল প্রসার হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক ভূপাল স্বীয় বাহু প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রভূত অর্থব্যয়ে সুচতুর কর্ম্মচারীদল, বিপুল সৈন্য ও অজস্র যুদ্ধাস্ত্র এবং সমর সজ্জা পোষণ করেন। প্রকৃতিবৃন্দের এই সকল ব্যয়-ভার বহন করিতে হয়। এজন্য কলিযুগে রাজস্বহার যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, তেমনি নানা প্রকার রাজশুল্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃতিপুঞ্জের দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ। রাজধর্ম্মাপচয়ে, রাজাগণ ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে ক্ষমতা পরিচালনে অশক্ত হওয়ায়, প্রজাকুল বিভিন্ন স্থানে, ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজ ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছেন। অধুনা, রাজনীতিবিদ্‌গণ রাজতন্ত্র, সীমাবদ্ধ রাজ-তন্ত্র বা ব্যবস্থা তন্ত্র ও সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র এই ত্রিবিধ লোকশাসনপদ্ধতির প্রচলন নির্দ্দেশ করেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রজাগণের রাজক্ষমতাত্মসাৎ-করণ-ক্রমানুসারে এই বিভাগত্রয় নিষ্পাদিত হই-য়াছে। কলিযুগে কোনও রাজা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতে পারেন না। সমাজধর্ম্মবিপর্য্যয়ে মানব প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তদ্ধেতু, পরিবর্ত্তনানুপাতে রাজাগণের রাষ্ট্র-শাসন কার্য্যে, অল্পাধিক পরিমাণে, প্রজাবর্গের ইচ্ছানুবর্ত্তন ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার, সাধারণ-তন্ত্র শাসন প্রণালীতে, প্রজাগণ যাঁহাকে শাসনকর্ত্তা মনোনীত করেন, যদিও তাঁহার অনেক পরিমাণে সাধারণের ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তথাপি তিনি, বাস্তব পক্ষে, রাজক্ষমতা পরিচালন করেন এবং লোকে তাঁহাকে যে সংজ্ঞায়ই অভিহিত করুক, তিনি রাজা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কারণ, পরম পিতা প্রকৃতি শাসন জন্য রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি যে কোনও উপায়ে এই কার্য্যে ব্রতী হন, তিনিই রাজা। অতএব, রাজতন্ত্র অপেক্ষা ব্যবস্থা-তন্ত্রে এবং তদপেক্ষা সাধারণ তন্ত্রে প্রজাগণ অধিক পরিমাণে রাজক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রজাকুল রাজধর্ম্ম-প্রতিপালন-পরাঙ্মুখ নৃপতির ব্যাপাদন করিলেও, রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া তৎপরিচালন-প্রয়াসী হন নাই। ত্রেতা যুগে রাজধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় এবং সমাজ ধর্ম্ম ত্রিচতুর্থাংশ বিদ্যমান ছিল। বেণ ও নহুষ রাজার দুইটী মাত্র কদুদাহরণ ব্যতীত, রাজাগণ সকলেই

ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। পক্ষান্তরে, প্রজাগণও ধর্ম্মপথ বিচ্যুত রাজার অপসারণ ভিন্ন, রাজক্ষমতার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। দ্বাপর যুগে রাজধর্ম্মের আংশিকাপচয় এবং সমাজ-ধর্ম্ম ত্রেতাপেক্ষা অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তথাপি কতিপয় বিরল দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে, রাজাগণ রাজ্য শাসনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতেন না এবং প্রজাগণ ধর্ম্মবিরোধী রাজাগণের বিনাশ ভিন্ন, রাজ ক্ষমতাত্মসাৎ-করণ-প্রবৃত্তি অন্তঃকরণে ধারণ করিতেন না। রাজধর্ম্ম সমাজ-ধর্ম্মের পরে উদ্ভূত হইয়া, উহার সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহা ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ব্যক্তিগণের অবিদিত ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, সাধারণের রাজ-ক্ষমতা পরিচালন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং তাহাতে নানাবিধ সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অদ্যাপি, ভারতের হিন্দুগণ এই ধারণার বশবর্ত্তী বলিয়া, হিন্দুগণের ন্যায় রাজভক্ত জাতি ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

কলিযুগে দ্বাপর-প্রতিষ্ঠিত সমর-ধর্ম্মের অধিক অপচয় হয় নাই। ফলতঃ, উহা ত্রিচতুর্থাংশ পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কাপট্য ও কাপুরুষাচরণ রণনীতি-সঙ্গত বিবেচিত হইয়া, সমর-ধর্ম্মের কলেবর কলুষিত করিলেও, আহবাহত ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যা-ব্যবস্থায়, বর্ত্তমান যুগে উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত রুধিরাক্তদেহ ভগ্নাঙ্গ মুমূর্ষু যোদ্ধৃবর্গ ভিষক্ চিকিৎসা ও ললনা-কর শুশ্রূষায় সন্তোষ লাভ করিয়া, এই কঠোর ধর্ম্ম মধ্যে অনির্ব্বচনীয় কোমলতা অনুভব করেন। এমন কি, বিপন্ন যোদ্ধাগণ শত্রুশিবিরে যেরূপ অকৃত্রিম আদর প্রাপ্ত হন, কলিযুগে সামাজিক ব্যবহারে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। বিপত্তির চরম সীমায় প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষীয় মানবগণ ক্ষণকালের জন্য বৈরভাব ভুলিয়া গিয়া, পরস্পরে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহাতে অকপট মনুষ্যত্ব প্রকটিত হয়।

আদ্যযুগোৎপত্তিগণনকালপূর্ব্বে, প্রজাপতিদশক যে প্রকারে মনুষ্যগণকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, তাঁহার উপাসনা, তাঁহাতে নির্ভর এবং তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই নরকুল পোষণ করে; সুতরাং, তাহাই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য বা প্রাকৃত ধর্ম্ম (ধৃ—পোষণ করা)। অথবা, পরম পিতা, তাঁহার সন্তানগণের অবলম্বন স্বরূপ, দেবশিক্ষকগণ দ্বারা, ইহ-সংসারে এক মহাধর্ম্মের প্রেরণা ও বিস্তার করিয়াছেন। যুগে যুগে বিস্মৃত্যাময়ে

এই সনাতন ধর্ম্ম ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া আসিতেছে। দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত, মহর্ষিগণ সতত ধর্ম্মের সুস্থতাপাদনতৎপর ছিলেন; পরন্তু সময়ানুসারে, যে পরিমাণ স্বাস্থ্যাধান আবশ্যক, ঋষিগণ তাহাতে অশক্ত হইলে, পরম পুরুষ স্বয়ং নরলোকে আসিয়া, ধর্ম্মের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সাধন করিতেন। দ্বাপরাবসান-প্রাক্কালে, এই বিশাল ধর্ম্ম যদিও তাদৃশ সবল ছিল না, তথাপি ইহা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, আর্য্যসভ্যতার সহিত সমন্ততঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কেননা, তত্তাবৎকাল মধ্যে জম্বুদ্বীপের অপরাপর সমস্তবর্ষ এবং অন্যান্য দ্বীপের কোনও কোনও বর্ষ সমৃদ্ধরূপে মানবাধ্যুসিত হইয়াছিল; সুতরাং ঐসকল বর্ষে ধর্ম্ম ও সভ্যতালোকেরও আবশ্যকতা সমুদ্ভূত হইরাছিল। যেমন ভূমণ্ডল-বেষ্টন-কারী একাম্বুধি মানবের দৃষ্টি-বৈষম্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মহাসাগর বিবেচিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ, কলিযুগারম্ভে, মানবান্তঃকরণের সঙ্কীর্ণতাহেতু, বিধাতৃ-প্রেরিত বিপুল ধর্ম্ম দেশভেদে পৃথগ্‌ বিচারিত ও নানা সংজ্ঞায় প্রখ্যাত হইল। তন্মধ্যে ভারতের হিন্দুধর্ম্ম, ইরাণের জোরোষ্ট্রীয় ধর্ম্ম এবং জুদিয়ার ইহুদীয় ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিবেচিত হইতে লাগিল। বৈদেশিকগণ সিন্ধুনদ-শোভিত ভারতের আর্য্যগণকে যেমন 'হিন্দুজাতি' আখ্যা দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা ইঁহাদের ধর্ম্মকেও 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিতেন। ভারতবাসীগণ গৌরবের সহিত এ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে তাঁহারা 'হিন্দু' শব্দের 'যিনি হীনকে দোষী বিবেচনা করেন, তিনি' এই অর্থ নিষ্পাদন করিলেন। পারস্য দেশের ধর্ম্মশিক্ষক জরাস্ত্র বা জোরোয়াস্তারের নামানুসারে, তথায় ধর্ম্মের নামকরণ সমাহিত হইয়াছিল। ইরাণ খণ্ডের উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী ভূভাগে, জুদা বা ইয়োহুদার বংশধরগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া, ধর্ম্মের এবং আপনাদিগের জুদীয় বা ইহুদীয় সংজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। আবার, প্রত্যেক মহাসমুদ্রগত সাগর নদ্যাদির ন্যায়, পৃথক্‌সংজ্ঞিত এই তিন প্রধান ধর্ম্মের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু শাখাপ্রশাখাও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মস্বরূপ মানব হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। চীনার বর্ষে হিন্দুধর্ম্ম পদ্ধতি অনুকৃতা হইলেও, চীনারীয়গণ আপনাদের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আরবীয়গণ ইহুদীয় ও জোরোষ্ট্রীয় ধর্ম্মের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিলেও, আরবীয় ধর্ম্ম উক্ত উভয় ধর্ম্ম হইতে পৃথক বিচারিত হইল। মিসরীয়গণ ইহুদীয়গণের নিকট হইতে ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়াও আপনাদিগকে এক ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অবধারিত করিলেন। চীনার, আরব ও মিসর দেশ হইতে ক্রমান্বয়ে

পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে যে যে ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তৎসমস্তও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম স্বরূপ গণিত হইল। অপিচ, প্রত্যেকদেশে, ঈষদ্‌ভিন্নধর্ম্মানুষ্ঠানপরম্পরা-পালনপর সম্প্রদায় সমূহের সমুত্থানে, পরস্পরের ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য বিভাবিত হইয়া, আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মবৈচিত্র্য সমাহিত হইয়াছিল।

এইরূপে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন সাংসারিক মানব-নেত্রে বহুধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। জ্ঞানীগণ উপলব্ধি করেন, প্রদীপ হইতে প্রদীপ পরম্পরা প্রজ্বালিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইলেও, যেমন দীপশিখানিচয়ের বস্তুব প্রভেদ সঞ্জাত হয় না, সেইরূপ, প্রজাপতিগণপ্রতিষ্ঠিত ভগবদ্‌প্রেমোদ্দীপক মহাধর্ম্ম হইতে, ক্রমান্বয়ে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা একদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্মতথ্য সকল পরিগৃহীত হইলেও বিভিন্ন স্থানীয় ধর্ম্মসূত্র নিকরের উদ্দেশ্য-বিভিন্নতা নাই। যেমন ভাষাভেদে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নামমালায় সমলঙ্কৃত হইলেও,তিনি এক, সেইরূপ, তৎপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লৌকিকক্রিয়াপদ্ধতি-মণ্ডিত হইলেও, উহা এক। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট স্বচ্ছাবরণ মধ্য দিয়া দীপালোক বিনির্গত হইলে, তাহাতে তত্তৎবর্ণের আরোপ করিয়া, দীপালোককে বিভিন্ন-বর্ণ অভিহিত করা হয়, সেইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আচারব্যবহার-পালিত ধর্ম্মে অনুষ্ঠান-পার্থক্য আরোপ করিয়া, ধর্ম্ম-পার্থক্য বিভাবিত হয়। যেরূপ বহুরূপী সরীসৃপ আবসভূত উদ্ভিদ্‌পত্রবর্ণে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচারে অবনদ্ধ হইয়া, আচারাভিধায় অবলিপ্ত হয়। যেহেতু, জীবশিক্ষাধান জন্য, ন্যায়বান বিধাতা আত্মশক্তি বিস্মৃতি-প্রলিপ্তা করিয়া, বিশ্বে ভেদ-বৈষম্যের সৃজন করিয়াছেন, অতএব, প্রাকৃতিক-ব্যাপার-বিভিন্নতার ন্যায়, লৌকিক আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা অনিবার্য্য। সুতরাং, বিভিন্ন স্থানে আচারগত বহুবিধ বৈধধর্ম্মের অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধা। জ্ঞান-দর্শন ও অজ্ঞান-দর্শন মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীগণ যেমন এক ঈশ্বর বহু হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নানারূপে, আকারে ও ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা দৃঢ়রূপে ধারণাপূর্ব্বক, যাবতীয় ভেদাভ্যন্তরে একতা ও সমতা অবলোকন করেন,অজ্ঞানীগণ সেরূপ করিতে পারে না; পরন্তু, কেবল মাত্র বাহ্যভেদাকৃতিনিচয় দৃষ্টিগোচর করে। জ্ঞানীগণ বৈধধর্ম্ম-রাজীর একাভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তৎসকলেরই সমাদর করেন, প্রত্যুত অজ্ঞানীগণ বাহ্যাচার নিচয়কে বিভিন্ন ধর্ম্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, পরস্পর আপনাপন ধর্ম্ম সত্য ও অপরাপর ধর্ম্ম মিথ্যা, এইরূপ ধারণাবশবর্ত্তী হয়। যিনি ধর্ম্মস্রষ্টা, তাঁহার বিধানে নানা স্থানে নানা বৈধ ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে;

সুতরাং যে স্থলে যে বৈধধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তাহা তথায় সম্পূর্ণ সঙ্গত, জ্ঞানীগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, পরমানন্দ অনুভব করেন। পক্ষান্তরে, বৈষম্যদর্শী অজ্ঞানীগণ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়া, সংসারে কলহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করে। মোহবশতঃ, বিভিন্ন বৈধধর্ম্মাবলম্বী জাতি বা সম্প্রদায় সমূহ স্ব স্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও অপরাপর ধর্ম্মের হীনতাপাদনপ্রয়াসী হয় এবং বাহ্যাচারসমারোহ ও পরধর্ম্ম বিকথনে তদুদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে, এই সকল অধর্ম্ম্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া, ধর্ম্মগ্লানি উৎপাদন করে।

বিস্মৃতির প্রবলপ্রভাবমণ্ডিত কলিযুগে, মানবের বিবিধ কলুষাচরণজনিত ধর্ম্মবিপর্য্যয় নিবন্ধন, তাপহারী দয়ার্দ্র ভগবান বারম্বার নরদেহ ধারণ করিয়া, মর্ত্ত্যধামে বিচরণ ও লীলা সম্পাদন করিয়াছেন ও করিবেন। কারণ, তিনি মানবজাতিকে যে পরম পবিত্র মধুর আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সার্থক :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা। চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বর স্বয়ং সত্য; সুতরাং তাঁহার বাক্য তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন। ঈশ্বর স্বয়ং সিদ্ধি, সুতরাং তাঁহার কোনও অভিলাষ অসম্পূর্ণ থাকে না। পুনশ্চ, সর্ব্বশক্তিমান পিতা ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য তাঁহার মূঢ় সন্তানগণের মধ্যে আসিয়া, জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে তাহাদের সম্মুখে এই মহোপদেশ স্থাপিত করেন যে, ধর্ম্মসংস্কার বা ধর্ম্মবিস্তার একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় সমাহিত হয়; উহাতে মনুষ্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। মানবগণ, তাঁহার অনুজ্ঞাব্যতিরেকে, যে ধর্ম্মসৃষ্টি, সংস্কার বা বিস্তার করিবার কল্পনা ও চেষ্টা করে, তাহা তাহাদের ভ্রান্তি এবং তাহা কদাচ সুফলবতী হয় না; প্রত্যুত, সংসারে সমূহ অনিষ্ট পরম্পরা প্রসব করে।

সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে, যে দেশ হইতে পৃথিবীর অপরাপর সমস্তদেশ ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কালচক্রাঙ্কিতঅগণ্যচিহ্নশোভিত ভারতবর্ষে, দ্বাপরশেষার্দ্ধে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়াভ্যুত্থানের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, কলির প্রথমভাগে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পণ্ডিতগণ স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে,

ধর্ম্মশাস্ত্র নিচয়ের ভাবান্তর সাধন ও কূটার্থ নিষ্পাদন করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মমত প্রচার এবং প্রত্যেকে স্বকীয় মতের প্রাধান্য স্থাপন জন্য, শিষ্যানুচরবর্গ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যদিও ঈশ্বর এবং দেবদেবী-পূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তথাপি উভয় পূজামধ্যে বিশেষ পার্থক্য রক্ষিত হইত। যেমন প্রজাকুল বিভিন্ন ভাবে রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণের পূজা করেন, সেইরূপ, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ভারতীয় আর্য্যগণ বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টদেবদেবীগণের স্বরূপাবগত থাকিয়া, ভজনানন্দে জগৎস্বামীর এবং শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচারসহ শ্রেষ্ঠজীব দেবদেবীগণের অর্চ্চনা করিতেন। কলিযুগে ঐহিক-সমৃদ্ধি প্রতি মানবমন যত প্রবলবেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণগণ তত সিদ্ধিদাতা দেব ও বরদায়িনীদেবীগণের অস্তিত্ব এবং বহূপচারে তাঁহাদের পূজন-ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। ভারত-ভূমির সর্ব্বত্র বিভিন্ন দেবদেবী-পূজক বহুসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল এবং ইহারা সারাৎসারকে ভুলিয়া, স্ব স্ব উপাস্য দেবতার প্রতাপ কীর্ত্তনে পরস্পর কলহে ব্যাপৃত হইল। আর্য্য ব্যবহারের সহিত অনার্য্যব্যবহার নিচয়ের সংমিশ্রণে, সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম্যানুষ্ঠান অবকরময় ও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্থূলেন্দ্রিয়পিপাসাপরিচালিত পাপচেষ্টায়, দৈব-সাহায্যে সাফল্য লাভ করণ দুরাশায়, অবিদ্যাগ্রস্ত মানবগণ সমারোহ সহকারে নবাবিষ্কৃত দেবতাগণের পূজায় নিতরাং আবিষ্ট হইল। পরন্তু, পুরাপ্রবর্ত্তিত ঈশ্বর ও দেব পূজন বিধির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সাধারণতঃ, পূজান্তে উপাস্য দেবতার নিকট কল্পিতসাংসারিকসুখের নিদানভূত ধন, মান, যশঃ, বিদ্যা প্রভৃতি বস্তু যাচিত হইত।

বারাণসীর উত্তরে অপি নেপালের দক্ষিণে গৌতম নরপতিগণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সুন্দর কপিলবস্তু নগর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিপ্লব কালে রাজা শুদ্ধোদন গৌতম রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। জনকোলাহলময়ী ঋদ্ধিশালিনী পুরাতনী কাশীনগরীর তুলনায়, ক্ষুদ্র কপিলবস্তু নগরের শান্তিশ্রী পরম রমণীয়া প্রমিতা হইত। কারণ, একদিকে বারাণসী যেমন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আশ্রয়ীভূতা হইয়া, অনুদিন মীমাংসারহিত ন্যায়তর্ক ও তন্ত্রবিচার গর্জ্জনে নিনাদিতা হইত, অন্যদিকে কপিলবস্তু, তেমনি, মহারাজ শুদ্ধোদন, রাজমহিষী মহামায়া, অমাত্যবর্গ ও প্রজাকুলের মধুর ঈশ্বরীয় প্রেমালাপনে সতত মুখরিত থাকিত। অনেক বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া, শুদ্ধোদন ও মহামায়া ভক্তিভরে ভগবানের

নিকট অপত্য প্রার্থনা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহারা এক সর্ব্ব-সুলক্ষণযুত পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। নবজাত শিশু শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং তনয়লাভে আপনাদের তপস্যার অর্থ সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, রাজদম্পতি পুলকিতান্তঃকরণে, যথাসময়ে, পুত্রের 'সিদ্ধার্থ' নামকরণ করিলেন। ফলতঃ, সুতরূপে যে কি মহাধন তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং শিশুদ্বারা যে কতবৃহৎ অর্থ সিদ্ধ হইবে, হর্ষ ও স্নেহাবেগে শুদ্ধোদন ও মহা-মায়া তৎকালে তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়াও, বিধাতৃ-বিধানে তনয়ের যথার্থনামকরণ করিয়াছিলেন। কারণ, সর্ব্বশক্তিমান পিতা তাঁহার সত্যবাক্যের অর্থ সিদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহাদের পুত্ররূপে নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সাহচর্য্যদ্বারা জীবের মঙ্গল বিধান জন্য, দয়াময় ভগবান জীবধর্ম্মান্বিত হইলেন এবং জীবের প্রকৃষ্ট গুণরাজি তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কুমার সিদ্ধার্থ প্রথম বাল্যবয়সে দয়া, সংযম, সহানুভূতি, জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার এরূপ উদাহরণমালা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিচক্ষণ সংসারী ও প্রবীণ সন্ন্যাসী-গণও তত্তৎ অনুকরণীয় বিবেচনা করিতেন। জীবদুঃখে রাজকুমারের অন্তঃ-করণ তরল হইয়া যাইত; আবার সংসারের অপায়-নিবারণ-চিন্তায় তাঁহার চিত্তৈকাগ্রতা সমাহিত হইত। এবম্বিধ মানসিক দ্রবণদ্রঢ়িমা সমাবেশে, এই অদ্ভুত বালচরিত্রের অনুপম মাহাত্ম্য প্রকটিত হইত। বালাভিজ্ঞ পুত্রের সাংসার-নির্লিপ্ততা দেখিয়া, রাণী মহামায়া ও গৌতমরাজ চকিত ও অবসন্ন হইলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন নন্দনের সংসারানুরাগোদ্দীপন মানসে, রাজধানীতে অহোরহঃ উৎসবামোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ও যাহাতে রাজকুমারের সম্মুখে কোনও বিষাদময় দৃশ্য উপস্থিত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে প্রজাগণের সম্পূর্ণ সতর্ক হওয়ার বিশেষাদেশ রাজ্য মধ্যে প্রচার করিলেন। বাৎসল্যপ্রবণা মহামায়া, ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপগুণবতী কুমারীর সহিত রাজকুমারকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থের কৈশোর বয়সে, দণ্ডপাণি শাক্যদুহিতা গোপা তৎকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া যশোধারা হইলেন। কেননা, মর্ত্ত্যধামে ভগবানের সহিত সংযুক্তা হওয়ায়, স্বভাবতঃ, ধন্যা গোপাধনীর উপর যশোবর্ষণ হইতে লাগিল। অপিচ, এই শুভ পরিণয়ে, ভাগ্যবতী মহামায়ার আন্তরিক অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল। যেহেতু, পৃথিবী মধ্যে, তৎকালে, এক-মাত্র যশোধারা পরম গুণশালিনী ছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি সিদ্ধার্থে মিলিতা হইতে শক্তা হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনবৎ অমানুষিক কর্ম্মনিষ্পাদনার্থ নররূপে ভূতলে আবির্ভূত হইলেও, সর্ব্বনিয়ন্তা তৎসমাধানে মানবীয় বৈধধর্ম্মের সীমাতিক্রম করেন না। কারণ, তৎপ্রদর্শিত মহদ্দৃষ্টান্তানুসরণে, মানব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। সুতরাং, করুণানিধান সংসারে এবম্ভূত উদাহরণ স্থাপিত করেন, যদনুসরণ মানবক্ষমতা-সাধ্য। মায়াতীত সিদ্ধার্থ, শুদ্ধোদন ও মহামায়ার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায়, সাংসারিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সংস্থান করিলেন। পরন্তু, পুত্র জন্মানন্তর সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধার্থের যাবতীয় ঐহিক বন্ধন ছেদন ও সন্ন্যাসাবলম্বনানুষ্ঠানে সংসারে ত্যাগস্বীকার ও জ্ঞানলিপ্সার প্রদীপ্তোদাহরণ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। সতীত্ব ও পাতিব্রত্য প্রতিমূর্ত্তি যশোধারার পাণিগ্রহণাবধি রাজকুমার সিদ্ধার্থ তৎপ্রতি বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন এবং বিধাতৃ-বাঞ্ছায় তাঁহাদের এমন একটী রম্যদর্শন পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল, মহারাজ শুদ্ধোদন আক্ষেপভরে যাহার 'রাহুল' নামকরণ করিয়াছিলেন। কারণ, এই পূর্ণশশধর সদৃশ কুমার শৈশবে পিতৃত্যক্ত হইয়া, বিষাদরূপ রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। পূর্ণ যৌবনে, সংসার বন্ধনজাল যখন সিদ্ধার্থের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন, তিনি তাহার কর্ত্তন এবং অবিকত্থনীয় জনকজননী-দারাপত্য ও রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আদর্শ ধর্ম্মবীরের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়াছিলেন।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব সিদ্ধার্থের স্বভাববুদ্ধত্ব অবগত হইতে পারে নাই। সাধনা-বলে জ্ঞানলাভের উদাহরণ প্রবর্ত্তনোদ্দেশ্যে, সিদ্ধার্থও তদ্বিষয় তাহাদের বিদিত হওয়ার অবসর প্রদান করেন নাই। গয়ারণ্যে তাপসজীবন যাপনে ষড়্বর্ষকাল জীবমঙ্গল সম্বন্ধীয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, অবশেষে, সিদ্ধার্থ যখন আপনাকে বুদ্ধ বা বিজ্ঞানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সমারোহ-প্রিয় মনুষ্যগণ তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল এবং উপদেশ গ্রহণ জন্য দলে দলে তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। ভগবান আত্মপরিচয় প্রদানে এইরূপ উক্তি করিলেন :—'যুগে যুগে যে সকল বুদ্ধ ধরাতলে আবির্ভূত হন, আমি তাঁহাদেরই একজন। বুদ্ধগণ একসত্যধর্ম্মমত শিক্ষাদান করেন। প্রত্যেক বুদ্ধের তিরোধানান্তর, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিয়ৎকাল সতেজে বর্দ্ধিত হয়; পরে তাহার অধঃপতন হইতে থাকে এবং পরিশেষে উহা বিস্মৃতি নিমজ্জিত হইয়া যায়। পুনরায়, পরবর্ত্তী বুদ্ধ আসিয়া বিস্মৃতি-কবলিত ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর, মৈত্রেয় বুদ্ধ যথাকালে ভূমণ্ডলে

আবির্ভূত হইবেন।' সিদ্ধার্থের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়, যে পঞ্চব্রাহ্মণযুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুকাল তৎসহ অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের সন্ধানার্থ, বুদ্ধ যৎকালে বারাণসী গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত এক পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। পরিচিত ব্যক্তি সিদ্ধার্থকে তাঁহার গন্তব্যস্থান ও গমনোদ্দেশ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বুদ্ধ এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন,—'ন্যায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, তিমিরাবৃত মনুষ্যগণকে আলোক প্রদান করিতে এবং মানবের জন্য অমরত্বের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে, আমি এক্ষণে কাশীনগরীতে গমন করিতেছি।' বুদ্ধ সিদ্ধার্থ নিজাবস্থার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :—'আমি সর্ব্ববিধ মন্দ বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছি। ভৌতিক জীবনের সহিত আমার আর কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবল মানবগণকে সত্যধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য, ঈশ্বর-ভাবানুপ্রাণিত হইয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি।"

সরিৎ যেমন সিন্ধুপানে ধাবিত হয়, সেইরূপ জীব ভগবানে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ন্যায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, অন্ধকারাচ্ছন্নজনগণের আলোকদাতা, মুক্তির দ্বারোন্মোচয়িতা, নির্ব্বাণ বা সমাধি প্রাপ্ত হইয়াও লোকশিক্ষাহেতু নরদেহধারী বুদ্ধের উপদেশরত্নলাভাশায়, মানবস্রোতঃ অবিরাম তৎপ্রতি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদীয় পূতবাণীধারণক্ষম ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তৎ পদাশ্রয় করিলেন এবং নিজ দেহাত্যয়ে মানব জাতিকে অকাতরে বিতরণ করিবার জন্য, ভগবান বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত মহাশিক্ষা সকল শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন : (১) জীবন দুঃখবিবর্জ্জিত হইতে পারে না। (২) স্বর্গ বা মর্ত্ত্য সর্ব্বত্র, বাসনা ও কামনাহেতু সর্ব্ববিধ জীবের জন্ম হয়। (৩) বাসনাবিনাশ ব্যতীত, জন্মপরিগ্রহ নিরাকরণের উপায়ান্তর নাই। (৪) নির্ব্বাণ প্রাপ্তির চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা বাসনা বিনাশ হয়। (ক) চিত্তোন্মেষসাদন। (খ) অন্তঃকরণ হইতে অপবিত্র কামনা ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বিদূরিত করণ। (গ) যাবতীয় অসদভিলাষ, অজ্ঞান, সংশয়, ধর্ম্মবিকথন, নিষ্ঠুরতা ও অসাচ্ছন্দ্য হইতে আত্মবিমোচন। (ঘ) ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন। যিনি এতদূর মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দশায় উপনীত হন। পাপ, কামনা ও অবিদ্যা-পাশ ছেদন করিয়া, তিনি পুনর্জন্মজাল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। মুক্তি তাঁহার করগতা হয়। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অতীত এবং ভবিষ্যতের আবরণ ভেদ করিয়া, সর্ব্বত্র সঞ্চরণক্ষমা হয়। তিনি ভৌতিকজীবননিয়মপারে গমন

ধর্ম্মসংস্থাপনবৎ অমানুষিক কর্ম্মনিষ্পাদনার্থ নররূপে ভূতলে আবির্ভূত হইলেও, সর্ব্বনিয়ন্তা তৎসমাধানে মানবীয় বৈধধর্ম্মের সীমাতিক্রম করেন না। কারণ, তৎপ্রদর্শিত মহদ্দৃষ্টান্তানুসরণে, মানব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। সুতরাং, করুণানিধান সংসারে এবম্ভূত উদাহরণ স্থাপিত করেন, যদনুসরণ মানবক্ষমতা-সাধ্য। মায়াতীত সিদ্ধার্থ, শুদ্ধোদন ও মহামায়ার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায়, সাংসারিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সংস্থান করিলেন। পরন্তু, পুত্র জন্মানন্তর সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধার্থের যাবতীয় ঐহিক বন্ধন ছেদন ও সন্ন্যাসা-বলম্বনানুষ্ঠানে সংসারে ত্যাগস্বীকার ও জ্ঞানলিপ্সার প্রদীপ্তোদাহরণ প্রতিষ্ঠা-পিত হইল। সতীত্ব ও পাতিব্রত্য প্রতিমূর্ত্তি যশোধারার পাণিগ্রহণাবধি রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ তৎপ্রতি বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন এবং বিধাতৃ-বাঞ্ছায় তাঁহাদের এমন একটী রম্যদর্শন পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল, মহারাজ শুদ্ধোদন আক্ষেপভরে যাহার 'রাহুল' নামকরণ করিয়াছিলেন। কারণ, এই পূর্ণশশধর সদৃশ কুমার শৈশবে পিতৃত্যক্ত হইয়া, বিষাদরূপ রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। পূর্ণ যৌবনে, সংসার বন্ধনজাল যখন সিদ্ধার্থের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন, তিনি তাহার কর্ত্তন এবং অবিকথনীয় জনকজননী-দারাপত্য ও রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আদর্শ ধর্ম্মবীরের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়া-ছিলেন।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব সিদ্ধার্থের স্বভাববুদ্ধত্ব অবগত হইতে পারে নাই। সাধনা-বলে জ্ঞানলাভের উদাহরণ প্রবর্ত্তনোদ্দেশ্যে, সিদ্ধার্থও তদ্বিষয় তাহাদের বিদিত হওয়ার অবসর প্রদান করেন নাই। গয়ারণ্যে তাপসজীবন যাপনে ষড়্ বর্ষকাল জীবমঙ্গল সম্বন্ধীয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, অবশেষে, সিদ্ধার্থ যখন আপনাকে বুদ্ধ বা বিজ্ঞানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সমারোহ-প্রিয় মনুষ্যগণ তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল এবং উপ-দেশ গ্রহণ জন্য দলে দলে তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। ভগবান আত্মপরিচয় প্রদানে এইরূপ উক্তি করিলেন :—'যুগে যুগে যে সকল বুদ্ধ ধরাতলে আবির্ভূত হন, আমি তাঁহাদেরই একজন। বুদ্ধগণ একসত্যধর্ম্মমত শিক্ষাদান করেন। প্রত্যেক বুদ্ধের তিরোধানান্তর, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিয়ৎকাল সতেজে বর্দ্ধিত হয়; পরে তাহার অধঃপতন হইতে থাকে এবং পরিশেষে উহা বিস্মৃতি নিমজ্জিত হইয়া যায়। পুনরায়, পরবর্ত্তী বুদ্ধ আসিয়া বিস্মৃতি-কবলিত ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর, মৈত্রেয় বুদ্ধ যথাকালে ভূমণ্ডলে

আবির্ভূত হইবেন।' সিদ্ধার্থের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়, যে পঞ্চব্রাহ্মণযুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুকাল তৎসহ অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের সন্ধানার্থ, বুদ্ধ যৎকালে বারাণসী গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত এক পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। পরিচিত ব্যক্তি সিদ্ধার্থকে তাঁহার গন্তব্যস্থান ও গমনোদ্দেশ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বুদ্ধ এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন,—'ন্যায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে, তিমিরাবৃত মনুষ্যগণকে আলোক প্রদান করিতে এবং মানবের জন্য অমরত্বের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে, আমি এক্ষণে কাশীনগরীতে গমন করিতেছি।' বুদ্ধ সিদ্ধার্থ নিজাবস্থার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :—'আমি সর্ব্ববিধ মন্দ বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছি। ভৌতিক জীবনের সহিত আমার আর কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবল মানবগণকে সত্যধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য, ঈশ্বরভাবানুপ্রাণিত হইয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি।"

সরিৎ যেমন সিন্ধুপানে ধাবিত হয়, সেইরূপ জীব ভগবানে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ন্যায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, অন্ধকারাচ্ছন্নজনগণের আলোকদাতা, মুক্তির দ্বারোন্মোচয়িতা, নির্ব্বাণ বা সমাধি প্রাপ্ত হইয়াও লোকশিক্ষাহেতু নরদেহাধিষ্ঠাতা বুদ্ধের উপদেশরত্নলাভাশায়, মানবস্রোতঃ অবিরাম তৎপ্রতি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদীয় পূতবাণীধারণক্ষম ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তৎপদাশ্রয় করিলেন এবং নিজ দেহাত্যয়ে মানব জাতিকে অকাতরে বিতরণ করিবার জন্য, ভগবান বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত মহাশিক্ষা সকল শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন : (১) জীবন দুঃখবিবর্জ্জিত হইতে পারে না। (২) স্বর্গ বা মর্ত্ত্য সর্ব্বত্র, বাসনা ও কামনাহেতু সর্ব্ববিধ জীবের জন্ম হয়। (৩) বাসনাবিনাশ ব্যতীত, জন্মপরিগ্রহ নিরাকরণের উপায়ান্তর নাই। (৪) নির্ব্বাণ প্রাপ্তির চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা বাসনা বিনাশ হয়। (ক) চিত্তোন্মেষপাদন। (খ) অন্তঃকরণ হইতে অপবিত্র কামনা ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বিদূরিত করণ। (গ) যাবতীয় অসদভিলাষ, অজ্ঞান, সংশয়, ধর্ম্মবিকথন, নিষ্ঠুরতা ও অসাচ্ছন্দ্য হইতে আত্মবিমোচন। (ঘ) ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন। যিনি এতদূর মানসিক ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন, তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দশায় উপনীত হন। পাপ, কামনা ও অবিদ্যাপাশ ছেদন করিয়া, তিনি পুনর্জ্জন্মজাল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। মুক্তি তাঁহার করগতা হয়। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অতীত এবং ভবিষ্যতের আবরণ ভেদ করিয়া, সর্ব্বত্র সঞ্চরণক্ষমা হয়। তিনি ভৌতিকজীবননিয়মপারে গমন

করেন এবং ক্ষণস্থায়ী ঐহিকজীবনের অবসানে, তিনি জন্ম ও আনুষঙ্গিক রোগমরণ হইতে চিরমুক্ত হন।

বিশ্ববেদাঃ বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রীতিমান্ প্রিয়ম্বদ বুদ্ধ শিষ্যগণসহ ভারতের নগর ও জনপদ নিচয়ে গমন করিয়া, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানবগণকে সত্যধর্ম্ম সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সংসার-তাপদগ্ধ মনুষ্যগণ ভগবানের দর্শন ও তদীয় সুভাষিত ধর্ম্মবচনামৃত পান করিয়া, তৃপ্ত, পবিত্র ও ধন্য হইলেন। বিনিগমক বুদ্ধ যৎকালে কপিলবস্তুর অনতিদূরে ধর্ম্মশিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্ররূপী ভগবানকে কপিলবস্তু নগরে আনয়ন করিবার জন্য, তাঁহার নিকট গমন করেন। সুনীতি-প্রসাধক বুদ্ধ পিতৃনিদেশে জন্মস্থানে আগমন করিলেন; কিন্তু রাজপ্রাসাদে বসতি না করিয়া, সশিষ্য নগরোপকণ্ঠে তরুতলে অবস্থিত হইলেন। ভিক্ষুবুদ্ধ ভিক্ষাগ্রহণে রাজবাটীতে সমাগত হইলে, অপরূপ দৃশ্য সংঘটিত হইল। জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধ যৎকালে শিষ্যগণসহ রাজভবনের বহির্ভাগে ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, পুণ্যবতী যশোধারা, সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া, দ্বিতল প্রকোষ্ঠের বাতায়নান্তরাল হইতে বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপরাশি সম্ভোগ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে, বিভুসুত সপ্তম বর্ষীয় রাহুল জননীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাতঃ! শুনিলাম, পিতা আসিয়াছেন এবং তিনি ঐ সকল সন্ন্যাসীর সহিত আহার করিতেছেন। আমার পিতা কে? পিতা আমাদের সহিত আহার না করিয়া, সন্ন্যাসীগণের সহিত খাইতেছেন কেন? পিতা আমাকে ক্রোড়ে করিতেছেন না বা আমার সহিত কথা কহিতেছেন না কেন? আমি পিতার নিকট হইতে এমন একটী উত্তম বস্তু গ্রহণ করিব, যাহা আর কাহারও নাই।' স্নেহময়ী যশোধারা অশ্রুজল সম্বরণ ও স্বামীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, পুত্রকে কহিলেন, 'বৎস রাহুল! ঐ যে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ অথচ চন্দ্রের ন্যায় রম্যদর্শন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও বলিষ্ঠকায় মহাপুরুষ মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, উনিই তোমার পিতা। আমরা ভাল ভাবিয়া, যে সমস্ত মন্দ বস্তু ভক্ষণ করি, উনি সে সকল অপবিত্র দ্রব্য আহার কিম্বা শুদ্ধাচার লোক ভিন্ন অপর কাহারও সংসর্গে পান ভোজনাদি কার্য্য করেন না। এজন্য, ইনি আমাদের সহিত খাদ্যগ্রহণ করিলেন না। ইনি, পিতামাতা স্ত্রীপুত্রের মায়াচ্ছেদ করিয়া সমস্ত মন পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন; এজন্য তোমার প্রতি ইঁহার

মনোযোগ নাই। ইনি অমূল্য ও অক্ষয় ধনে ধনী। পুত্রের অধিকার বলে, তুমি তোমার পিতার নিকট গিয়া, উৎকৃষ্ট রত্ন যাচ্ঞা কর।' মাতা কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া, বালক রাহুল তৎক্ষণাৎ বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বাভাবিক সুধাসিক্ত স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পিতঃ! আমাকে একটী উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করুন।' সমবেত জনমণ্ডলী কুমারের কান্তি ও ওজস্বিতায় বিমুগ্ধ হইলেন এবং ভগবানের উত্তরাকর্ণন করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সৌম্যবুদ্ধ কোনও প্রকার বাঙ্‌নিষ্ক্রামণ করিলেন না। অতঃপর, সেই দিবস যে অল্প সময় বুদ্ধ রাজবাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, রাহুল ক্ষণমাত্রও পিতৃসামীপ্য পরিত্যাগ করেন নাই এবং প্রভু যৎকালে তাঁহার তরুতলাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন, সুমতি রাহুলও তাঁহার অনুসরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, ভাবগ্রাহী বুদ্ধ মধুর সরল ভাষায় রাহুলের নিকট ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, পবিত্র বটবৃক্ষমূলে তাঁহাকে ভিক্ষুবেশ প্রদান করিলেন এবং রাহুল পিতৃদত্ত উপহার লইয়া, প্রীতিগদ্‌গদচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভানূদয়ে কুজ্ঝটিকা যেরূপ রবিকরবিলীন হইয়া যায়, শুদ্ধোদন, মহামায়া ও যশোধারার দৃষ্টিপথে বাসনার যে ক্ষীণাস্তরায় বিদ্যমান ছিল, রাহুলের ভিক্ষুসজ্জাদৃশ্যে, তাহাও সেইরূপ বিলুপ্ত হইয়া গেল। সিদ্ধার্থের পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন এবং তন্মুহূর্ত্ত হইতে, আর শুদ্ধোদন আপনাকে সিদ্ধার্থের পিতা, মহামায়া আপনাকে সিদ্ধার্থের মাতা, যশোধারা আপনাকে সিদ্ধার্থের স্ত্রী এবং রাহুল আপনাকে সিদ্ধার্থের পুত্র বিবেচনা করিতে পারিলেন না; পরন্তু, তাঁহারা সকলেই শ্রীবুদ্ধে মিলিত এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান করিলেন। সংসারজীবনে, তাঁহারা যে সামাজিক ও সাম্পর্কিক উপাধি মালায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের কৌতুকক্রীড়া স্বরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত বিভূতির অধিকারী, পরিচ্ছিন্নতার নিয়ামক, ন্যায়বান ভগবান অবতাররূপে ভূতলে আবির্ভূত হইয়া, ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশ্যে মানবসাধারণের বিশ্বাসোদ্দীপনার্থ যে পরিমাণ প্রভাব-প্রকাশ আবশ্যক, তদতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন না। সংসারে, মনুষ্যে যতদূর বীরত্ব সম্ভবপর, দ্বাপরবীরগণের তাহা ছিল। এই হেতু, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণাবতারে দ্বাপরিক জনগণের বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ কল্পে, গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবতারিক কার্য্য অসাধারণ হইলেও অলৌকিক নহে। কারণ,

পরমপিতা লোকশিক্ষা হেতু অবতাররূপে আবির্ভূত হন, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং, ভগবান অবতাররূপে কোনও অলৌকিক কার্য্য সাধন করেন না। গোবর্দ্ধন ধারণের স্থায় কার্য্য সাধারণ মানবের ক্ষমতাতীত হইলেও, যোগবলে মনুষ্যগণ ওরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। ঈশ্বর যে বৈধধর্ম্ম মানবকে প্রদান করিয়াছেন, তাহার শুশ্রূষার জন্যই তিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। সুতরাং অবতার-কার্য্যে, মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস সমুদিত হওয়া ব্যতীত, বৈধধর্ম্মের সীমা কোনও রূপে অতিক্রান্তা হয় না। বুদ্ধাবতারে ভগবান লোকাচরণীয় সৎ প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও আদর্শ সুকার্য্য নিচয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। পঞ্চমবর্ষীয় সিদ্ধার্থ উদ্যানে দেবদত্ত-শরাহত সারসগাত্র হইতে বাণোত্তোলন ও সন্তত শুশ্রূষাদ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়া যে অসামান্য করুণাকৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সাংসারিক-মানব-ক্ষমতা-সাধ্য। অপত্যশোকাতুরা রমণী যখন মৃতশিশু-পুত্রশব স্কন্ধে লইয়া, বুদ্ধের নিকট আসিয়া, বিগতপ্রাণ তনয়কে পুনর্জীবিত করার ঔষধ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন, বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞাননেত্রোন্মীলন জন্য, তাঁহাকে অঘটিতলোকমরণগৃহস্থবাটী হইতে এক মুষ্টি সর্ষপ আনিবার আদেশ দিয়া, বিজ্ঞানী মনুষ্যের স্থায় কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্ঞানীগণ যেমন ভগবদ-বতারে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, অবিদ্যাগ্রস্ত সংশয়াচ্ছন্ন জনসাধারণ সেরূপ করিতে পারে না। ঈশ্বর অবতাররূপে এরূপ প্রভাব বিস্তার করেন, যাহাতে সাধারণ মানব হৃদয়াকর্ষক অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিয়া, ভক্তি ও বিস্ময় ভরে অবতার-বাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে।

বুদ্ধাবতারে অশীতিবর্ষকাল নরদেহে বিরাজ করিয়া, ভগবান ধর্ম্মসংস্কার ও তাহার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায়, ভারতবর্ষে তৎসংস্কৃত ধর্ম্মের প্রভাব উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহাবসানে তাঁহার শিষ্যবর্গ, তদীয় আদেশানুসারে, তুরাণদেশে ভগবদ্‌প্রোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সকল প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তুরাণীয়গণ অচিরে সত্যধর্ম্মমহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কুসংস্কার-পাশ-বিমুক্ত হইলেন। ধর্ম্মবৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে, কতিপয় শতাব্দী মধ্যে, বুদ্ধের উপদেশমালা কালের অধঃস্তরে নিপতিত হইল; কিন্তু বিস্মৃতি-নিদিগ্ধ হইয়াও, বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব অদ্যাপি তিব্বত, শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে অবস্থিতি করিতেছে।

বুদ্ধের তিরোধানান্তর, পঞ্চশত বর্ষকাল গত হইবা মাত্র, আসিয়া মহাদেশের

অন্তর্গত কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিম এবং আধুনিক আরব ও পারস্য দেশের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগে ইহুদীয়জাতির ধর্ম্মভাবমালিন্যে, জ্ঞানীগণ পুনরায় অবতারাবির্ভাবের সূচনানুভব করিতে লাগিলেন। ইহুদীয়গণ পার্থিব ধনমোহে মুগ্ধ হইয়া, পরমপিতার মহিমা বিস্মৃত হইল; আড়ম্বরে মত্ত হইয়া, সত্যধর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করিতে লাগিল; অবজ্ঞাভরে ঈশ্বরচর্চ্চা এবং তুচ্ছ পদার্থের নামে শপথ করিতে অভ্যস্ত হইল; ধার্ম্মিকগণের প্রতি দুর্ব্বার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ, কলহপ্রিয়, মিথ্যাভাষী, স্থূলেন্দ্রিয়চর্য্যানিরত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। তাহারা, ফেরাসি ও সেডুসি নামক দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, পরস্পরবিদ্রোহাচরণে সমাজ বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল। এই সকল লক্ষণায়, জ্ঞানীগণ, মৈত্রেয়বুদ্ধাবির্ভাববিষয়িনী ভগবদ্‌উক্তি যে আশু ফলবতী হইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আশান্বিত হইলেন এবং পরমপিতার জয়োচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নরকুল-কলঙ্ক দাম্ভিক হেরদ্ যৎকালে জুদিয়ার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার রাজত্বসীমামধ্যে, সতীত্ব-প্রতিমা মেরী ফুল্লকুসুমের ন্যায় বেথল্‌হেম নগরে শোভা পাইতেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ যোসেফ্ এই পুণ্যবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং বিবাহের অল্পদিন পরে, ললনাললামভূতা মেরী সচ্চিদানন্দজ্যোতিঃ দ্বারা অন্তরাপত্যা হইয়া, এক বিমলকান্তি তনয়-রত্ন প্রসব করিলেন। জাতসুতদম্পতি হর্ষভরে, পুত্রের উপযুক্তনামনির্ব্বাচন চিন্তানিমগ্ন হইলে, পবিত্র 'যীশু' শব্দ যুগপৎ তাঁহাদের মানসপটে সমুদিত হইল এবং তাঁহারা ইহা বিধাতার প্রত্যাদেশ বিবেচনা করিয়া, যথার্থ ভাবে অপত্যের যীশুনামকরণ করিলেন। কারণ, হিব্রু ভাষায়, যেহসুয়া, যেসুয়া বা যোসুয়া শব্দ 'যিহোবা বা ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তা' এই অর্থ প্রকাশ করে এবং মানব জাতিকে পাপবিমুক্ত করিবার জন্য পরমেশ মেরীযোসেফের পুত্ররূপে, পলস্থান বা পালেস্তাইনে (Palestine) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অবিদ্যাপ্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, সত্য-সংসিদ্ধির প্রতিষ্টম্ভ করিতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণাবতারে ইহার যে প্রকৃষ্টোদাহরণ স্থাপন করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়-বুদ্ধাবতারে তাহার পুনরভিনয় করিলেন। দ্বাপরে দুরাত্মা কংসের সদ্যোজাতকৃষ্ণনিহননপ্রয়াস যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, কলিযুগে মোহান্ধ হেরদের শিশুযীশুহত্যাবিষয়ক সর্ব্ববিধ সতর্ক যত্ন সেইরূপ বিফল হইল। মৈত্রেয়বুদ্ধের আবির্ভাব মাত্র, পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে,

জ্ঞানীগণ, চুম্বকাকৃষ্টলৌহের ন্যায়, পলস্থান অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সকলে পুণ্যতীর্থ বেথল্‌হেমে সমবেত হইলেন। ইঁহারা নিষ্ঠুর হেরদের দুরভিসন্ধি বিবৃত করিয়া, ঈজিপ্ত দেশে যীশুকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য, যোসেফ্‌ ও মেরীমাতাকে পরামর্শ দিলেন এবং তদনুসারে সাধ্বী মেরী ও সুমতি যোসেফ্‌ প্রভুর পার্থিব বালদেহ লইয়া, ঈজিপ্তে গমন করিলেন। তাঁহাদের আফ্রিকাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে, বেথল্‌হেম নগরের দ্বিবর্ষানূর্দ্ধ-বয়স্ক যাবতীয় শিশু সংশয়ী হেরদের আদেশে ব্যাপাদিত হইল। সপ্তবর্ষকাল ঈজিপ্তে বাস করিয়া, হেরদের মৃত্যু-অন্তে, যোসেফ্‌ ও মেরী, যীশুসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু, হেরদ্‌-পুত্র আর্কিলাস্‌ পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা বিপদাশঙ্কায়, বেথল্‌হেমের পরিবর্ত্তে নাজারেথ্‌ নগরে নিবসতি করিতে লাগিলেন।

জীব বাসনার উত্তেজনায় ধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাপ-পঙ্কে নিপতিত হয় এবং বিষময় বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, সারাৎসার-বিস্মরণে দারুণ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি যত বাসনা দমন করিতে পারেন, তিনি জীবনে তত শান্তিসুখাস্বাদন করেন এবং বাসনাব্যাপাদনক্ষম জ্ঞানী পূর্ণশান্তি ও ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন। ধর্ম্মের এই মূল তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য যে মানবরূপী যীশু জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনেই তাহার আভাষ সূচিত হইয়াছিল। আমোদ-প্রিয় ইহুদীয়গণ শৈশবকৈশোরযৌবনবৃদ্ধত্বনির্ব্বিশেষে অনুক্ষণ স্থূলেন্দ্রিয়চর্য্যা ও বিলাসোৎসবে ব্যাপৃত থাকিত। স্বভাবগম্ভীর বালক যীশু, কখনও এই সমস্ত অপবিত্র কার্য্যে, তাহাদের সহিত যোগদান করিতেন না। নাজারেথ নগরের বিরল-লক্ষিত পর্ণ-কুটীরাবাসে আত্মারাম যীশু প্রসন্ন মনে স্বীয় পিতামাতার সেবা করিতেন। ঐহিক বিভব না থাকিলেও, মেরী-যোসেফ্‌ কোনও প্রকার সাংসারিক অস্বাচ্ছল্য অনুভব করিতেন না। যীশুর দর্শনে তাঁহাদের অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা প্রশমিতা হইত এবং যীশুদর্শনই তাঁহাদের বাসনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বাল্যস্বভাবসুলভ চাপল্য বশতঃ যীশু কখনও পিতামাতার সেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া, বালকগণের সহিত ক্রীড়ারত হইতেন না, কিম্বা ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক, বিলাসিতা সহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের স্পৃহা প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে অদ্ভুতচরিত যীশু উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতগণের সহিত ধর্ম্মগ্লানি সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। জনসাধারণের বিলাসিতা ও ঋত্বিকগণের অর্থ-লিপ্সায়

যজন ও যাজন ক্রিয়া আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যলোকাচার মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং মানবকুল ধর্ম্মবিশ্বাসহীন পশুজীবন যাপন করিতেছিল, এই সকল গভীর বিষয়, বালক যীশু ভাবময়ী ভাষায় অবলীলাক্রমে উল্লেখ করিতেন। তথাকথিত ধর্ম্মযাজকগণ যীশুর অকাট্য যুক্তি ও সঙ্গত মীমাংসার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না এবং অন্তরে পরাভব স্বীকার করিয়াও, লোক সমক্ষে স্ব স্ব প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, তাঁহারা যীশুকে অর্ব্বাচীন, প্রগল্‌ভ ইত্যাদি কটুবাক্যে তিরস্কার করিতেন। বাৎসল্য-নিমগ্না মেরীমাতা, বর্ষীয়ান্ ঋত্বিক্‌গণের অভিসম্পাতে তনয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, করযোড়ে ভগবানের নিকট যীশুর কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন এবং রোষাবিষ্ট পুরোহিতগণের নিকট যীশুকে লইয়া গিয়া প্রণত করাইতেন। মাতৃভক্তি, বিনয় ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন জন্য, যীশু জননীর আজ্ঞায় যাজকগণকে সম্ভ্রম সহকারে প্রণাম করিতেন।

জীবের শিক্ষা বিধানার্থ, যীশু বৈধ ধর্ম্মানুসারে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্কল্প করিলেন। মেরীযোসেফের সূক্ষ্ম শরীর যীশুতে সংযুক্ত হইলেও মানব-নেত্রে তাঁহাদের যে পৃথক স্থূল শরীরের বিদ্যমানতা উপলব্ধ হইত, বাঞ্ছাময়ের সংকল্প সুসিদ্ধির জন্য, তাহার লোপ হইল এবং বিধাতৃপ্রেরিত দীক্ষাগুরু দীপ্তিমান যোহন জুদিয়ায় সমুদিত হইলেন। যীশু যোহনের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং সেইরূপ অল্প বয়সে ও সুকোমল দেহে, তিনি যে সন্ন্যাস-ব্রত পালনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন, তৎপ্রদর্শন জন্য আপনাকে ভীষণ পরীক্ষাধীন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানার্জ্জন-প্রক্রিয়ার সুদৃষ্টান্ত স্থাপন জন্য, যীশু দুর্ব্বিষহ কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, নানাদেশ পর্য্যটন ও সত্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় বুদ্ধাবতারে, ভগবান তাঁহার পূর্ব্বাবতারের লীলাক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং যথায় তাঁহার পূর্ব্ব প্রদত্ত উপদেশমালা সঞ্চিত ছিল, সেই তিব্বত দেশে গমন করিয়া, তৎসমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া-ছিলেন। যীশু বহুবিধ ভয় ও প্রলোভনে বেষ্টিত হইয়াও, বিশুদ্ধভাবে সে সকল হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিলেন। দুঃশীল মানবগণ তাঁহাকে অনেকবার কৃত্রিম ভয় ও ধনরত্নের লোভ প্রদর্শন করিয়াছিল; কিন্তু যীশু, কখনও, তাহাতে বিচলিত বা সত্যপথবিচ্যুত হন নাই। কার্য্যাবলীদ্বারা যখন জগতে যীশু-চরিত্রের স্থৈর্য্য ও পাবিত্র্য প্রকটিত হইল, তখন, যীশু শিক্ষকস্বরূপ মানব-জাতিকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হইলেন। ভগবান সমুদ্রতীরবর্ত্তী গ্যালিলি প্রদেশে গমন করিয়া, মনুষ্যগণকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা প্রদান

করিলেন এবং স্বর্গরাজ্য যে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এরূপ ঘোষণা করিলেন।

যীশুর যশঃ-সৌরভ সমস্ত সাইরিয়াদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নিদাঘ-পীড়িত প্রাণীকুল যেমন মহাবৃক্ষতল আশ্রয় করে, সেইরূপ যীশুর সুশীতল প্রেম-ছায়া উপভোগ করিবার জন্য, পাপদগ্ধ ব্যক্তিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আগত হইয়া, তাঁহার চরণতল আশ্রয় করিল। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন। মুক্তিকামীগণ যীশুকে খ্রীষ্ট বা ত্রাণকর্ত্তা বিদিত হইয়া, তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন এবং এইরূপে, ভগবানের যীশুখ্রীষ্ট নাম ভূমণ্ডলে বিঘোষিত হইল। যীশুখ্রীষ্ট গ্যালিলি প্রদেশের নাত্যুচ্চ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া, শরণাগতজনগণকে অকাতরে হিতবচনসুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা এরূপ মধুর ও প্রাঞ্জল ছিল যে, তাহা আবালবৃদ্ধ-বনিতার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত। ক্ষমা ও দৈন্যাস্ত্র দ্বারা বাসনা বিজয় করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধিসাধন এবং সর্ব্ববিধ কাপট্য ও আড়ম্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুমোদিত সরল কার্য্য নিষ্পাদন করিতে যীশুখ্রীষ্ট মানবগণকে উপদেশ দিতেন। 'কেহ এরূপ বিবেচনা করিও না যে, আমি জ্ঞানীগণ ও ধর্ম্মনীতির বিনাশ সাধন করিতে আসিয়াছি। আমি সাধুগণের ত্রাণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছি; ধর্ম্মহানি করিতে আসি নাই।' প্রভু সুস্পষ্ট বাক্যে মানব জাতিকে এই আশ্বাস প্রদান করিলেন। 'Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfil." St. Mathew. ch. V. 17. ভগবান বুদ্ধাবতারে ভারতে যে প্রকার বিভূতিবিকাশ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া-ছিলেন, খ্রীষ্টাবতারে পলস্থানে তাহা প্রদর্শন করিলেন। অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও কুষ্ঠাদি দুশ্চিকিৎস্যব্যাধিগ্রস্ত অনেক বিপন্ন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের কৃপায় নিরাময় হইয়া, শান্তিলাভ করিল। অনেক ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ভগবদ্প্রসাদে অভাবনীয়-রূপে অন্ন প্রাপ্ত হইল। জগতে ঈশ্বরতনয় খ্যাতিলাভে, করুণাময় যীশুখ্রীষ্ট আদর্শ বন্ধুর ন্যায় সাহচর্য্য ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান দ্বারা মানবগণের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৈত্রেয়বুদ্ধাবতারত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য মৈত্রেয়বুদ্ধের আবতারিক কার্য্য যখন নিঃশেষপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, তখন ভগবান তাঁহার নরদেহবিলোপ এবং তৎপ্রক্রিয়ায়

জগতে ক্ষমা ও দৈন্যের আদর্শ উদাহরণস্থাপনা বাঞ্ছা করিলেন। দুষ্ট ইহুদীয় পুরোহিতগণ যীশুখ্রীষ্টের সদনুষ্ঠান পরম্পরায় অন্তঃকরণে যে ভীষণ ঈর্ষানল পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহাতে তাঁহার জীবনাহুতি প্রদান করিবার জন্য, এক্ষণে তাহারা সকলেই সমভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিচার ভাণে খ্রীষ্টের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়া, তাহারা ক্রমান্বয়ে তথাকথিত তিনজন পুরোহিত বিচারকের নিকট যীশুকে উপস্থাপিত করিল; কিন্তু, তথাপি, কোন স্থলেই খ্রীষ্টের কোনও প্রকার অপরাধ প্রমাণিত হইল না। অবশেষে, তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী ও ঈশ্বরনিন্দুক বলিয়া, যীশুকে রোমীয় শাসনকর্ত্তা পণ্টিয়াস্ পাইলেটের হস্তে সমর্পণ করিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে, অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্রূপ ও বিধাতৃবাঞ্ছা প্রত্যক্ষ করিয়া সমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পাইলেট সেইরূপ শ্রীযীশুখ্রীষ্টে ঐশ্বরিকরূপ ও সর্ব্বনিয়ন্তার গূঢ়াভিসন্ধি বিদিত হইয়া, খ্রীষ্টের বিচার ভার গ্রহণ করিলেন। পাইলেট্ দেখিলেন, বিশ্বোদর যীশুখ্রীষ্ট অবিদ্যা-গ্রস্ত ইহুদীয়গণকে তিমিরাবৃত ভীষণ নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ধর্ম্মবিশ্বাসীগণকে এক আলোকময় রাজ্যে স্থানদান করিয়াছেন। তিনি আরও দেখিলেন, ভক্তবৎসল যীশু, ভগবানের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্যসূচকত্রিশূলা-কারে ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন সংস্থাপন জন্য, তদাকৃতিকাষ্ঠে স্বকীয় ভৌতিক দেহ সংবদ্ধ করিয়া, তাহার বিলোপ বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং তাঁহার পবিত্রবাঞ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না। তখন, মহামতি পাইলেট্ লোক সমক্ষে নিজ নির্দ্দোষিতা প্রদর্শন কল্পে, হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, ক্রশ্ কাষ্ঠে লৌহশলাকায় যীশুর দেহ সং-যোজন পূর্ব্বক, তাঁহার প্রাণবধের আদেশ দিলেন। জ্ঞানীগণ যীশুর জন্ম ও জীবন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন, পাইলেটের আদেশ শ্রবণ করিয়া মোহান্ধ ইহুদীয়গণ তীব্র বিদ্রূপ সহকারে তাহার কদালোচনা করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর ইহুদীয় যাজকগণ, ব্যঙ্গভরে, কণ্টককিরীট যীশুরাজের মস্তকে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে ক্রশ্ কাষ্ঠে আরোপিত করিল। কাষ্ঠ-যোজিত-সর্ব্বাঙ্গ যীশু যে অল্পকাল জীবিত ছিলেন, যাজক ও অন্যান্য নীচমনা ইহুদীয়গণ তৎসর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রতি অজস্র কদর্য্যশ্লেষবাণ বর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রশান্ত যীশুখ্রীষ্ট শরীরে লৌহশলাকানিচয়বেধে যেমন কোনও প্রকার কাতরতা ব্যঞ্জন করেন নাই, তাহাদের পাশবিক ব্যবহারেও সেইরূপ অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। বিপজ্জালজড়িতজনের কিরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, জগতে তাহার উদাহরণ স্থাপন জন্য, ক্রশকাষ্ঠারোপিত বিদ্রূপিত

যীশুখ্রীষ্ট, দীন ভাবে, এইরূপ উক্তি করিলেন, "হে আমার ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর! আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ কেন?" সুদক্ষ বিজ্ঞব্যক্তি, কষ্টসাধ্য কোনও মহৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া, করণীয় কার্য্য তাঁহার ক্ষমতায়ত্ত হইলেও, যেমন নম্রতা সহকারে তাহাতে নিজাপটুত্ব জ্ঞাপন করেন, সেইরূপ সিদ্ধ যীশু, ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভীষণ পরীক্ষাধীন হইয়া, তাহাতে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইবার শক্তিধারণ করিয়াও, লোকশিক্ষার্থ পরমপিতাকে নিবেদন করিলেন, 'প্রভো! চারিদিকে উত্তেজনাজাল বিস্তার করিয়া, আমার যে ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছ, তাহা আমার পক্ষে অতিশয় কঠোর নয় কি? সর্ব্বশক্তিশালিন্! এ অকিঞ্চনের যে কি পরিমাণ শক্তি আছে, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ?' ক্ষমা ও দৈন্যের তীব্রতম পরীক্ষায় যীশুখ্রীষ্ট নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। অকৃতজ্ঞ ইহুদীয়-গণের ঘৃণিত আচার ও কুৎসিত্ পরিহাস নীরবে সহ্য করিয়া, মৈত্রেয়বুদ্ধ ঐহিক জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

হিংসাপরায়ণ ইহুদীয় যাজকগণ, সতর্কতার সহিত যীশুর প্রাণশূন্য নরদেহ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করাইয়াছিল এবং যাহাতে কোনওরূপে ঐ শবদেহ স্থানান্তরিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে, সমাধিস্থলে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল। দিবসত্রয় পরে, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট পূর্ব্বধৃত ভৌতিক শরীরে পুনরায় তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দসমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদিও এই সুমহতী ঘটনা "যীশুর পুনর-ভ্যুত্থান" নামে এ ভুবনে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। ভগবান দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে, ব্রহ্মাবতার আত্মসমাধিপ্রাপ্ত হইলেও, লোকশিক্ষাদানহেতু ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় পূর্ব্বধৃত নরদেহে আবির্ভূত হইতে পারেন; কিন্তু সৃষ্টিপ্রকরণগত জীবাত্মা, সাধনাবলে সমাধিপ্রাপ্ত বা সচ্চিদানন্দে লীন হইলে, আর সৃষ্টলোকে প্রত্যাগমন করিতে পারেন না। ফলতঃ ঈশ্বরাবতার ও সিদ্ধ জ্ঞানীর পার্থক্য নির্ণয় করিবার, ইহা অন্যতম উপায়। যীশুর শিষ্য ও ভক্তগণ মৃত্যুপ্রক্রিয়াগত যীশুকে পুনরায় তাঁহার কমনীয় পার্থিবকলেবরে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ভগবান তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, অভয় দিলেন; অপিচ, যুনান দেশ সত্য-ধর্ম্মালোকের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা প্রদর্শন করাইয়া, তাঁহাদিগকে স্বভাষিত ধর্ম্মোপদেশমালা প্রচার করিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর, মহামহিম শ্রীশ্রীযীশুখৃষ্টমৈত্রেয়বুদ্ধ লোক-দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মৈত্রেয় বুদ্ধের তিরোধানান্তর, অনতিকাল মধ্যে, যুনান খণ্ড সত্যধর্ম্মালোকে

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু, বিধাতৃবাঞ্ছায়, আরব দেশাভ্যন্তরে যীশু-সংস্কৃত ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রবেশলাভ করিল না। আরবীয়গণ পারসিক ও ইহুদীয়গণের ধর্ম্মব্যবহারানুকাররত থাকিয়া, বিকার বশে, ক্রমশঃ, নানা প্রকার অধর্ম্ম্যাচরণে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। দেশ মধ্যে স্বার্থান্বেষী বহু কপট সাধু ও সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব হইল এবং ইহারা আরববাসীগণকে ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিচালিত করিয়া, আসুরিক উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করাইল। ফলতঃ, আরব্যগণ জগদীশ্বরের মহিমা বিস্মৃত হইয়া, অন্ধ পৌত্তলিকতায় নিয়োজিত হইল। মানবজাতির কার্য্যাকার্য্যের বিচারক বা শাসনকর্ত্তা কেহ নাই, ইহলোকই মানবের সর্ব্বস্ব, সুতরাং যে কোনও প্রকারে লালসাতুষ্টি সম্পাদন করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, ইত্যাকার নাস্তিকোচিত প্রমাদ বশে, আরবীয়গণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। তাহাদের বিশ্বাসহীনতায় আরবসমাজ বিশীর্ণ ও বিপর্য্যস্ত হইল। ন্যায়, সাহস, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, নির্ভরশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, আতিথ্য, দয়া, পাবিত্র্য, সৌজন্য, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয় আরবভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তথায় লোভ, হিংসা, মাৎসর্য্য, আত্মম্ভরিতা, অসমীক্ষ্যকারিতা, মিথ্যাচার, ইন্দ্রিয়চর্য্যা প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে রাজত্ব করিতে লাগিল। খৃষ্টান্তর্ধানান্তর পঞ্চশত বর্ষকাল মধ্যে, আরবীয় অপারমরুপ্রান্তরের ন্যায়, তথাকার অধিবাসীবৃন্দের অন্তঃকরণ কঠোর ও ভীষণ হইয়া উঠিল।

বিপথগামী আরবীয়গণের কদাচার-সম্ভূত ধর্ম্মগ্লানি, সর্ব্বনিয়ন্তার পুনরায় অবতাররূপে ভূতলে আবির্ভূত হওয়ার কারণ স্বরূপ হইল। তত্ত্বজ্ঞানী আব্রাহামাত্মজ ইস্‌মায়েল বংশের এক শাখা আরব দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিখ্যাত প্রাচীন বংশে, খ্রীষ্টীয় ৫৬৯ অব্দে, মোহম্মদ মক্কানগরে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। মোহম্মদের পিতামহ আবদুল মোতালিব মক্কার প্রসিদ্ধ কাবা মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার পিতা আবদুল্লা,আরবীয়গণের দুষ্কৃত পরম্পরায় মর্ম্মাহত হইয়া, মোহম্মদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মোহম্মদ জীবনের ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র, তাঁহার মাতা যশস্বিনী আমিনা ইহলোক ত্যাগ করেন। আরবীয় সামাজিক নিয়মানুসারে, পিতৃমাতৃহীন বালক মোহম্মদ পিতৃব্য আবুতালিবের রক্ষণাবেক্ষণাধীন হইলেন। কিন্তু, এই ঘনকৃষ্ণকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টি কনকবর্ণ সুঠাম শিশু, মানবের কৃত্রিম আদরযত্নের অপেক্ষা করিতেন না। প্রকৃতির সুখময় ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, বালক মোহম্মদ এক গভীর

স্বর্গীয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। বাল্য বয়সেই, মোহম্মদ হীরা ও সিনাই পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহা ও নির্ঝরিণীনিচয় এবং আরব দেশের অন্যান্য গণ্ড-শৈলগত নিভৃত স্থান সকলের সহিত সুপরিচিত হইলেন। এবম্বিধ শান্তিপ্রিয়তা স্বত্বেও, মোহম্মদ জীবকুলের অবধীরণ করিতেন না; প্রত্যুত সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সহায়তা করিতে আগ্রহী হইতেন। স্বাবলম্বী মোহম্মদ মনুষ্যসমাজের নিকট কোনওরূপ প্রত্যাশা না করিয়া, সংসারকে স্নেহসিক্ত করিবার জন্য ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ প্রতীয়মান হইত। কোমলপ্রকৃতি দয়াবান মোহম্মদ বালকগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা-দান করিতে অতিশয় আহ্লাদ অনুভব করিতেন। সামাজিক সর্ব্ববিধ সুব্যব-হারে নিরঞ্জন মোহম্মদের অন্তরের অন্তঃস্থল পরিদৃষ্ট হইত।

আবুতালিবের সাংসারিক অবস্থা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি মোহম্মদকে বাল্য বয়সে পশুচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে কোনও ক্ষুদ্রব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, মোহম্মদ জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, এরূপ সংকল্প আবুতা-লিব অন্তঃকরণে পোষণ করিতেন। তৎকালে সাধারণ আরবীয়গণ মধ্যে ব্যব-হারিক বিদ্যাচর্চ্চার তাদৃশ প্রসার ছিল না। বিশেষতঃ, দারিদ্র্য বশতঃ, মোহম্মদ আদৌ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নাই। সাংসারিক লোক সমক্ষে তিনি নিরক্ষর প্রতিভাত হইতেন। তথাপি, বালক মোহম্মদের বাক্য ও ব্যবহারে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, মানবগণ বিস্মিত হইত। সুনিপুণ কর্ম্মকর্ত্তার হস্তকৌশল সামান্য কার্য্যেও পরিলক্ষিত হয়। মোহম্মদ এরূপ সুচারু ভাবে পশুচারণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন যে, তাহাতেও তাঁহার অসাধারণত্ব সূচিত হইত। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে ধেনুগণ যেমন আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহার লালনে সোহাগ অনুভব করিত, মোহম্মদের করুণ স্বরে পশুকুল সেইরূপ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার পরিচর্য্যায় আমোদ প্রকাশ করিত। বনমধ্যে গাভী সমূহকে স্থাপন করিয়া, বনমালী যেমন গিরিকন্দর ও অন্যান্য নিভৃত প্রদেশে বিশ্বের মঙ্গল চিন্তা করিতেন, প্রান্তরে পশু সকলকে বিচরণ করিতে দিয়া, মোহম্মদ সেইরূপ হীরা পর্ব্বতের গুহায় সংসারকুশলধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকি-তেন। বিভিন্ন বর্ণ নিচয়ের সমাবেশে প্রত্যেকের উজ্জ্বলতা যেমন পরিস্ফুট হয়, মোহম্মদের সর্ব্বব্যাপী জনানুরাগে তাঁহার কর্ত্তব্যতাজ্ঞান সেইরূপ সুতীক্ষ্ণ প্রমা-ণিত হইত। একদা কোনও সমবয়স্ক বালক কর্ত্তৃক ক্রীড়ামোদ উপভোগ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, মোহম্মদ উত্তর স্বরূপ এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন,

'বালোচিত কার্য্যানুসরণে রত থাকা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন জন্য মানবের জন্ম হইয়াছে।'

খদিজা নাম্নী এক সভ্রান্তা বিধবা মহিলা মক্কানগরে খাদ্যোপকরণের ব্যবসায় করিতেন। যদিও কার্য্যের মূলধন তাদৃশ অধিক ছিলনা, তথাপি খদিজার সততা ও সাধুতায় তাঁহার ব্যবসায় যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আবু-তালিব অভীষ্টপ্রণোদিত হইয়া, ব্যবসায়-পদ্ধতি-শিক্ষার জন্য, মোহম্মদকে কৈশোর বয়সে, খদিজার বিপণিতে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। মানব, ঈশ্বরাভিপ্রায় বোধগম্য করিতে না পারিয়াও, তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ মুক্ত করিয়া দেয়। মোহম্মদ জগতে যে কি গুরুকার্য্য সমাধান করিতে আসিয়াছেন এবং খদিজা যে তাহাতে কতদূর আনুকূল্য করিবেন, তাহা আবুতালিব আদৌ অনুমান করিতে পারেন নাই। তিনি অর্থাগমাশায়, খদিজার সহিত মোহম্মদের সমানয়ন করিয়া দিলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই, খদিজা ধনী পবিত্র ভাবে মোহম্মদকে দর্শন করিলেন। খদিজা দেখিলেন, মোহম্মদ কেবল নামতঃ মোহম্মদ নহেন; তিনি সর্ব্ববিষয়ে সত্যই মোহম্মদ বা প্রশংসিত; ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই একমাত্র সত্যরূপে প্রশংসিত এবং একমাত্র তিনিই প্রশংসাযোগ্য। খদিজার জ্ঞাননেত্র, ক্রমশঃ, যত উন্মীলিত ও বিস্ফারিত হইতে লাগিল, ততই তিনি স্পষ্টতররূপে দেখিতে লাগিলেন, লা এলাহা ইল্লাল্লা, মোহম্মদর্ রসুলুল্লা—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব্যতীত ঈশ্বর কেহ নাই এবং মোহম্মদ তাঁহারই প্রেরিত। অপিচ, ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হেতু, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আপনাকেই মোহম্মদ রূপে সৃজন করিয়া ভূলোকে প্রেরণ করিয়াছেন; সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীগণের বিনাশমূলক ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য, ঈশ্বর স্বয়ং মোহম্মদ রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাগ্যবতী খদিজা প্রেমরোমাঞ্চ কলেবরে, প্রীতিগদ্‌গদ স্বরে মোহম্মদকে কহিলেন, 'প্রভো! তোমায় চিনিয়াছি, জানিয়াছি' এবং বিস্‌মিল্লা হের্ রহমানর্ রহিম—পবিত্র পরমদয়াবান ঈশ্বরের নামে—মোহম্মদে আত্মসমর্পণ করিলেন। নিয়ম-প্রবর্ত্তক, নরধর্ম্মান্বিত, ভক্তবৎসল মোহম্মদ সুদৃষ্টান্ত স্থাপন জন্য, খদিজাকে বিবাহ করিলেন। ইন্দ্রিয়চর্য্যারত উচ্ছৃঙ্খলাচার আরবীয়গণের, খদিজার মহাভাব অনুভূতি করিবার সামর্থ্য ছিলনা। মোহম্মদের প্রতি খদিজার প্রবলানুরক্তি কুভাবে গ্রহণ করিয়া, তাহারা সমাজে অধিকতর কুনীতির প্রসার করিতে পারিত। যাহাতে তাহা না হইতে পারে,

প্রত্যুত কঠিননিয়মবন্ধনে আরবীয়গণের অনর্গল নারী-সংসর্গ-ব্যভিচার প্রশমিত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত মোহম্মদ খদিজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারত-বাসীগণ বহুপূর্ব্বকাল হইতে মানবের মহাভাবলক্ষণাবিষয় বিদিত ছিল। এজন্য প্রেমপ্রণোদিত হইয়া, গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি, সমাজে সুনীতিপ্রবর্ত্তনোপলক্ষে তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। খদিজার পরে আরও ত্রয়োদশ রমণী, ক্রমশঃ মোহম্মদের শরণাগতা হইয়াছিলেন, এবং একই উদ্দেশ্যে, মোহম্মদ তাঁহাদিগ-কেও বিবাহ করিয়াছিলেন। অতঃপর, ধর্ম্মসংস্থাপনে হস্তক্ষেপ করিয়া, মোহম্মদ যখন বিবাহবিধির সংস্কার করেন, বিরলমনুষ্যাবাস নারীসংখ্যাবহুলাতি-রেক আরবদেশে সদাচারসঙ্গতভাবে মানবোৎপত্তিবিস্তারকল্পে, তখন তিনি প্রত্যেক আরব্য পুরুষের চারিটী পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

মোহম্মদ অপেক্ষা খদিজা বর্ষপঞ্চদশ বয়োজ্যেষ্ঠা থাকা নিবন্ধন, সমাজনেত্রে তাঁহাদের শুভ পরিণয়, প্রথমতঃ, বিসদৃশ প্রতীয়মান হইলেও, তাহাতে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিতা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, যে আরবীয়গণ বিবাহ প্রথাকে কামরিপু চরিতার্থ করিবার উপায় এবং নারীকুলকে দাসীজাতীয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিল, মোহম্মদ ও তাঁহার পত্নীগণের পারস্পরিক সরসব্যবহারে, তাহারা, ক্রমশঃ, দাম্পত্যধর্ম্মনীতি এবং ললনাগণের প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্যতা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে মোহম্মদ খদিজার পাণিগ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী একবিংশবৎসর মধ্যে, খদিজার জীবিতাবস্থায় ও জীবনাত্যয়ে, মোহম্মদের অপরা ভার্য্যাগণ তৎকর্ত্তৃক পরিণীতা হন। চত্বারিংশবর্ষবয়ঃক্রম কাল হইতে, মোহম্মদ প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মোহম্মদের ধর্ম্মসংস্থাপনবিষয়ে চারুশীলা খদিজা কিরূপ সাহায্য করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের নিম্নলিখিত উদ্যোগালাপন ও ক্রিয়াপদ্ধতি-উদ্ভাবন হইতে, তাহা উপলব্ধি করা যায়।

খদিজা। ললনাকুলে আমিনামাতা ধন্যা, যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তোমার 'আহম্মদ' নামকরণ করিয়া, তোমাকে যথার্থ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছিলেন। তুমিইত আহম্মদ, খোদা—স্বয়ং ঈশ্বর!

মোহম্মদ। জ্ঞানীগণ আমাকে এইরূপ জ্ঞানগম্য করিবেন। কিন্তু, অজ্ঞা-নাচ্ছন্ন আরবীয়গণের নিকট আমি, ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার জন্য, তাঁহার রসুল

বা প্রেরিতপুরুষ স্বরূপ প্রতিভাত হইব। মোহান্ধ আরবীয়গণ যেমন শরীর-ধারী বহুজীবকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা করে, আমাকেও সেইরূপ ঈশ্বর বিবেচনা করিলে, তাহাদের একেশ্বরবিশ্বাসে বিঘ্ন জন্মিবে। আমার ইচ্ছায়, আমার মাতৃদত্ত 'আহম্মদ' নাম, ক্রমশঃ, লুক্কায়িত হইয়াছে।

খদিজা। বিস্মৃতিপ্রভাবে যাহাদের অন্তঃকরণ পাষাণ সদৃশ হইয়াছে, সেই আরব্যগণ কিরূপে তোমার ধর্ম্মোপদেশবাণী গ্রহণ করিবে, আমি তাহা ধারণা করিতে পারিতেছিনা। হে অনঘ! আমাকে তাহা বুঝাইয়া দাও।

মোহম্মদ। আদৌ ভারত খণ্ডে, মৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মাঙ্গভূত জ্ঞানভক্তিকর্ম্মাখ্য যে ত্রিবিধ যোগতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, বিস্মৃতি বশে মানবগণ তৎসমস্ত উপেক্ষা করিয়া, দারুণ দুঃখ ভোগ করে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ কল্পে, আমি সময়ানুযায়ী ভূতলে আবির্ভূত হই এবং যখন যেখানে যে তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহা শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করি। আমি, এ যাত্রায়, আরবীয়গণকে, কর্ম্ম-যোগ শিক্ষা দিয়া, ধর্ম্মপথে আনয়ন করিব। যাহাতে কর্ম্ম-যোগ আরববাসীগণের হৃদয়গ্রাহ্য হয়, আমি সেইরূপ ভাবে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। হে সত্তমে! তৎপ্রচারে তুমি আমার সাহায্যকারিণী হও।

খদিজা। কুশলিন্! তোমার কৃপায়, আমি তোমার পবিত্র অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। তোমাকে নিরক্ষর বিবেচনা করিয়া, যাহাতে আরবীয়গণ তোমার হিতোপদেশমালা অবহেলা না করে, প্রত্যুত তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করে, আমি তাহার উপায় বিধান করিব।

পরদিবস সায়ংকালে, সুবুদ্ধিমতী খদিজা তাঁহার বিশ্বস্ত জ্ঞাতি অরকার নিকট এইরূপ বিজ্ঞপ্তি করিয়াছিলেন ঃ—"সুহৃদ্ অরকা! আমি তোমাকে এমন একটী পরমাশ্চর্য্য সুসংবাদ প্রদান করিব, যাহাতে তোমার পুলকরোমাঞ্চ সমুপস্থিত হইবে। যিনি স্বজনগণে প্রীতিমান, প্রতিবাসীগণের প্রতি সদয়, দরিদ্রগণের প্রতি বদান্য, বৈদেশিকগণের প্রতি আতিথ্যরত, স্ববাক্যপালনশীল এবং সর্ব্বদা সত্যরক্ষণতৎপর, সেই অনবদ্য মোহম্মদ গত রজনীতে যৎকালে হীরাদ্রি-গুহায় ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন, স্বর্গদূতশ্রেষ্ঠ জেব্রাইল সেই সময়ে মানবদেহ ধারণে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জেব্রাইলদেব ঈশ্বরাদেশে কাস্তদুকূলে লিখিত মহাতত্ত্ব নিচয় মোহম্মদের হস্তে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে তৎসমস্ত মানব সমাজে প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। মোহম্মদ ঐ সকল লিখন পাঠে

নিজাসমর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, ঈশ্বর-দূত এইরূপ পবিত্র বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া, তাঁহাকে উহা পাঠ করিবার শক্তি এবং পরমতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন: 'পরমেশ্বরের নামে পাঠ কর! পরমেশ্বরের নামে—যিনি সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন—যিনি রক্তপিণ্ড হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমোপকারী ঈশ্বরের নামে পাঠ কর, যিনি মনুষ্যকে লেখনীর ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন —যিনি, মানবগণ যাহা জানিত না, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। সত্য বলিতেছি, মনুষ্যজাতি বিদ্রোহশীল. ধনমদে উদ্ধত হয়। সকলেরই সত্য ঈশ্বরে প্রতিগমন করিতে হইবে। যে, জীবকে ঈশ্বরাভিমুখী হইতে বাধা দেয়, যে, ভৃত্যকে প্রার্থনা করিতে বারণ করে, তাহার পরিণাম কি হইবে? তাহার পরিণাম কি? সে কি সত্যের অনুসরণ করে, কিম্বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে? সে যে সত্য অগ্রাহ্য করে এবং সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা কি সে দেখিতে পায় না? পরমেশ্বর সমস্ত দেখিতে পান, তাহা কি সে জানেনা? সত্য বলিতেছি, সে যদি বিরত না হয়, আমরা তাহাকে মস্তকাগ্রের কেশগুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিব। সেই মিথ্যাবাদী পাপীর কেশগুচ্ছ। সে যদি তাহার দলকে আহ্বান করে, আমরাও অতলতিমিরগর্ভ নরকের প্রহরীগণকে আহ্বান করিব। তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইয়া, পরমেশ্বরকে পূজা কর এবং ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও।' (কোরাণ, ৯৬ সুরা বা অধ্যায়)। দিব্যজ্ঞান বলে, মোহম্মদ ভগবানের পবিত্র লিখিতাদেশপাঠ সমাপন করিলে, জেব্রাইলদেব পুনরপি তাঁহাকে কহিলেন, 'মোহম্মদ! আমি যেমন ঈশ্বরের দূত, তুমিও সেইরূপ মর্ত্ত্যে ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচারক হইবে।' অন্য দিবাদ্বিপ্রহরেও, জেব্রাইলদেব পর্ব্বত-পার্শ্বে মোহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে এই সকল বাক্য বলিয়াছেন:—'মোহম্মদ! আর প্রচ্ছন্ন থাকিও না। গাত্রোত্থান করিয়া, ধর্ম্মপ্রচার কর। ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর। তোমার দেহাচ্ছাদন বিশুদ্ধ কর। যাহাতে ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা ত্যাগ কর। অধিকতররূপে পাইবার প্রত্যাশায়, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিওনা। পরমেশ্বরের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা কর। যখন বংশী বাজিবে, তখন অবিশ্বাসীগণের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে।' (কোরাণ, ৭৪ সুরা বা অধ্যায়।) আমি মোহম্মদ প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্ত যথার্থ ভাবে তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।"

অরকা নির্ব্বাক্ হইয়া, খদিজার মধুর বচন আকর্ণন করিতেছিলেন। খদি-

তার বাক্যসমাপ্তিমাত্র অরকা গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'জগদীশ্বর প্রশংসিত হউন। আবদুল্লাপুত্র মিথ্যা বলেন .নাই। মুষার (Moses) ন্যায়, মোহম্মদ পরমনীতিতত্ত্বের অধিকারী হইবেন। তিনি যেন নিরুৎসাহ না হন। আমি তাঁহার পার্শ্বগ হইব।' ফলতঃ, ক্ষণকাল মধ্যে, মোহম্মদের দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তির বিষয়, অরকা নানাস্থানে বিবৃত করিলেন এবং ত্বরিতবেগে উহা মক্কানগরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হানিফ্ বা মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ, প্রভুর পদরজোরেণু পাইবার আশায়, মোহম্মদের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে এবং স্বপরিবারগত জনগনকে 'ইস্লাম' বা একেশ্বরাবলম্বনমন্ত্র প্রদান করিলেন। মোহম্মদের দর্শনার্থী এবং তাঁহার পূতবাণীশ্রবণাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জনতাপ্রাবল্য নিবন্ধন, মোহম্মদ মক্কানগরো-পকণ্ঠস্থ কিউবিস্ ও সাফাশৈলে গমন করিয়া, অনত্যুন্নত প্রদেশ হইতে নীতি-বচনামৃত বর্ষণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে, মানবগণ নগরমধ্যেও তাঁহার ধর্ম্মা-লাপন শ্রবণ করিয়া, পরিতৃপ্ত হইতেন। যাঁহারা একবার মোহম্মদের সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, থাকিতে পারিতেন না এবং মক্কানগরে, মোহম্মদ হজরত্ বা বিশিষ্টসম্মানার্হ নিগদিত হইতে লাগিলেন।

মেঘমুক্ত মিহিরমরীচি যেমন অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাত হয়, দুর্ম্মতিপরায়ণ পাষণ্ড-নিচয়ের শাঠ্য ও বিদ্বেষতিমিরখণ্ডনে মোহম্মদের মহিমা সেইরূপ দেদীপ্যমান হইয়াছিল। কোরেশসম্প্রদায়ভুক্ত হীনবুদ্ধি মলিনমনা আরবীয়গণ, হজরত্ মোহম্মদের প্রতিষ্ঠায় দারুণ ঈর্ষান্বিত হইয়া, ভগবান ও তাঁহার অল্প সংখ্যক শিষ্যগণকে যৎপরোনাস্তি বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। এক সময়ে, পরিপন্থীগণ মোহম্মদকে প্রচুর অর্থদান ও কোরেশদলপতিনিয়োগের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য বর্জ্জন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। প্রভু তাহাতে এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, 'যদি মায়া তোমাকে প্রলোভন-পাশে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, তুমি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কারণ, তিনিই শ্রবণশক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞ।' (কোরাণ, ৪১ সুরা বা অধ্যায়।) এতদু-ত্তরে, তাহারা মোহম্মদকে, তাঁহার দৈবশক্তির নিদর্শনস্বরূপ, কোন অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিতে অনুরোধ করে। মোহম্মদ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া, ধীর ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জগতে সত্য প্রচার করিবার জন্যই, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, কোনও অমানুষিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে আসেন নাই। তাহারা আরব্য ভাষায় এরূপ কোনও গ্রন্থ বা রচনা

উপস্থিত করিতে পারে না, যাহা সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্বে কোরাণের একটী অধ্যায়েরও সমকক্ষ হইতে পারে, উদাহরণ স্থলে, ইহাও মোহম্মদ তাহাদিগকে আলোচনা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ তথাপি নিবৃত্ত হইল না। বাত্যাকুল সলিল পথে চলমানা তরণির ন্যায়, অবিদ্যাচ্ছন্ন মক্কানগরে মোহম্মদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন-চেষ্টা বিঘ্নতরঙ্গপরম্পরায় নিগৃহীত হইতে লাগিল। প্রতিকূলাচারীগণ কোনও ক্রমে মোহম্মদের সদুদ্যম ও অধ্যবসায়ের অপচয় করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাঁহার জীবন-নাশের ষড়যন্ত্র করিল। সর্ব্বদর্শী সত্যব্রত মোহম্মদ বৈরীগণের পাপাভিসন্ধি বিদিত হইয়া, অশান্তিনিবারণকল্পে, মক্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল মদিনানগরে অবস্থিতিকরণ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং যে রজনীতে কুৎসিত্ আততায়ীগণ নিদ্রাযোগে তাঁহার ব্যাপাদন মনোনীত করিয়াছিল, তৎপ্রদোষে, আবুবকর নামক জনৈক অন্তরঙ্গ অনুচর সমভিব্যাহারে, তিনি মদিনাযাত্রা করিলেন। ইতিহাসে এই লীলাবতী ঘটনা মোহম্মদের মদিনাপলায়নাখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অপিচ, ভগবানের শিষ্যবৃন্দ এই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে হিজিরা শকের উৎপত্তি গণনা করিলেন।

মদিনাপ্রয়াণজ কষ্টসাধ্য নৈশ ভ্রমণে মোহম্মদের অসাধারণ ধৈর্য্য, সাহস ও ঈশ্বরালম্ব উজ্জলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। থর্ পর্ব্বতের সমীপদেশে উপস্থিত হইবামাত্র, শত্রুর অনুসরণ আশঙ্কা করিয়া, আবুবকর অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইলেন এবং উদ্ধতভাবে, মোহম্মদের প্রতি এইরূপ উক্তি করিলেন, 'হে সুগত! আমরা ভ্রান্তি-প্রণোদিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায়, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি। আমরা নিরায়ুধ দুইটী প্রাণী অবিলম্বে অতিরিক্তসংখ্যক সশস্ত্র অরিদল কর্ত্তৃক ধৃত হইব।' বস্তুতঃ মোহম্মদের বধোদ্যত অরাতিগণ, নিরূপিত সময়ে তাঁহার ভবনে গমন করিয়া,বল পূর্ব্বক গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল ; কিন্তু মোহম্মদের শয্যা হইতে মোহম্মদের পরিবর্ত্তে আলিকে উত্থিত হইতে দেখিয়া,তাহারা বিফলমনোরথ ও ক্ষণিক অপ্রতিভ হয়। পরমুহূর্ত্তেই, মোহম্মদের পলায়ন অনুমিতি করিয়া, তাহারা ক্ষিপ্রতা সহকারে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল এবং যৎকালে মোহম্মদ ও আবুবকর থর্গিরিপাদদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারাও সেই সময়ে, নিকটবর্ত্তী বনভূমে সাগ্রহে মোহম্মদের তল্লাস করিতেছিল। বিভু, সঙ্কটসময়ে, প্রশান্ত ভাবে আবুবকরকে করুণস্বরে এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিলেন, 'ভয়াবেগে ওরূপ উদ্বিগ্ন হইওনা, আবু। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্যান্বিত নহে। আমি বলিতেছি, আমরা দুই জন নহি, তিন জন।

কারণ, ঈশ্বর আমাদের সহিত আছেন, এবং তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'

প্রচ্ছন্নগমনে দিবসত্রয় পথে অতিবাহিত করিয়া, চতুর্থ দিনে প্রভুভৃত্য যখন মদিনানগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন, তখন ভাগ্যবান আবুবকর মোহম্মদের আশ্বাস-বাক্যের তাৎপর্য্য এবং সাধুজনানুগত্যে যে পারিতোষিক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মদিনার আবালবৃদ্ধ বহু অধিবাসী, সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাঁহাদিগকে নগর মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য তথায় প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মোহম্মদ-ভাষিত ইস্‌লাম-মন্ত্র-মাহাত্ম্য ইতিপূর্ব্বে মদিনায় বিশ্রুত হইয়াছিল। অপরঞ্চ, মোহম্মদের পরমবিশ্বস্ত আলি, অগ্রেহ্যু মদিনানগরে উপনীত হইয়া, তথায় ভগবানের শুভাগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। আগন্তুকদ্বয়ের নগরপ্রবেশোদ্যোগ অবিলম্বে সমাহিত হইল। মোহম্মদকে তুঙ্গোষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, দণ্ডরক্ষিততালপত্রাতপত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করা হইল। আবুবকর মোহম্মদের পশ্চাদ্দিকে স্থাপিত হইলেন। বরিবস্যাচিকীর্ষু মাদিনীয়গণ সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং উভয়পার্শ্বরক্ষকস্বরূপ, মোহম্মদ ও আবুবকরকে বেষ্টন করিয়া, শ্রেণীবদ্ধ হইলেন। জনেক স্ফুর্ত্তিমান সেবক, সুদীর্ঘ বল্লমাগ্রে স্বীয় হরিদ্বর্ণউষ্ণীষবস্ত্র সংনদ্ধ করিয়া, তাহা পতাকা-স্বরূপ সম্মুখরক্ষীগণের পুরোভাগে ধারণ করিলেন। মোহম্মদ এইরূপে সচিব-দল-পরিবীত হইয়া,শোভাযাত্রায় মদিনানগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে,আবু আয়ুব নামক একজন সম্পন্ন নাগরিক তাঁহাকে অনুচরগণসহ স্বগৃহে আতিথ্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান যখন ধনীভবনে বরিবসিত হইতেছিলেন, তখন অনুতাপা-নলদগ্ধ আবুবকর, নতজানু হইয়া, তৎপ্রতি এই শিষ্টবচন প্রয়োগ করিলেন: 'হে মহানুভাব! প্রাণের মায়ায়, বিকৃতিবশে, তোমাকে পথিমধ্যে ব্যজস্তুতি মর্ম্মে যে প্রকার শ্লেষাত্মক সম্বোধন করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া যথার্থ-ভাবে, তোমাকে সেইরূপ সম্বোধন করিতেছি। হে সুগত! তোমাকে বিদ্রূপ করিয়া যে গুরুপাতক করিয়াছি, নিজ উদারতায় তাহা মার্জ্জনা কর।'

মদিনাপুরে মোহম্মদের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পর, দুঃশীল আরব্যগণ আর তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই। তদবধি, অদম্য উৎসাহ ও অলোক-সামান্য প্রতিভাসহকারে, মোহম্মদ ধর্ম্মতত্ত্বনিচয় প্রচার করিতে লাগিলেন। মোস্‌লেম বা ইস্‌লামমন্ত্রবিশ্বাসীগণের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংহতি দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। একেশ্বর-বিশ্বাস-

বারি সেচনে আরবীয় শুষ্কসমাজে আতিথ্য, সৌহার্দ্দ, ভ্রাতৃভাব, মিতাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজী অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, এবং যাহাতে এই নির্ম্মল বিশ্বাস আরববাসীগণের অন্তঃকরণে পরিবদ্ধ হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে, মোহম্মদ কতিপয় সামাজিক নিয়ম ও ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করিলেন। এই সকল আচারপালনে, আরব্যগণ কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মানুসরণে নিয়োজিত হইল। জ্ঞান ও ভক্তির অল্পতা স্বত্বেও, মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত সুতরাং তাঁহার উপদেশ মানব জাতির হিতকারী, এই পবিত্রবিশ্বাসবলে, সাধারণ আরবীয়গণ তৎপ্রদর্শিত সুকার্য্যনিচয়ে ব্যাপৃত হইল। আবার, গৃহীপক্ষে একেশ্বর-বিশ্বাস ও পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মচর্য্যা ব্যবস্থা করিলেও, মোহম্মদ জ্ঞানী বা ভক্তগণের জ্ঞান ও ভক্তিচর্চ্চার প্রতিষেধ করেন নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন কলিযুগে, শ্রেয়স্কামী আরবীয় জনসাধারণের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, ভগবান তাহার ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন; অধিকন্তু জ্ঞানপিপাসু শিষ্যগণকে জ্ঞানখড়্গে অজ্ঞান বিনাশ করিবার উপদেশ দিলেন। ফলতঃ, যাহাতে ঈশ্বরস্মরণ, দয়া ও একতা, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলে সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, মোহম্মদ সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠান বিশেষরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্কারে ইহাই যে মোহম্মদের অভিপ্রেত ছিল, তাহা তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধানাবলীর প্রধানপঞ্চক হইতে উপলব্ধি করা যায়ঃ (১) স্থির বিশ্বাসে পরমেশ্বরের একত্বস্বীকার। (২) নিরূপিত নিয়মানুযায়িনী ভগবদুপাসনা অর্থাৎ প্রত্যহ পঞ্চাহ্ন নমাজ বা ঈশ্বরমহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট দীনভাবে মঙ্গল প্রার্থনাকরণ। (৩) বৈধ ও ঔদার্য্যমূলক দান। মোহম্মদ এরূপ বিধি প্রণয়ন করিলেন যে, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি দরিদ্র প্রতিবাসীগণকে তাঁহার বার্ষিক আয়ের $\frac{১}{৪০}$ একচত্বারিংশাংশ দান করিবেন। আরব্য ভাষায় এই বৈধদান 'জাকাৎ' নামে অভিহিত হয়। 'সেদ্‌কা' বা ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে দরিদ্র, সহায়হীনদাস, পথিক, ভিক্ষোপজীবী ও অপরিচিত জনগণে দান ব্যক্তিগতরুচিসাপেক্ষ। (৪) রোজা বা রমজানোপবাস। রমজান মাসের ত্রিংশাহকাল দিবাভাগে উপবাসী এবং ঈশ্বরারাধনারত থাকিয়া, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিশুদ্ধি সাধনই এ পবিত্র প্রথার গূঢ়োদ্দেশ্য। (৫) মক্কানগরে হজ্ বা ধর্ম্মোৎসবপালন। যাহাতে বিভিন্ন স্থানের ইস্‌লামবিশ্বাসীগণ একস্থানে সমবেত হইয়া, পরস্পরে ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতে পারেন এবং পরস্পর সহায়তায় মোস্‌লেম বৃন্দের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী হয়, তজ্জন্য, মোহম্মদ এ সুপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। অপিচ, আরবের সর্ব্বপ্রধাননগর মক্কা হইতে

মহৎকার্য্যখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, সহজে উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে বলিয়া, তিনি মক্কানগরে এই উৎসব অনুষ্ঠানের স্থাননির্ব্বাচন করিলেন। ধর্ম্মোৎসব-ব্রতোদ্‌যাপন জন্য, দূরদেশীয় মোস্‌লেমগণের প্রতিও, মক্কাতীর্থ-যাত্রার আদেশ বিহিত হইয়াছে।

লীলা-সমাধান এবং নরদেহ-ত্যাগের সূচনা স্বরূপ, মোহম্মদ অন্তরঙ্গ শিষ্য-গণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে ধর্ম্মকার্য্য-পরিচালনা সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বীয় জামাতা আলি ও ওসমান এবং খালেদ, আবুবকর প্রভৃতি কতিপয় শিষ্যকে তাঁহার ভৌতিক জীবনাবসানে, তদীয় উপদেশমালা প্রচার করিবার আজ্ঞা দিলেন। সমাধির দুই দিবস পূর্ব্বে, হজরত্ মোহম্মদ মস্‌জিদ বা উপাসনা-মন্দিরে গমন পূর্ব্বক, সৌজন্য সহকারে সমবেত জনমণ্ডলীর প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন,—'যদি মৎ কর্ত্তৃক কাহারও কোন অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, বেত্রাঘাত গ্রহণে তাহার প্রতিশোধ করণ-কল্পে, আমি আমার পৃষ্ঠপাতনে প্রস্তুত আছি।' নিরুত্তর শ্রোতৃবৃন্দ অবাঙ্‌মুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিলে, ভগবান পুনরপি জিজ্ঞাসু হইলেন,—'আমি কি কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে ঋণী আছি? সত্য উত্তর দিতে কেহ সঙ্কুচিত হইও না। বিচার দিনে ব্রীড়িত হওয়া অপেক্ষা, এক্ষণে লজ্জাভার স্কন্ধে করিয়া তাহার মোচন করাই অধিকতর সমীচীন।' প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে, একব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, 'এক সময়ে হজরতের হস্তে অর্থ না থাকায়, হজরত্ এ অধমের নিকট হইতে তিনটী রৌপ্য-মুদ্রা লইয়া, সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহা হজরতের ঋণ-স্বরূপ মনে গণ্য করি না।' উহা যথার্থ ঋণ এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া, মোহম্মদ অর্থরক্ষককে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিবার আদেশ করিলেন। দেহবিমোচনদিবসে, মোহম্মদ অতিপ্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মের মহিমাকীর্ত্তনে রত হইলেন। খদিজা কয়েকবৎসর পূর্ব্বে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া, অক্ষয়ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মোহম্মদের সমাধি-প্রাক্কালে, তাঁহার অপরা ত্রয়োদশবনিতা, একাসনে ভগবানের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া অনাদি-ধ্যানে নিমগ্না হইলেন এবং মোহম্মদও পরমেশ্বরের নিকট সাযুজ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঈদৃশাবস্থায়, রাজরাজেশ্বরের আজ্ঞাকারী প্রিয়ভৃত্য কার্য্যশেষে যেরূপ প্রশান্ত সমারোহে তাঁহার সমীপে উপনীত হন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া, শ্রীশ্রীমোহম্মদ অনন্তে মিশ্রিত হইলেন এবং তাঁহার প্রাণশূন্য

ভৌতিক দেহ কম্বলাসনে পতিত রহিল। খ্রীষ্টীয় ৬৩২ অব্দ বা একাদশ হিজিরায় এই সমাধি-লীলা সংঘটিতা হয়। পূর্ব্বাবতারে দেহত্যাগকালে, ভগবান যে বীর ও করুণ রসের মিশ্রাভিনয় করিয়াছিলেন, এবারে, তৎপরিবর্ত্তে কেবল শান্তরসের অভিনয় করিলেন।

যাহাতে কালপ্রভাবে ধর্ম্মতত্ত্বনিচয় সহসা বিস্মৃতিকবলিত না হইতে পারে, তজ্জন্য মোহম্মদ তৎসমস্ত পবিত্র কোরাণ-গ্রন্থে সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। আরবীয় পাঠকরার্থক 'কারা' ধাতু হইতে কোরাণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং কোরাণ, 'পাঠকরণ' বা 'যাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য, তাহা' এই অর্থ প্রকাশ করে। ফলতঃ, কর্ম্মপন্থীগণের কোরাণপাঠ এবং তন্নিবদ্ধ উপদেশানুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্যযুগে মানবগণ বিশিষ্ট মেধাশালী ছিলেন এবং শ্রুতি ও স্মৃতি নিয়মে জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এজন্য ভগবান তৎকালে প্রজাপতিদশক প্রমুখাৎ ভূমণ্ডলে বেদ বা জ্ঞান প্রচার করিলেন। পরন্তু, দ্বাপরে মানবের মেধাহীনতা নিবন্ধন, পরমপিতা বাদরায়ণ ব্যাসদ্বারা, প্রচারিত বেদ গ্রন্থনিবদ্ধ করাইলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি দ্বৈপায়ন শ্রীকৃষ্ণ-ভাষিত মধুর ধর্ম্মতত্ত্বনিচয়ও পুস্তকে গ্রথিত করিয়াছিলেন। কলিযুগে মোহ-তমসাচ্ছন্ন ক্ষীণমতি মনুষ্যগণের জন্য, ভগবান ধর্ম্মকর্ম্মনীতিমালা একবারে কোরাণ গ্রন্থাকারে প্রকট করিলেন। পূর্ব্বাবতারদ্বয়ে যদিও প্রভুর পরমোপদেশরাজী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, মোহম্মদাবতারে বাঙ্ময় সেরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। পাবিত্র্য ও প্রাঞ্জল্যে কোরাণের ভাষা ঈদৃশী মর্ম্মস্পর্শিনী এবং কোরাণগত সংসার ও সমাজকার্য্যনিয়ামক উপদেশনিচয় এরূপ সারগর্ভ যে, উহা প্রকৃতি দেবীর কমনকরপ্রসূত অনুমিত হয়। মানব-হস্ত-বিরচিত গ্রন্থ এতদূর সুসম্পন্ন হইতে পারে না। শব্দে, অর্থে, কল্পনায় বা আখ্যানে, কোরাণের কুত্রাপি কুরুচি বা অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র আবেশ হয় নাই। এই মহাগ্রন্থ একশত চতুর্দ্দশ সুরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার যে যে স্থলে ঈশ্বর বা দেবতার বর্ণনা আছে, তৎসমস্তই ভীতি ও শ্রদ্ধারসে সম্পূর্ণ আপ্লুত। বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নির্ম্মলান্তঃকরণে অকপট ব্যবহার করিতে, কোরাণ মনুষ্যগণকে শিক্ষা দেয়। 'পূর্ব্বাস্য বা পশ্চিমাস্য হইয়া উপাসনা করিলেই যে ঈশ্বরের প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন করা হয়, তাহা নহে। যিনি ঈশ্বরে, তাঁহার দূতগণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং শেষদিনে সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন ; যিনি কুটুম্ব, পিতৃমাতৃহীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক এবং পথিকগণের

প্রতিপালনে অকাতরে অর্থব্যয় করেন; যিনি প্রতিশ্রুতি পালন করেন এবং যিনি কষ্টে ও বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত।' 'যিনি পিতৃমাতৃসেবাপর, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অকপট, সমদর্শী, ন্যায়বান, পবিত্র ও প্রিয়ভাষী, ধীর, বিনয়ী, দয়ালু, ক্ষমাশীল, কুৎসিত্ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াও, শিষ্টাচার প্রতিদান করেন এবং ঐহিক প্রতিপত্তি প্রাপ্তির আশা না করিয়া, কেবল ভগবদ্‌প্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়।' 'যাহারা আড়ম্বরপ্রিয় এবং অমিতাচারী, যাহারা আত্মহত্যা করে এবং যাহারা দাসগণের প্রতি পরুষ ব্যবহার করে, তাহারা ঈশ্বরের অপ্রিয়।' কোরাণ, ৩,১৭,২৪ ও ২৬ সুরা। কলি সংসারে, অহেতুক কর্ম্ম মানবের সাধ্যাতীত। সুতরাং মনুষ্যের সমস্ত কার্য্য লালসামূলক। সাংসারিক শান্তি ও সামাজিক উন্নতি বিধান কল্পে, কোরাণ মনুষ্যগণকে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি ঐহিক বিষয়ে চালিতা না করিয়া, ঈশ্বরাভিমুখিনী করিবার ব্যবস্থা প্রদান করে। ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার প্রসাদলাভোদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা এবং তাঁহার বিরক্তিকর কার্য্য হইতে বিরত হওয়াই, কোরাণের মূল মন্ত্র। আবার এই প্রক্রিয়াদ্বারাই যে, ক্রমশঃ, বাসনাক্ষয় নিষ্পন্ন হয়, তাহা জ্ঞাননেত্রোন্মীলিত হইলে দৃষ্টিগোচর করা যায়। 'ঈশ্বরের দাসত্ব কর এবং কোনও জীবে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিও না। পিতামাতা এবং স্বজনগণ, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ, সম্পর্কিত বা অসম্পর্কিত প্রতিবাসীগণ, অন্তরঙ্গ সহচরগণ ও যুদ্ধে বন্দীকৃত করায়ত্ত ব্যক্তিগণ সকলেই দয়া এবং প্রীতির পাত্র। যাহারা দাম্ভিক এবং গর্ব্বিত, বিদ্বেষবান, যাহারা, পরমেশ্বর তাহাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন, তাহার অপহ্নব করে এবং যাহারা লোকপ্রদর্শন জন্য ধন বিতরণ করে, তাহারা পরমপিতার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না।' কোরাণ, চতুর্থ সুরা। "আমরা তোমাদের নিকট কোনও প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া, কেবল ঈশ্বর-প্রীতির জন্য তোমাদিগকে ভোজন করাইতেছি" এই বলিয়া দরিদ্র, পিতৃমাতৃহীন এবং ক্রীতদাসজনগণকে খাদ্য প্রদান করিবে। কোরাণ ৭৬ সুরা। 'যিনি প্রত্যুপকারপ্রাপ্তি বা দত্তদ্রব্যবিনিময়ে মূল্যস্বরূপ ঐহিক প্রতিপত্তিলাভ বাঞ্ছা না করিয়া, ঈশ্বররঞ্জনার্থ ভিক্ষাদানে ধনব্যয় করেন, তিনি সর্ব্বেশ্বরদত্ত পুরস্কারে পরিতুষ্ট হন।' কোরাণ, ৯২ সুরা। অত্যধিক অনর্গল দানে যাহাতে আত্মনাশিনী উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না হয়, তজ্জন্য, দানকর্ম্মে বদান্যতাযুক্ত মিতাচারাবলম্বন আবশ্যক। "যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে,

'ভিক্ষাদানে কি পরিমাণ ধনব্যয় কর্ত্তব্য,' তাহা হইলে, 'সাংসারিক অবস্থানুসারে যাহা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত' এই উত্তর প্রদান বিধেয়।" কোরাণ, ৭৬ সুরা। সমাজবিঘাতিনী দুশ্চর্য্যার পরিহার কল্পে, কোরাণ, মানবগণকে নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতে উপদেশ দেয়। 'সাধারণ সমক্ষে কাহারও নিন্দাচর্চ্চা পরমেশ্বরের মনোনীত নহে। বিধাতা তোমাপেক্ষা অপরকে যে অধিক সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অসূয়া প্রকাশ করিও না।' কোরাণ, ৪র্থ সুরা। 'হে সত্যবিশ্বাসীগণ! অপর ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ, যত্নতঃ, পরিত্যাগ কর। কারণ কোনও কোনও সন্দেহ পাপ-স্বরূপ। অপরের দোষানুসন্ধানে কুতূহলী হইও না কিম্বা, অসাক্ষাতে, পরস্পর পরস্পরের কুৎসা করিও না।' কোরাণ, ৪৯ সুরা। নিম্নলিখিত কুক্রিয়া বা বিষয় সকল কোরাণে বিশেষরূপে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুরাপান এবং পণক্রীড়া (৫ম সুরা), অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চর্য্যা এবং সাংসারিক প্রত্যেকবিষয়ের অত্যধিক অনুষ্ঠান (৪,১৭ সুরা), কুসীদ গ্রহণ, (২য় সুরা), ধনতৃষ্ণা এবং গর্ব্ব (৪,১৭,১৮ সুরা), বিদ্বেষ (৪,৩৩ সুরা), কপটতা (৪,৬৩ সুরা), এবং ঐহিক প্রতিপত্তি পিপাসা (১০০,১০২ সুরা)। কোরাণে ব্যবসায়নীতিব্যাখ্যানে, পণ্যবিক্রেতা ন্যায় ও সাধুতানুসরণে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'ক্রেতাকে প্রকৃত মানে পণ্য প্রদান করিবে এবং কখনও প্রবঞ্চক হইও না। মূল্যের সহিত দ্রব্যের ন্যায্য তৌল করিবে এবং কোনও গ্রাহকের প্রতি, পণানুপাতে পণ্যের লাঘব করিয়া, অন্যায় ব্যবহার করিও না। মলিনাচরণদ্বারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করিও না।' কোরাণ, ২৬ সুরা। বস্তুতঃ, এই বিশাল ধর্ম্মশাস্ত্রে সংসার ও সমাজনীতি, সদাচারপদ্ধতি, ব্যবহার-তত্ত্ব প্রভৃতি সময়োপযোগী কর্ম্মযোগ-সূত্র বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্বের তিরোধানান্তর দ্বাদশ শত বর্ষাধিককাল গত হইলে, ভারতবর্ষে যখন আচার্য্যনামধারী দুর্বৃত্ত ধর্ম্মবিপ্লবকারীগণের কুপরামর্শে, মানবগণ শ্রীবুদ্ধের উপদেশমালা অবহেলা করিয়া, নানা কল্পিত উপদেবতার পূজা ও তৎসহ দারুণ ব্যভিচারে আসক্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে, পরমপিতা, ভারতবাসীগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য, একজন প্রকৃত আচার্য্য ভারত খণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ঈশ্বরপ্রেরিত শঙ্কর, ধর্ম্মাচার্য্যস্বরূপ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শৈশবেই তাঁহার অসামান্য জ্ঞানপ্রভা বিকীরিতা হইয়াছিল। কেরল প্রদেশান্তর্গত চিদম্বর গ্রামে যে সকল নাম্বুরি ব্রাহ্মণ বাস

করিতেন, তন্মধ্যে বিশ্বজিৎ ও তাঁহার পত্নী বিশিষ্টা, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত সমূহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ভগবদুপাসনাধর্ম্মপালনরত ছিলেন। সাধু বিশ্বজিৎ একলিঙ্গ মহেশ্বরের আরাধনা এবং তাঁহাকেই গুরুজ্ঞান করিতেন বলিয়া, 'শিবগুরু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শিবগুরু বিশ্বজিতের ঔরসে এবং বিশিষ্টা দেবীর গর্ভে, শাক্য অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে, খ্রীষ্টীয় ৭৮৯ অব্দে, ভুবনবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের জন্মঘটন হয়। অপত্যজন্মের বর্ষদ্বয় পরে, মাতা বিশিষ্টা শিশু শঙ্করকে লইয়া, মলবর প্রদেশে আগমন করেন এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ বিশ্বজিৎ, মধ্যে মধ্যে, এই স্থানে আসিয়া, দারাপুত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। পঞ্চম বর্ষীয় শঙ্কর যখন জননী সমক্ষে উপবেশন করিয়া, অনুপম মধুর বচনে পরমতত্ত্বের আলাপন করিতেন, তখন বিশিষ্টা দেবীর অন্তঃকরণ স্নেহবিস্ময়স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, আনন্দ সাগরে ভাসমান হইত এবং বিশ্বজিৎ গৃহে আসিলে, ভাগ্যবতী বিশিষ্টা পুলকগৌরবে স্বামী সকাশে এইরূপ নিবেদন করিতেন; 'পুরাণে যে বিমল-কীর্ত্তি শুকদেবের বর্ণনা আছে, ভগবান একলিঙ্গ প্রীত হইয়া, সেই শুকদেবকে পুত্রধন স্বরূপ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।' 'আমাদের নয়নরঞ্জন শঙ্কর জগতে কোনও মহৎ কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছে, আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে। সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হউক' এবম্বিধ স্বল্পবাক্যে শিবগুরু ভার্য্যার অনুমানানুমোদন এবং স্বয়ং মঙ্গলাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। স্বাভাবিক শাস্ত্রানুরাগ, বালবয়সে, শঙ্করকে বেদপুরাণাদি পাঠে প্রণোদিত করিল এবং বালক শঙ্কর বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ হস্তে লইয়া, নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয় সমূহে উপস্থিত হইতেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ, প্রথমতঃ, শঙ্করকে পরিহাস করিতেন; কিন্তু অনতিবিলম্বে শঙ্করের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ছাত্রনিচয় ত্রাসিত এবং অধ্যাপকবৃন্দ স্তম্ভিত হইতেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, সুধীবর শঙ্কর শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, যুবকগণ বহুকাল শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াও, শাস্ত্রবোধে তাঁহার সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। শঙ্কর দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, বিশ্বজিৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগে, নানা অসুবিধায় পতিত হইয়াও, শঙ্কর জ্ঞান-চর্চ্চায় বিরত হন নাই। শঙ্করের উদ্যম ও অধ্যবসায়, তাঁহার মেধার অনুরূপ ছিল। ফলতঃ চরিত্রগত ওজস্বিতা ও প্রতিভার অসাধারণ সমাবেশে, শঙ্কর বিদ্যাভিমানীগণের ভীতি উৎপাদন এবং সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

ষোড়শ বৎসর বয়সে শাস্ত্রাধ্যায়ন সমাপন করিয়া, শঙ্কর সন্ন্যাসব্রতাবলম্বন মনস্থ করিলেন। বাৎসল্যময়ী বিশিষ্টা, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, পুত্রকে সংসারে রাখিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষীণালোক যেমন প্রদীপ্তালোকের অন্তরে বিলীন হইয়া যায়, বিশিষ্টার স্বার্থসিদ্ধিবাসনা সেইরূপ শঙ্করের বিশ্বহিতকর মহৎ সংকল্পের অন্তর্নিহিত হইয়া গেল। কিশোর শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেন এবং কিয়ৎকাল যোগমার্গে বিচরণ করিয়া, স্বকীয় জীবনোদ্দেশ্য সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মানবগণের ভ্রান্তবিশ্বাস খণ্ডন করিয়া, তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মমত শিক্ষাদিতে, ধ্যানভগ্ন শঙ্করের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইল। তন্মুহূর্ত্তে, ভাস্কর সদৃশ প্রতাপশালী শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মবিচারদিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইলেন। তথাকথিত প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতা বা উপদেষ্টা সমীপে উপনীত হইয়া, পরমহংস শঙ্কর এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিতেন: 'বিচারে বিজিত বিজেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, এই পণবন্ধে বিচারপ্রার্থী এক ব্যক্তি সমুপস্থিত।' পাণ্ডিত্যাভিমানী দলপতিগণ আস্পর্দ্ধামূলক ঘোষণায়, আঘাত প্রাপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, শঙ্করকেশরীর পদানত হইবার জন্য, তাঁহার সহিত বিচারযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। বস্তুতঃ, শাস্ত্রমর্ম্মগ্রহাক্ষম গর্ব্বিত তার্কিক গণ, যাহাতে বটুকোপম শঙ্করকে অবহেলা না করিয়া, তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এই উদ্দেশ্যে, কোবিদ শঙ্কর তাঁহাদের অহঙ্কারে বেদনা দিয়া, তাঁহাদিগকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেন। অল্পকাল মধ্যে, অনেক প্রথিতনামা আচার্য্য বিচারসংগ্রামে শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন এবং শঙ্করের ধর্ম্মজ্ঞানখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিচারবিজিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অনেকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্যাষ্টক আনন্দগিরি, উতঙ্ক, লক্ষ্মণাচার্য্য, পদ্মপাদ, দিবাকরাচার্য্য, হস্তামলক, সুরেশ্বর ও পরমতকালানল মধ্যে সুরেশ্বর ব্যতীত অপর সকলেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। গুরুসেবাচিকীর্ষু শিষ্যবৃন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, শঙ্কর অতঃপর শিষ্য সমভিব্যাহারে পরিব্রজ্যা করিতে লাগিলেন। অন্তেবাসীগণ শঙ্করের ঘোষণাঙ্কিত পতাকা উর্দ্ধে ধারণ করিয়া, আচার্য্যের অনুগমন করিতেন। সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় মণ্ডন মিশ্রের বাসস্থান সমীপে উপস্থিত হইলে, মিশ্রভবন-সম্মুখে এক বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মিশ্রদম্পতি তৎকালে ভারতের গৃহস্থাশ্রমী পণ্ডিতকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেন। মিশ্র মহাশয় যেমন মহামহোপাধ্যায় আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিদুষী

পত্নী সেইরূপ উভয়ভারতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। পাণ্ডিত্য গণনায়, তাঁহাদের উপাধি যে গুণানুযায়ী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবগণ শঙ্করের গতি অবধান করিয়া, মিশ্রদম্পতির সহিত তাঁহার অনিবার্য্য সাক্ষাৎ পূর্ব্ব হইতেই অবধারণ করিয়াছিল এবং মহামহোপাধ্যায়ও উভয়ভারতীর সহিত শঙ্করের শাস্ত্রবিচার শ্রবণোৎসুক্যে বহুস্থানের লোক একত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের আহ্বান-গ্রহণ-জ্ঞাপন স্বরূপ, মণ্ডন মিশ্র প্রত্যুদ্গমন করিয়া, অভ্যাগত শঙ্করকে শিষ্যগণ সহ স্বালয়ে আতিথ্য স্বীকারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উভয় ভারতীর মধ্যস্থতায় শঙ্কর ও মণ্ডনের শাস্ত্রবিচার স্থিরীকৃত হইয়া, যথা সময়ে বিচার আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ বিচারের পর, প্রতিভাবান মণ্ডন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পার্থক্যোপলব্ধি করিয়া, স্বীয়পাণ্ডিত্যাভিমানমোহে বিশেষ লজ্জিত হইলেন। শাস্ত্রব্যাখ্যায় শঙ্করের যুক্তি যে অকাট্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মিশ্র মহাশয় তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। অতঃপর, উভয়ভারতী মাধ্যস্থ্য ত্যাগ করিয়া, স্বয়ং শঙ্করের সহিত বিচারে অবতীর্ণা হইলেন। তিনিও বহুতর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতালোচন এবং তৎসমস্ত যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা বোধগত করিয়া, অবশেষে ভর্ত্তৃপন্থানুসরণ করিলেন। মিশ্রদম্পতি শঙ্করের শিষ্যত্বে বরিত হইয়া, নামান্তর গ্রহণ করিলেন এবং এই ঘটনায় মণ্ডনমিশ্রের 'সুরেশ্বর' নাম ভারতে ধ্বনিত হইল। মণ্ডন ও উভয়ভারতীর পরাভব-বার্ত্তা ত্বরিত বেগে ভারত-ভূমির সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর, শঙ্কর যদিও মহারাষ্ট্র, পাণ্ড্য, চোল, দ্রাবিড়, কাঞ্চি, গোকর্ণ, দ্বারকা, উজ্জয়িনী, বাহ্লিক, মথুরা, কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, বঙ্গ, কোশল, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে বিচারানুসন্ধানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বল্প সংখ্যক পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং বিচারগামী প্রত্যেকেই পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপে, ভারতমহাসাগর হইতে হিমাচল এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভূভাগে পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মবিচারদিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রান্ত মতরাজি খণ্ডন করিয়া, পরমহংস শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান প্রবর্ত্তন জন্য, শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক মঠ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি, শঙ্করাচার্য্যের স্বকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরম্পরা হইতে প্রতীয়মান হয়, বৈদান্তিক দুর্ব্বোধ্য অদ্বৈতবাদ কিঞ্চিৎ

ষোড়শ বৎসর বয়সে শাস্ত্রাধ্যায়ন সমাপন করিয়া, শঙ্কর সন্ন্যাসব্রতাবলম্বন মনস্থ করিলেন। বাৎসল্যময়ী বিশিষ্টা, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, পুত্রকে সংসারে রাখিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষীণালোক যেমন প্রদীপ্তালোকের অন্তরে বিলীন হইয়া যায়, বিশিষ্টার স্বার্থসিদ্ধিবাসনা সেইরূপ শঙ্করের বিশ্বহিতকর মহৎ সংকল্পের অন্তর্নিহিত হইয়া গেল। কিশোর শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেন এবং কিয়ৎকাল যোগমার্গে বিচরণ করিয়া, স্বকীয় জীবনোদ্দেশ্য সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মানবগণের ভ্রান্তবিশ্বাস খণ্ডন করিয়া, তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মমত শিক্ষাদিতে, ধ্যানভগ্ন শঙ্করের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইল। তন্মুহূর্ত্তে, ভাস্কর সদৃশ প্রতাপশালী শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মবিচারদিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইলেন। তথাকথিত প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতা বা উপদেষ্টা সমীপে উপনীত হইয়া, পরমহংস শঙ্কর এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিতেন: 'বিচারে বিজিত বিজেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, এই পণবন্ধে বিচারপ্রার্থী এক ব্যক্তি সমুপস্থিত।' পাণ্ডিত্যাভিমানী দলপতিগণ আস্পর্দ্ধামূলক ঘোষণায়, আঘাত প্রাপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, শঙ্করকেশরীর পদানত হইবার জন্য, তাঁহার সহিত বিচারযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। বস্তুতঃ, শাস্ত্রমর্ম্মগ্রহাক্ষম গর্ব্বিত তার্কিকগণ, যাহাতে বটুকোপম শঙ্করকে অবহেলা না করিয়া, তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এই উদ্দেশ্যে, কোবিদ শঙ্কর তাঁহাদের অহঙ্কারে বেদনা দিয়া, তাঁহাদিগকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেন। অল্পকাল মধ্যে, অনেক প্রথিতনামা আচার্য্য বিচারসংগ্রামে শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন এবং শঙ্করের ধর্ম্মজ্ঞানখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিচারবিজিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অনেকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্যাষ্টক আনন্দগিরি, উতঙ্ক, লক্ষ্মণাচার্য্য, পদ্মপাদ, দিবাকরাচার্য্য, হস্তামলক, সুরেশ্বর ও পরমতকালানল মধ্যে সুরেশ্বর ব্যতীত অপর সকলেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। গুরুসেবাচিকীর্ষু শিষ্যবৃন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, শঙ্কর অতঃপর শিষ্য সমভিব্যাহারে পরিব্রজ্যা করিতে লাগিলেন। অন্তেবাসীগণ শঙ্করের ঘোষণাঙ্কিত পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া, আচার্য্যের অনুগমন করিতেন। সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় মণ্ডন মিশ্রের বাসস্থান সমীপে উপস্থিত হইলে, মিশ্রভবন-সম্মুখে এক বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মিশ্রদম্পতি তৎকালে ভারতের গৃহস্থাশ্রমী পণ্ডিতকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেন। মিশ্র মহাশয় যেমন মহামহোপাধ্যায় আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিদুষী

পত্নী সেইরূপ উভয়ভারতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। পাণ্ডিত্য গণনায়, তাঁহাদের উপাধি যে গুণানুযায়ী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবগণ শঙ্করের গতি অবধান করিয়া, মিশ্রদম্পতির সহিত তাঁহার অনিবার্য্য সাক্ষাৎ পূর্ব্ব হইতেই অবধারণ করিয়াছিল এবং মহামহোপাধ্যায় ও উভয়ভারতীর সহিত শঙ্করের শাস্ত্রবিচার শ্রবণোৎসুক্যে বহুস্থানের লোক একত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের আহ্বান-গ্রহণ-জ্ঞাপন স্বরূপ, মণ্ডন মিশ্র প্রত্যুদ্গমন করিয়া, অভ্যাগত শঙ্করকে শিষ্যগণ সহ স্বালয়ে আতিথ্য স্বীকারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উভয় ভারতীর মধ্যস্থতায় শঙ্কর ও মণ্ডনের শাস্ত্রবিচার স্থিরীকৃত হইয়া, যথা সময়ে বিচার আরম্ভ হইল। কিয়ংক্ষণ বিচারের পর, প্রতিভাবান মণ্ডন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পার্থক্যোপলব্ধি করিয়া, স্বীয়পাণ্ডিত্যাভিমানমোহে বিশেষ লজ্জিত হইলেন। শাস্ত্রব্যাখ্যায় শঙ্করের যুক্তি যে অকাট্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মিশ্র মহাশয় তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। অতঃপর, উভয়ভারতী মাধ্যস্থ্য ত্যাগ করিয়া, স্বয়ং শঙ্করের সহিত বিচারে অবতীর্ণা হইলেন। তিনিও বহুতর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতালোচন এবং তৎসমস্ত যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা বোধগত করিয়া, অবশেষে ভর্ত্তৃপন্থানুসরণ করিলেন। মিশ্রদম্পতি শঙ্করের শিষ্যত্বে বরিত হইয়া, নামান্তর গ্রহণ করিলেন এবং এই ঘটনায় মণ্ডনমিশ্রের 'সুরেশ্বর' নাম ভারতে ধ্বনিত হইল। মণ্ডন ও উভয়ভারতীর পরাভব-বার্ত্তা ত্বরিত বেগে ভারত-ভূমির সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর, শঙ্কর যদিও মহারাষ্ট্র, পাণ্ড্য, চোল, দ্রাবিড়, কাঞ্চি, গোকর্ণ, দ্বারকা, উজ্জয়িনী, বাহ্লিক, মথুরা, কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, বঙ্গ, কোশল, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে বিচারানুসন্ধানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বল্প সংখ্যক পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং বিচারগামী প্রত্যেকেই পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপে, ভারতমহাসাগর হইতে হিমাচল এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভূভাগে পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মবিচারদিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রান্ত মতরাজি খণ্ডন করিয়া, পরমহংস শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান প্রবর্ত্তন জন্য, শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক মঠ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি, শঙ্করাচার্য্যের স্বকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরম্পরা হইতে প্রতীয়মান হয়, বৈদান্তিক দুর্ব্বোধ্য অদ্বৈতবাদ কিঞ্চিৎ

বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল করিয়া, সংসারী জনগণ সমক্ষে উহা উপস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। শঙ্কর স্বয়ং মধুর স্তোত্রাদি বিরচনে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার, তিনি যে সকল শাস্ত্র-ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেও, সংসারী মানবগণকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিশেষতঃ, বিভিন্ন সময়ে ভগবদ্প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ঘোরমতবিরোধ ভঞ্জনকল্পে, শঙ্করাচার্য্য বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ-মূর্ত্তির অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। জীবাত্মার মুক্তি সম্বন্ধে ভগবদুপদেশ, যাহা কপিলমুনি স্বরচিত সাঙ্খ্য গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ, ক্রমশঃ, তাহার এইরূপ অর্থগ্রহ করিলেনঃ প্রত্যেক মনুষ্যের পৃথক আত্মা আছে এবং জড়জগতের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক-বিচ্ছেদে জীবাত্মা মুক্ত হয়। মুক্তিবাদী পণ্ডিতগণের দল গঠিত হইবা মাত্র, সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবে, তদ্বিরোধী অপর একটী পণ্ডিতদলেরও সৃষ্টি হইল। এই শেষোক্ত দল, শ্রীবুদ্ধ-ভাবিত নির্ব্বাণ-তত্ত্বের প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শন-ছলে, মুক্তিবাদীগণের মত খণ্ডন এবং নির্ব্বাণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা বলিতে লাগিলেন, আত্মার বিদ্যমানতায়, জড়জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ছেদ অসম্ভব; সুতরাং প্রত্যেক আত্মার নির্ব্বাণ বা সম্পূর্ণ লয় হওয়া আবশ্যক। উভয়দলের বিবাদ মীমাংসার্থ, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে প্রকৃত তথ্য উপদেশ করিলেন। একব্রহ্ম হইতে সমস্ত জড়জগৎ ও আত্মা সঞ্জাত হইয়াছে এবং সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। আত্মার মুক্তি বা নির্ব্বাণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত সন্দেহ নাই; কিন্তু পণ্ডিতগণ যেরূপে মুক্তি বা নির্ব্বাণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে সমস্ত আত্মা একে একে মুক্ত বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে, সৃষ্টির লোপ হয়। ফলতঃ এতদ্বারা পরমহংস শঙ্করাচার্য্য যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ইঙ্গিত করিতেছেন, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, সুধী রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সুচারু ব্যাখ্যা নিষ্পাদন করিয়াছেন। আচার্য্য-চূড়ামণির উক্ত প্রবচনকে মূল সূত্র ধরিয়া, তদ্‌বিশ্লেষণে, এই পুস্তকে সৃষ্টিপ্রকরণে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নিরাকার পরব্রহ্ম সৃষ্টিকরণ বাঞ্ছায়, স্বীয় সৃষ্ট বিস্মৃতি মধ্যে নিজ জ্যোতিঃ শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া, দেব ও দানবগণ ব্যতীত, স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশ-পর্য্যায়ে, জড় ও জীব জগতের সৃষ্টি করিলেন এবং কুশলী পরমপিতা স্বেচ্ছায় স্বসৃষ্ট দেব ও দানবগণকে বিকাশ প্রক্রিয়াধীন করিলেন না। অপিচ, এই মঙ্গল কার্য্যে, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণঈশ্বর

স্বরূপ জীবের জ্ঞানগম্য হইলেন। জড়জগৎ হইতে, অনবরত, সূক্ষ্মবিকাশ-পর্য্যায়ে জীবের উৎপত্তি হইতেছে। সুতরাং, জীবাত্মা মুক্ত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে মিলিত হইলেও, যতকাল ব্রহ্মাণ্ডস্থিতি বাঞ্ছাময়ের বাঞ্ছিত, ততকাল-মধ্যে কোনও ক্রমে সৃষ্টির লোপ হইবে না। পরন্তু তাঁহার জ্যোতিঃ ও শক্তিভূত জীবাত্মা বিস্মৃতিজাল ছেদন করিয়া, তাঁহাতে মিলিত হয়, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের অভিপ্রেত এবং সৃষ্টির গূঢ় রহস্য। বিস্মৃতিজাল ছেদন করিতে জীবের অনেকবার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যাহাতে জীব মুক্তিলাভে হতাশ হইয়া, কর্ম্মযোগে বীতশ্রদ্ধ না হয়, এতদুদ্দেশ্যে, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীমোহম্মদ জন্মান্তর-তত্ত্বের কোনও উল্লেখ না করিয়া, মানবকে তাহার বর্ত্তমান জীবনে উদ্যম সহকারে কর্ম্মদ্বারা মুক্তিলাভের উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপ কুঞ্জিকা দ্বারা, সৃষ্টি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা যায়।

ত্রয়োদশ বৎসর অবিরাম পরিশ্রম করিয়া, কিঞ্চিদধিক একত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম-কাল মধ্যে শিবগুরুনন্দন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্কর ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর, দয়াময় বিভু, শান্তিপারিতোষিক প্রদান করিবার জন্য, তাঁহার প্রিয়ভৃত্যকে সাদরে স্বনিকটে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শঙ্করের জীবনকাল পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। দ্বিগ্বিজয় কার্য্য সমাধানান্তর, শঙ্কর তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যে, প্রথমতঃ, বদরিকাশ্রমে এবং পরে তথা হইতে কেদার খণ্ডে গমন করেন। পুণ্যতীর্থ কেদারক্ষেত্রে, দ্বাত্রিংশৎবর্ষ বয়সে, শঙ্কর জীবনাভিনয় শেষ করিলেন। মধ্যাহ্ণ-তপন অস্তমিত হওয়ার ন্যায়, শঙ্করের জীবলীলা-সম্বরণ মানবচক্ষে বিসদৃশ ও বিষাদময় প্রতিভাত হয়।

শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবে, তদীয় শিষ্যকুল তাঁহার সুশিক্ষাফল, যত্নতঃ, স্নিগ্ধ রাখিলেন। কিন্তু একে একে শিষ্যগণের জীবনাবসানে, ক্রমশঃ, উহা বিস্মৃতি-যোগে বিকৃত হইতে লাগিল। শঙ্করান্তর্ধানান্তর সার্দ্ধষট্‌শতাব্দী মধ্যে গৌড় প্রদেশে 'তান্ত্রিক' নামধারী বহু ধর্ম্মধ্বজীর প্রাদুর্ভাব হইল। ইহারা বাহাড়ম্বরে লোকের মনোহরণ করণাভিপ্রায়ে, ললাটে রক্তচন্দনানুলেপন, শির, বাহু ও গলদেশে রুদ্রাক্ষমালাধারণ এবং নরকরোটিপানপাত্র ব্যবহার করিয়া, সমাজে নানাপ্রকার পরুষাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তন্ত্রের কদর্থ সাধন করিয়া, এই সকল পশুপ্রকৃতি নীচাশয় মানব কল্পিত পিশাচ নিচয়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল এবং সমাজে পিশাচপূজা প্রবর্ত্তিত করাইল। এইরূপে, অঘোরপন্থীগণের অত্যাচারে যখন গৌড়সমাজ বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, সেই সময়ে প্রেমপারাবার

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু নদীয়ায় সমুদিত হইলেন। শ্রীনিগাইচৈতন্য পুণ্যচেতা জগন্নাথমিশ্রের জনকত্ব ও সাধ্বী শচীদেবীর জননীত্বে শাক্য ১৪০৮ অথবা খ্রীষ্টীয় ১৪৮৬ অব্দে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং গৌড় ও উৎকল ক্ষেত্রকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়া, যথাসময়ে তিরোহিত হইলেন। গৌরাঙ্গসূর্য্য অস্তগত হইলে, কলুষধ্বান্ত পুনরায় গৌড়খণ্ড আক্রমণ করিল এবং শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গভূমির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। বঙ্গগ্রাসকারিণী সার্দ্ধদ্বিশতোর্দ্ধবর্ষ-ব্যাপিনী কল্মষরজনীর অধিকারে, বঙ্গীয়জনগণ মোহতন্দ্রাবশে, সনাতনধর্ম্মরূপ স্থির প্রদীপ উপেক্ষা করিয়া, খদ্যোতিকা সদৃশী বৈদেশিকসভ্যতার আলোক প্রাপনাশায়, ব্যাকুলান্তঃকরণে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। বঙ্গসমাজ যখন সর্ব্বাঙ্গে বৈদেশাচারকণ্টকানুবেধযাতনায় পীড়িত ও জর্জ্জরিত হইতেছিল, সেই সময়ে বঙ্গীয় গগনে, পুনরপি, পাপনিশাবসানকারিণী বালারুণাঙ্কা পুলক-দায়িনী উষাদেবীর মঙ্গলাবির্ভাবকল্প শ্রীরামকৃষ্ণের শুভজন্ম সংঘটিত হইল। শ্রীগদাধর সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরাম শর্ম্মার ঔরসে ও পতিব্রতা চন্দ্রমণিদেবীর গর্ভে ১৭৫৬ শকে, খ্রীষ্টীয় ১৮৩৫ অব্দে বঙ্গের হুগলী বিভাগে জন্মপরিগ্রহ করিলেন এবং পবিত্র রামকৃষ্ণনামধারণে, সনাতনধর্ম্মের অদ্বৈত ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনিচয়ের ঐক্যপ্রতিপাদনে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া, অন্তর্ধান করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের লীলামহিমা, অনেক সুধী ও সুলেখকজন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং অপটুহস্তে এ পুস্তকে তাহার অঙ্কন-প্রয়াস অনাবশ্যক। রামকৃষ্ণাবতারের আধুনিকতা নিবন্ধন, তৎসম্বন্ধে বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে যে সংশয় পোষিত হইতেছে, তাহা অচিরে বিদূরিত হইবে।

জীবকুলের হিতবিধান কল্পে, মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তা যে অবতাররূপে তাহাদের সংস্পর্শে আগমন করেন, মোহবশে, অকৃতজ্ঞ মানবজাতি মধ্যে অনেকেই তাহা অনুভব করিতে পারে না এবং কেহ কেহ অনুভব করিয়াও, বিস্মৃত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, শ্রীমোহম্মদ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রত্যেকেরই মানবের বিরুদ্ধাচরণ প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল এবং প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে শিষ্যের গঞ্জন সহ্য করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীযীশুর প্রতি শিষ্যকৃত ব্যবহার অধিকতর ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছিল। শ্রীবুদ্ধের প্রথম শিষ্যপঞ্চক, বনমধ্যে ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। দয়ালু প্রভু, অনুসন্ধান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে পুনরায় স্বীয় পবিত্র

আশ্রয়ে আনয়ন করেন। শ্রীযীশুখ্রীষ্টের শিষ্য জুদাস্, ইহুদীয় ধর্ম্মযাজকগণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া, যাহাতে প্রভু শত্রুহস্তে পতিত হন, তাহার উপায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। জুদাস্ অবশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, আত্মহত্যাদ্বারা এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ক্ষয়কারিণী বিস্মৃতির বিষময় স্পর্শে ধর্ম্মের কোমল অঙ্গে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহার আরোগ্য করণ জন্য, ভগবান অবতার রূপে ভূতলে আবির্ভূত হন। প্রত্যেক অবতারাবতরণে ধর্ম্ম-সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ হইলেও, কলিযুগের গাঢ়বিস্মৃতি প্রভাবে, অবতারান্তর্ধানান্তর অনতিকাল মধ্যে, ধর্ম্মগাত্রে পুনরায় ক্ষত সঞ্জাত হইয়া, তাহা হইতে পূতিগন্ধ নির্গত হইতে থাকে এবং কলির অগ্রসরে বিস্মৃতির গাঢ়ত্ব যত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অবতারতিরোধানে ধর্ম্মাঙ্গবিকৃতি তত শীঘ্র সমাহিত হইতেছে। শ্রীবুদ্ধ মানবগণকে উপদেশ দিয়াছেন, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম। বাসনাবিনাশ ব্যতীত জন্মপরিগ্রহ নিরাকরণের উপায় নাই।' এক্ষণে যাঁহারা আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা, যত প্রকার জীবমাংস আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তৎসমস্ত প্রাণীবধ করিয়া, পিশিতাশনে উদরপূর্ত্তি ও রসনা-পরিতৃপ্তি করেন। শ্রীযীশুখ্রীষ্টমৈত্রেয়বুদ্ধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও বিনয় শিক্ষা দিবার জন্য, মানবকে বলিলেন, 'যদি কেহ তোমার একগণ্ডে চপেটাঘাত করে, তুমি অপর গণ্ডও প্রহর্ত্তার ইচ্ছাধীনে পাতিত করিবে।' এক্ষণে, যাঁহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান ও সুসভ্য বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন, তাঁহারা বাহ্যোত্তেজনা ব্যতিরেকেও, জীবের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে লজ্জানুভব করেন না। সমাজে একতা, সৌহৃদ্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন কল্পে, শ্রীমোহম্মদ দান, তিতিক্ষা ও পরনিন্দাবর্জ্জনাদি করিতে যে সকল উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন মোস্‌লেমগণ আত্মকলহ, ভ্রাতৃবিরোধ এবং পরস্বগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সংসারী মানবকে, নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়া, ভগবদ্‌গুণগান ও ঈশ্বরনামমহিমা কীর্ত্তন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণবগণ অঙ্গে তিলকাঙ্কন এবং গলে তুলসীমালা ধারণ করিয়া, বৈষয়িক আলাপন, ব্যবসায় চর্চ্চা এবং রতিবিলাসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। আবার, পরবর্ত্তী অবতারগণের উপদেশাবলম্বন না করিয়া, যাঁহারা ভগবদ্ প্রচারিত পৌরাণিক শিক্ষা, পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারোপদেশ কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানী ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ-প্রদর্শিত উপায় মতে ধর্ম্মানুসরণ করেন বলিয়া বিজ্ঞাত হন, তাঁহারাও সময়

প্রভাবে, ধর্ম্মের মূল মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া, নানারূপ ধর্ম্মবিগর্হিত আচারানুষ্ঠানে পাপমাত্রা পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। প্রত্যেকের আভ্যন্তরিক বৈকৃত স্বত্বেও, বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের কুৎসায় ব্যাপৃত এবং প্রত্যেকেই স্বসম্প্রদায়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। এইরূপে, কলিযুগে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, ইহুদীয়, জোরোস্ত্রীয়, বৌদ্ধ, জৈন বা মহাবীরপন্থী, খৃষ্টীয়ান্, মোস্‌লেম, শিখ বা নানকপন্থী প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী এবং সকলেই স্বস্ব বাহু সামর্থ্যানুযায়ী অপর সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার-প্রয়াসী। উপরোক্ত সম্প্রদায়নিচয়ান্তর্গত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে, তাহারাও একই ভাবে অনুপ্রাণিত। পরস্পর বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ এই সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়, এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং তদ্দ্বারা এক মহাধর্ম্ম পালন করাই যে সকলের সাধারণ ব্রত, তাহা দেখিতে পায় না; প্রত্যুত অন্য সম্প্রদায়ের মর্ম্মস্পৃক্ ব্যবহারানুষ্ঠানে ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করা হয় এবং ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রত্যেক সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায়ের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করে। এইরূপে, পরস্পরকলহে, কলিসংসারে প্রবল অশান্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। ফলতঃ যে সকল অসভ্যজাতি কখনও ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হয় নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে, ধর্ম্মোপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের ন্যায় জঘন্যাচরণ করিয়া থাকেন। এমন কি, কৌশলমূলক কপটাচার, মিথ্যাকথন, পরনিন্দা, অমিতচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ে, তথা-কথিত সভ্যগণ অসভ্যগণকেও উত্তমরূপে অতিক্রম করেন। এবম্প্রকারে কলিযুগে, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়াছে এবং কলিকালগতিবিষয়ক ঋষিগণপ্রবচন বর্ণে বর্ণে প্রমাণীকৃত হইতেছে। এই তিমির যুগে, জগতের উল্লিখিত ধর্ম্মসম্প্রদায়-নিচয় যে সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক-মানব-শূন্য, তাহা নহে। যদিও সংখ্যায় অল্পীয়ান্, তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ধর্ম্মশীল মতিমান শ্রদ্ধাস্পদ জনগণ বিরাজ করিতেছেন এবং এই সকল মহানুভববৃন্দের অস্তিত্বে একদিকে যেমন ভীষণ ধর্ম্মবিপর্য্যয় মধ্যেও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, অন্যদিকে, তেমনি, এক চতুর্থাংশ মাত্রায় ধর্ম্মবিদ্যমানতারূপ ঋষিবাক্যের সত্যতা রক্ষিত হইতেছে।

পুরাণকারগণ, ৪৩২০০০ বৎসর ধরাতলে কলিযুগস্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে মানবের পাপাচারস্রোতঃ ক্রমবর্দ্ধমানবেগে

প্রবাহিত হইবে। মনুষ্যগণ বিস্মৃতির গাঢ়-বিলেপন-মণ্ডিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল পশুজীবন যাপন করিতে থাকিবে। তাহাদের অন্তঃকরণ সুরুচি-বর্জ্জিত ও কুরুচি-কলুষিত হইয়া, ভীষণ শ্মশান সদৃশ হইবে। ধরণীর কোনও অংশে, পরিবার ও সমাজবৃত্তের চিহ্ন থাকিবে না। নরাকৃতি রাক্ষসগণ কোনও পারিবারিক ও সামাজিক বিধি পালন করিবে না। তাহারা স্বস্ব কাম এবং বুভুক্ষা চরিতার্থকরণ কল্পে, সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক-বন্ধন ছেদন করিয়া, যৎপরোনাস্তি দুর্বৃত্ত ও যথেচ্ছাচারী হইবে। কলিবিলয়ের পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা জড়জগৎ হইতে সূক্ষ্ম বিকাশ প্রক্রিয়ার নিরোধ করিবেন। হতভাগ্য মানবগণ জঠর-জ্বলনে খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বিশেষে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দ্রুম, লতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি যাবতীয় নরেতর জীব ও উদ্ভিদ্ উদরসাৎ করিয়া, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ প্রয়াসে, পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন এই প্রকার পৈশাচিক জীবন সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া পাপের মাত্রা পরিপূর্ণ হইবে, তখন, কল্কি-অবতারাবির্ভাব সম্বন্ধে ঋষিগণের ভবিষ্যৎ প্রবচন সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। ভগবান রুদ্রবিচারকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অবনীতলে আবির্ভূত হইবেন এবং কৃপাণ হস্তে লইয়া, সূক্ষ্মতম ন্যায়-বিচার নিষ্পাদন করিবেন! এই বিচার কালে, সর্ব্বেশ্বরের আদেশ পালন জন্য, দেব ও দানবগণ আজ্ঞাপেক্ষ হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিবেন। যে কতিপয় পুণ্যাত্মা প্রাণী তৎকালে নরদেহে বিরাজ করিবেন, তাঁহারা প্রভুর পদোপান্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার দাসত্বকরণে অধিকারী হইবেন এবং বিচারশেষে পরমপিতার চিরশান্তিময় ক্রোড় লাভ করিবেন। অধর্ম্মী দুরাচারগণ, তাহাদের ঘোর দুষ্কৃতিফলে, বিচারপতির অপ্রতিরোধ্য আজ্ঞায় জড়ে পরিণত হইবে। হিতকামী জনগণ, প্রলয়-প্রাক্কালের ভয়াবহ দুঃখ ও উৎকট পরীক্ষা বর্জ্জনোদ্দেশ্যে, সংসার ও কাল-চক্রে ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া, শেষ বিচার সময়ের পূর্ব্বেই ভগবৎপাদপদ্মলাভে সচেষ্ট হন। আন্তরিক প্রযত্নবলে যাঁহারা অভীষ্ট সাধনে অকৃতকার্য্য হন, তাঁহাদেরও হতাশ হইবার কারণ নাই। যেহেতু, বিচার সময়ে ধার্ম্মিকগণ তাঁহাদের সদুদ্যম ও মহদধ্যবসায়ের পুরস্কার স্বরূপ, কল্কিমহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দে সারাৎসারে লীন হইতে পারিবেন। অপিচ, ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় অবস্থিতি করা নিবন্ধন, জীবন পরম্পরায়, সংসারতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। মোহতমসাচ্ছন্ন কলিযুগে, ধর্ম্মপথ

নির্দ্ধারণ জন্য, অবতার ও ঋষিবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং মহাজনগণের পদ-চিহ্নানুসরণ করাই, শ্রেয়স্কামী সংসারী মানবের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুরাণ-কারগণের কালগণনাসঙ্কেতে, পুনরায় পৃথিবীলোকে সত্য যুগের আবির্ভাব অনুমান করা যায়।

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত সমন্বয় গ্রন্থে কালচক্র নামা
চতুর্থ অধ্যায়।

অন্ধচেষ্টিতনামা পঞ্চম অধ্যায়।

অপরাবিদ্যা ও স্থূলদর্শন।

দ্বাপরযুগবিলয়ে ঋষিগণের অন্তর্ধান সহ, পরাবিদ্যা ভূতল হইতে অপাস্তা হইল, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে, যেমন কিয়ৎকাল পশ্চিম গগনে রবিকররক্তিমছটা দৃষ্টিগোচর করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার তিরো-ভাবে, যাহাতে কলিমানব কিঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞান-জ্যোতিঃ অনুভব করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্দর্শী উদারচেতা ঋষিগণ গ্রন্থে পরাবিদ্যাবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উহা অবনীমণ্ডলে রাখিয়া গেলেন। মধুচক্রের ন্যায় এই সকল সার-তত্ত্বগর্ভ গ্রন্থ ধীরভাবে আমৃষ্ট করিয়া, কলিনরকুল বহুকাল ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদন করিতে পারিত। কিন্তু মোহজ গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য নিবন্ধন, কলির প্রারম্ভে, মান-বগণ এই সমস্ত পবিত্র পুস্তক-নিবদ্ধ পরমতত্ত্ব-নিচয়ে অবকর নিক্ষেপ করিয়া, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং এইরূপে, ঋষিগণ মনুষ্যহিতকল্পে যে পরাবিদ্যাপ্রভা গ্রন্থে সংরক্ষিতা করিয়াছিলেন, তাহা অল্পকাল মধ্যে মলিন হইয়া গেল।

যেমন চক্ষুহীনতায় দর্শনাভাবে, অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারা জড়দ্রব্যের অনুভূতি করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ, পরাবিদ্যার অভাবে, সাধারণ ব্যবহারিক বিদ্যার নিরতিশয় চর্চ্চা দ্বারাও, কেবল যে পরমতত্ত্বের অবগতি করা যায় না, তাহা নহে; পরন্তু কোনও সূক্ষ্মবিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি বা নিশ্চিত বোধ লাভ করা যায় না। কারণ, মন বা সূক্ষ্মশরীরের নেত্র সদৃশ চিত্তস্তর পরবিদ্যা দ্বারা উন্মীলিত বা বিকসিত হয়। . পরাবিদ্যেতরা অপরাবিদ্যা মানবের বুদ্ধিস্তর পর্য্যন্ত সমুত্থিতা হইতে পারে এবং তদূর্দ্ধে আর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যেমন অন্ধ ব্যক্তি হস্ত পদাদিদ্বারা হস্তীর শুণ্ডকর্ণাদি স্পর্শ করিয়াও, করীর স্বরূপাবধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ, বিশেষ বুদ্ধি সহকারে সাধারণী বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা,মানব কোনও সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ বা আমূল নির্ণয় করিতে পারে না। অপরাবিদ্যাবলে, নিউটন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু, কবে কিরূপে মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিউটন বলিতে পারেন নাই এবং কোনও মানবই—যতই বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান পরিগণিত হউন—উহা

বলিতে পারেন না। পরাবিদ্যা সাহায্যে সূক্ষ্মতম বিষয় সকলও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যায়। কারণ, যদিও এক্ষণে পরাবিদ্যা তিমিরাবৃত মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছে, তথাপি, একান্তমনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, দয়াময় উহা মানবকে প্রদান করেন। যদিও সংখ্যায় অল্প, তথাপি, কলিযুগে জ্ঞানীগণ ধরাপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন, ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহারা সাধনাবলে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু যুগপ্রভাবে, সাধারণে পরবিদ্যাসঞ্চার করিতে পারেন না।

যেহেতু একমাত্র পরাবিদ্যাদ্বারা মানবের চিত্তোন্মেষ ও চিত্তের পরিস্ফুটন দ্বারা মানবের জ্ঞানার্জ্জন সম্পূর্ণ হয় এবং জ্ঞানবলে ভ্রান্তির অপনোদন করা যায়, সুতরাং জগতে কেবল পরাবিদ্যাশালীব্যক্তিগণই বিশুদ্ধ বা ভ্রান্তিরহিত কার্য্য সমাধান করিতে পারেন। অপরাবিদ্যা সাহায্যে বুদ্ধিবলে মানবগণ যে কার্য্য সাধন করেন,তাহা যত নৈপুণ্যসহকারেই সাধিত হউক না কেন, সম্পূর্ণ শুদ্ধ বা ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্যে ভ্রান্তির ন্যূনাধিক্য হইতে পারে মাত্র। কলিযুগে আদৌ পরাবিদ্যার চর্চ্চা না থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ;' 'ভ্রমকরণ মনুষ্যের স্বভাব' (To err is human) ইত্যাদি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' এই বাক্যে 'মুনীনাম্' শব্দের 'যাঁহারা এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন যে মুনিগণের সহিত উপমিত হন, তাঁহাদের' এইরূপ দার্শনিক অর্থ নিষ্পাদন করাই সঙ্গত। কারণ, প্রকৃত মুনি বা জ্ঞানীগণের কখনও মতিভ্রম হয় না। আবার, ভ্রান্তিযুক্ত কার্য্য যে সম্পূর্ণ শুভফল প্রসব করে না, তাহা আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতায় সচরাচর অনুভব করিয়া থাকি। বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্যে মানবকার্য্যে যেমন ভ্রমের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, সেইরূপ ভ্রমের তারতম্যে কার্য্যফলে অশুভ মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। পরিপক্কবুদ্ধিসহকারে অপরাবিদ্যায় যে কার্য্য সাধিত হয়, তাহাতে শুভাশুভ উভয়ই উৎপন্ন হয়; কিন্তু অপরিণতবুদ্ধিমানব বিদ্যামদে মত্ত হইয়া যে কার্য্য সাধন করে, তাহাতে কেবল অশুভ সংঘটিত হয়। ফলতঃ, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে, জ্ঞানীগণ সর্ব্বাবস্থা পরিদর্শন করিয়া, বিশুদ্ধ সমাজনীতি ও নির্ম্মল কার্য্যাবলী দ্বারা সংসারের যে পরিমাণ কল্যাণ বিধান করিতে পারিতেন, কলিযুগে মানবগণ ভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতিবিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ভূয়িষ্ঠ গর্ব্ব করিয়া, তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারেন না। পরবিদ্যাবলে জ্ঞানীগণ যে নিয়মপ্রবর্ত্তন করিতেন, তাহা ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত

নিয়মের ন্যায় সম্পূর্ণ ও সর্ব্বত্রপ্রযোজ্য। তাহার উপবিধি নাই বা তাহা কুত্রাপি বর্জ্জনীয় নহে। কারণ, জ্ঞানীগণ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার আদেশে নিয়ম-বিরচন করিতেন। ক্ষীণদৃষ্টি মানবগণ যেমন ঐশ্বরিক নিয়মের সাম্পূর্ণ্য দেখিতে পায় না, সেইরূপ জ্ঞানীগণপ্রবর্ত্তিত নিয়মের গুরুত্বও অনুভব করিতে পারে না। অপরাবিদ্যাবলে মানবগণ যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তাহা অসম্পূর্ণ। উহা স্থানবিশেষে সময়ে সময়ে প্রযোজ্য হইলেও, সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে প্রযোজ্য নহে। এজন্য কলিযুগে, 'প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে' (every rule has its exception) ইত্যাকার প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার স্থূল পার্থক্য এই যে, পরাবিদ্যা যেমন নির্ব্বেদ ও নির্বৃ তি শিক্ষা দিয়া, মানব মনকে ঈশ্বরাভিমুখ করে, অপরাবিদ্যা তেমনি ঐহিক ভোগ পারিপাট্য শিক্ষা দিয়া মানবমন জড়পদার্থে আসক্ত করে। মানবগণ যাহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যসম্পাদনে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারে, তাহা-দিগকে তদুপদেশ প্রদান ও তৎকর্ম্মে নিয়োগকরণে সংসারের হিতসাধন করা হয়, ইহা পরাবিদ্যাব্যুৎপন্ন জ্ঞানীগণের অভিমত। পক্ষান্তরে, অপরাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, যাহাতে মানবগণ আহারবিহারাদি ক্রিয়ায় সুখে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদুপায় প্রবর্ত্তন এবং মানবগণকে প্রবর্ত্তিত উপায়ের সুবিধাগ্রহণক্ষম করায় জগতের প্রকৃত উপকার করা হয়। অতএব, মোহ, অর্থলিপ্সা ও বিলাসিতাপালিনী অপরাবিদ্যা কলিযুগের সম্পূর্ণ উপযুক্তা। অপরাবিদ্যারূপ তরণি আশ্রয় করিয়া, কলিযুগে মানবগণ অর্থ ও বিলাসিতা-বাণিজ্যোদ্দেশ্যে মোহসমুদ্রে ভাসমান হয়। কলিমানব যশঃ, মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশায়, অপরাবিদ্যামরীচিকায় পতিত হইয়া, দারুণ দুঃখভোগ করে। অপরাবিদ্যাপ্রভাবে, মানব, মনের নিম্নস্তর সঙ্গত নানাবিধ কুহকশিল্প প্রদর্শন করে। মনুষ্যগণ অপরাবিদ্যা-মোহে অবাস্তব সুখদুঃখ কল্পনা করিয়া, তাহার প্রাপ্তি বা বিমোচন প্রয়াসে, সংসারে নানারূপ বাস্তব দুঃখ সমুৎপাদন করে। এইরূপে, অপরাবিদ্যার বহুল প্রসার এবং তথাকথিতা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উন্নতি স্বত্বেও, কলিতিমির অপচিত না হইয়া, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

কলিযুগে সর্ব্বপ্রথমে যিনি অপরাবিদ্যার প্রতিবিম্বাঙ্কন করেন, তিনি কলি-মানবের চরম বা আদর্শ সামর্থ্য সহকারে সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাচিত্র প্রতিফলিত করণে অপরাবিদ্যার বরপুত্র কালিদাসের সমকক্ষ ভূমণ্ডলে

কেবল যে তৎকালে কেহ ছিলেন না এমন নহে; পরন্তু ভবিষ্যতে ইঙ্গদেশীয় সেক্ষপীয়র ব্যতীত, এযাবৎ কেহই তাঁহার সমতুল হইতে পারেন নাই। ফলতঃ, কালিদাস-কবিতার বীণাঝঙ্কারে মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া, হিন্দু-সমাজ বীণাপাণি সরস্বতীদেবীর কল্পনা ও কালিদাসকে বাগ্দেবীর প্রিয়তম পুত্র অভিহিত করিয়াছিল। এই সময় হইতেই হিন্দু সমাজে সরস্বতী-পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিতা হয়। ঐন্দ্রজালিককালিদাসকাব্য ময়দানবনির্ম্মিত বিচিত্র রম্যোপবন সদৃশ। মধুর অর্থসঙ্গতবাক্যপংক্তি ইহার মনোজ্ঞ হরিৎপত্রশোভিত সজ্জিততরুশ্রেণী। উদ্যানাভ্যন্তরে পদবিটপীদল আশ্রয় করিয়া, উপমাকনকলতা ভাবমলয়ানিলহিল্লোলে দোদুল্যমানা হইতেছে; নবরসের বিভিন্ন কৃত্রিম উৎস অবিরাম রসোদ্গার করিতেছে; যেস্থলে যেরূপ আবশ্যক, সেস্থলে সেরূপ ছন্দোনিকুঞ্জ স্থাপিত রহিয়াছে; বিবিধবর্ণ অলঙ্কারকুসুম স্তবকে স্তবকে শাখী-শিরে শোভা পাইতেছে। এই বিস্ময়কর উপবন মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র, মানব চতুর্দ্দিকে কেবল সৌন্দর্য্যাবলোকন করে এবং মানস ও বুদ্ধিস্তরে পুলকাহত হইয়া, মায়ারাজ্যে উপনীত হওয়ার ন্যায় গণ্য করে। ভাষার ঈদৃশী সমৃদ্ধি স্বত্বেও, কালিদাস-কবিতায় মানবের চিত্তস্তর উন্মেষিত হয় না। কালিদাস কলিযুগের প্রথম সময়ের কবি বলিয়া, তাঁহার রচনায় প্রসঙ্গক্রমে অনেক স্থলে ঈশ্বরমহিমা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বর্ণনায় পরাভক্তি উদ্দীপিতা না হইয়া, মানবমন ভাষাগৌরব ও রচনাচাতুর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং, কালিদাসকৃত কাব্যোদ্যানে, বৃক্ষবল্লরী অনুসন্ধান করিয়া, দুইটী মাত্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম, মানবের মানস ও বুদ্ধিস্তরে আমোদপ্রদান এবং দ্বিতীয়, জগতে সাহিত্যরচনশিক্ষাদান। কিন্তু অল্পসংখ্যক গুণগ্রাহী ব্যক্তি এই ফল পরিপক্ক সুস্বাদ ও সুরস অবস্থায় সম্ভোগ করেন। অধিকাংশ লোকই লোভজনিত ব্যাকুলতা বশতঃ, পক্ক না হইতে, এই ফল আহরণ করেন। কলির কুবাতাসে আহৃত অপক্ক ফল অধিকক্ষণ স্নিগ্ধ থাকে না; আহরণমাত্র, বিকৃতিবশে, ইহা স্বাভাবিক স্বাদবর্জ্জিত, বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। এই নিয়মে, একপক্ষে অনেকে কুভাবে কালিদাস-কাব্যে আমোদ উপভোগ করেন এবং অন্যপক্ষে গ্রন্থনির্ম্মাণ ও প্রচারে প্রতিপত্তি ও উপজীবিকালাভপ্রয়াসী মানবগণ, নাটক, রঙ্গকবিতা, রমণীয় প্রেমোপাখ্যান, হাস্যকৌতুকোদ্দীপক গল্পাদি বিরচনে, আপনাদিগকে সগর্ব্বে সাহিত্যসেবী বলিয়া পরিচয় দেন। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যদেব যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ ইঁহার যে প্রকার

রূপান্তর হইতেছে, তাহাতে এবিষয়ের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সর্ব্বদেহে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, চূর্ণাস্থি বিকলাঙ্গ সাহিত্যদেব এক্ষণে রঙ্গালয়ের বারাঙ্গনা নটী ও সহচর নটগণ, কামবিলাসাসঙ্গ যুবক-যুবতী-নিচয় এবং চপলমতি বালক-বালিকাবৃন্দের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারেন না। দুর্ব্বলকায় সাহিত্যদেব, সাহায্যপ্রাপ্তি আশায়, ইহাদিগকে কত সম্মোহন বাক্যে আহ্বান করিয়া, স্বীয় ভাণ্ডারের চাকচিক্যময় পদার্থ সকল প্রদর্শন করেন! (১) ফতেনারা! অদ্ভুত বিয়োগমিলনান্ত নাটক! করুণ রসের প্রস্রবণ! রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ উপযোগী। (২) চাট্‌নি! নীতি-উপদেশ-পূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। গুরুভোজনে অম্লমধুর চাট্‌নি যেরূপ আরামপ্রদ, সেইরূপ, বীর ও শান্তরসের আধার চাট্‌নি পুস্তক সাহিত্য-পাঠীগণকে প্রীতি প্রদান করে। (৩) সুষমা বর্ণেলিয়া। ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বৃহদায়তন বিচিত্র উপন্যাস! নায়কনায়িকাচরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ! ভীষণ আন্তিরীয় দস্যুগণ এবং দুরন্ত দস্যুদলপতি গটাষ্টপ্! ভয়রোমাঞ্চকারী ষড়যন্ত্র! প্রেমবীর সোলেমান্ বীমন্ কর্ত্তৃক বর্ণেলিয়ার উদ্ধার! বহু চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ। অনেক সংবাদপত্রে প্রশংসিত। (৪) সচিত্র হাসিতামাসাফোয়ারা! শিয়াল চড়ে এক্কা গাড়ী। রাস্তায় প'ড়ে গড়াগড়ি! ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেশীয় নামে বৈদেশীয় প্রকৃতি-চিত্রণ কিম্বা স্বদেশীয় ও বৈদেশীয় নামচরিত্রাদির বিষম সংযোজনে, আধুনিক সাহিত্যিকগণ উল্লাস অনুভব করেন। ইহাতে ভাবাচিত্র পরিস্ফুট এবং বিষয়-বর্ণন প্রকৃত না হইলেও, নূতনত্ব প্রদর্শিত হয় বলিয়া, সাহিত্যরচনার এ রীতি অধুনাতন গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক আদৃতা হইতেছে। আবার, রমণীগণ স্বভাবদত্ত ক্ষমতাবলে, বালক বালিকাগণের মোদনার্থ যে সকল অর্থহীন গ্রাম্য কবিতা নির্ম্মাণ করিতেন, সাহিত্যশিক্ষা সরলকরণকল্পে, সাহিত্যিকগণ সেই সমস্ত কবিতা রচনা করিয়া, সাহিত্যশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ, অপরাবিদ্যাকবিচূড়ামণি কালিদাস-কাব্যে সংসারের যে কি পরিমাণ হিত সাধিত হইতেছে, তাহা উল্লিখিত প্রকারে প্রদর্শিত হইল। জগতের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য দৃষ্টান্তে কালিদাস-কাব্যের নামোল্লেখ করাই সঙ্গত। কারণ, একপক্ষে ভারতের কালিদাস যেমন কবিকুলধুরন্ধর, অন্যপক্ষে, অপরাবিদ্যা তেমনি, সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আবির্ভূতা হন এবং ভারতভূমে তাঁহার সন্তান সন্ততি প্রসব করেন। পরাবিদ্যা ভারতে আবির্ভূতা হইয়া, পুত্রকন্যা সহ ভারত হইতে অন্তর্হিতা হইলে, অপরাবিদ্যা তাঁহার স্থলাভিষিক্তা হইয়া, ক্রমশঃ

স্বীয় তনয় তনয়া সহ পৃথিবীর অপরাপর স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যার প্রথানুকরণ করিয়া, পরাবিদ্যা-তনয়তনয়ানামানুযায়ী স্বীয়সুতসুতার নামকরণ করিয়াছেন। অপরাবিদ্যার জ্যেষ্ঠপুত্র সাহিত্য-দেবের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ বিবৃতা হইয়াছে, তাঁহার অপরাপর পুত্রকন্যা-গণের অবস্থাও সেইরূপ। পরবর্ত্তীপুত্র ব্যাকরণদেবের দশা অতিশয় শোচনীয়া। সাহিত্যদেব বিকলাঙ্গ হইয়াছেন; কিন্তু ব্যাকরণদেব অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্বৃত্ত সেবকগণের হস্তে পতিত হইয়া, তাঁহার অনেক অঙ্গবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। দেবজাতি অমর; এজন্য, এমতাবস্থায়ও তিনি জীবিত আছেন। ব্যাকরণদেব অত্যন্ত অগ্রজভক্ত; সর্ব্বদাই অনুচর স্বরূপ সাহিত্যদেবের সেবা করিতেন। দুই সহোদরে এত সম্প্রীতি ছিল যে উভয়ে দেহসংলগ্ন করিয়া, একত্র অবস্থিতি করিতেন এবং উভয়ের শোভায় উভয়ে শোভান্বিত হইতেন। অঙ্গহানি নিবন্ধন, ব্যাকরণ দেব এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রজের সাহচর্য্য করিতে পারেন না এবং পরস্পর যোগে পূর্ব্বে উভয়ের যে লাবণ্য পরিলক্ষিত হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে উভয়ই শ্রীহীন ও বিরূপ। পুত্রকন্যার দুর্দ্দশায়, জননী অপরাবিদ্যা দুঃখিতা না হইয়া, উল্লাস অনুভব করেন। কারণ, অপরাবিদ্যা রাক্ষসী। দেবস্বামীলাভে, তৎসহবাসে এত সন্তান সন্ততির গর্ভধারিণী হইয়াও, অপরাবিদ্যার রাক্ষস-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। বনিতার স্বভাববৈগুণ্যে, অপরাবিদ্যার দেবস্বামী, স্ত্রীপুত্রকন্যা মর্ত্ত্যধামে ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে স্বর্গে বাস করিতেছেন। অপরাবিদ্যাপ্রভাবে, কলিযুগে চঞ্চলা ললনা জাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক প্রতাপশালিনী। কলিযুগে পুরুষগণের রমণীবশগতা বিষয়ে ঋষিগণের ইঙ্গিত পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পরাবিদ্যায় জ্ঞানীগণ গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্ত তত্ত্ব অবগত থাকিয়া, সরল ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে সত্য অবধারণ করিতে পারিতেন। অপরাবিদ্যায় পণ্ডিতগণ গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বনিচয় সম্যক্ বিদিত না থাকায়, ব্যাপ্ত, জটিল ও অপরিচ্ছন্ন উপায় দ্বারা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং এই সমস্ত বিশৃঙ্খল উপায়-উদ্ভাবনে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিধান করা বিবেচনা করেন। বিষয় যত ব্যাপ্ত হয়, বিস্মৃতিবশে ততই ইহা ভ্রমাবিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি গণিতের পূরণ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহাকে ৩২৫ জন লোকবিশিষ্ট পঞ্চবিংশতি-জনপদের লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে বলিলে, সে পঞ্চবিংশতিবার ৩২৫ সংখ্যা ক্রমনিম্ন পর্য্যায়ে রাখিয়া, তাহার সমষ্টি দ্বারা উহার সমাধান করিবার চেষ্টা

করিবে। এই সুদীর্ঘ সমষ্টিকরণ কার্য্যে,তাহার অনেক ভ্রম সংঘটিত হওয়ার সম্ভব। সুতরাং, ঐ ব্যক্তি হয় ৫।৬ বার চেষ্টার পর সত্যনির্দ্ধারণে পারক হইল, নতুবা, ভ্রম উপলব্ধ না হইলে, ভ্রমাত্মক সমষ্টিফলকেই সত্যসংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। পূরণনীতিবিদ্ কোনও ব্যক্তি সে স্থলে উপস্থিত থাকিলে, তিনি সমষ্টিপ্রক্রিয়ায় না গিয়া, ৩২৫ সংখ্যাকে ২৫ দিয়া গুণন করিয়া, উক্ত সত্য অবধারণের চেষ্টা করেন। ইহাতেও তাঁহার ভুল হইতে পারে; তথাপি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা ইনি অল্প সময়ে এবং সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে, প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে পারেন। কিন্তু, সাঙ্কেতিক পূরণতত্ত্বাভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি, ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে সে স্থলে উপনীত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে পারেন, ওরূপ পঞ্চবিংশতি গ্রামের জনসংখ্যা ৮১২৫। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি, যথাক্রমে, অপরাবিদ্যাবান অপরিপক্ক ও পরিপক্ক পণ্ডিতের এবং তৃতীয় ব্যক্তি পরাবিদ্যাবিদ্ জ্ঞানীর উদাহরণ তুল্য। কোনও সম্পন্ন বদান্য ব্যক্তি মাতৃশ্রাদ্ধে ২২৫০৲টাকা পরিমিতা রজতমুদ্রা কাঙ্গালীগণকে বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কাঙ্গালীবর্গের সংখ্যা-বাহুল্য-আশঙ্কায়, ঐ টাকার ১০০০৲ টাকা অখণ্ড রাখিয়া, ৮০০৲ টাকার আধলি, ৩০০৲ টাকার সিকি ও ১৫০৲ টাকার দুয়ানি ক্রয় এবং বিভিন্ন স্থলীতে প্রত্যেক প্রকারের মুদ্রা সংরক্ষিতা করা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে,মাত্র ১২০০ জন কাঙ্গালী সমবেত হইল। তখন, কর্ম্মকর্ত্তা সমবেত কাঙ্গালীগণকে সমস্ত মুদ্রা সমান ভাগে বিভাগ করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। মুদ্রাপূর্ণ স্থলীচতুষ্টয় সহ একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিতরণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং পরিবদ্ধ স্থানে কাঙ্গালীবর্গকে একশ্রেণীবদ্ধ করিয়া, একপ্রান্ত হইতে বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তঙ্কাধার হইতে প্রত্যেক কাঙ্গালীকে একমুদ্রা করিয়া দিয়া, উহা নিঃশেষিত হইলে, আধলী-স্থলী গ্রহণ করা হইল। সেইস্থান হইতে কাঙ্গালীশ্রেণীর অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেককে একমুদ্রা করিয়া দিয়া, বিতরণকারী পুনরায় আধল্যাধার সহ মূলপ্রান্তে আগমন করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক দরিদ্রকে একমুদ্রা করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে একমুদ্রাধার নিঃশেষে অপর মুদ্রাধার হইতে অর্থদান প্রক্রিয়ায়, কাঙ্গালীশ্রেণী চারিবার আদ্যন্ত মুদ্রাপ্রাপ্ত হইল। পঞ্চমবারে শ্রেণীর মূলপ্রান্তের ২০০ কাঙ্গালীর প্রত্যেকে এক দুয়ানি প্রাপ্ত হইল; বক্রী ১০০০ জন কিছুই পাইল না। প্রভুর আদেশ যথার্থরূপে প্রতিপালিত হইল, এই বিশ্বাসে, বিতরণকারী উক্তরূপে বিতরণকার্য্য শেষ করিয়া উল্লাস করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এইরূপ বিতরণে কাঙ্গালীশ্রেণীর

স্বীয় তনয় তনয়া সহ পৃথিবীর অপরাপর স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন; অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যার প্রথানুকরণ করিয়া, পরাবিদ্যা-তনয়তনয়ানামানুযায়ী স্বীয়সুতসুতার নামকরণ করিয়াছেন। অপরাবিদ্যার জ্যেষ্ঠপুত্র সাহিত্য-দেবের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ বিবৃতা হইয়াছে, তাঁহার অপরাপর পুত্রকন্যা-গণের অবস্থাও সেইরূপ। পরবর্ত্তীপুত্র ব্যাকরণদেবের দশা অতিশয় শোচনীয়া। সাহিত্যদেব বিকলাঙ্গ হইয়াছেন; কিন্তু ব্যাকরণদেব অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্বৃত্ত সেবকগণের হস্তে পতিত হইয়া, তাঁহার অনেক অঙ্গবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। দেবজাতি অমর; এজন্য, এমতাবস্থায়ও তিনি জীবিত আছেন। ব্যাকরণদেব অত্যন্ত অগ্রজভক্ত; সর্ব্বদাই অনুচর স্বরূপ সাহিত্যদেবের সেবা করিতেন। দুই সহোদরে এত সম্প্রীতি ছিল যে উভয়ে দেহসংলগ্ন করিয়া, একত্র অবস্থিতি করিতেন এবং উভয়ের শোভায় উভয়ে শোভান্বিত হইতেন। অঙ্গহানি নিবন্ধন, ব্যাকরণ দেব এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রজের সাহচর্য্য করিতে পারেন না এবং পরস্পর যোগে পূর্ব্বে উভয়ের যে লাবণ্য পরিলক্ষিত হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে উভয়ই শ্রীহীন ও বিরূপ। পুত্রকন্যার দুর্দ্দশায়, জননী অপরাবিদ্যা দুঃখিতা না হইয়া, উল্লাস অনুভব করেন। কারণ, অপরাবিদ্যা রাক্ষসী। দেবস্বামীলাভে, তৎসহবাসে এত সন্তান সন্ততির গর্ভধারিণী হইরাও, অপরাবিদ্যার রাক্ষস-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। বনিতার স্বভাববৈগুণ্যে, অপরাবিদ্যার দেবস্বামী, স্ত্রীপুত্রকন্যা মর্ত্ত্যধামে ত্যাগ করিয়া, এক্ষণে স্বর্গে বাস করিতেছেন। অপরাবিদ্যাপ্রভাবে, কলিযুগে চঞ্চলা ললনা জাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক প্রতাপশালিনী। কলিযুগে পুরুষগণের রমণীবশগতা বিষয়ে ঋষিগণের ইঙ্গিত পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পরাবিদ্যায় জ্ঞানীগণ গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্ত তত্ত্ব অবগত থাকিয়া, সরল ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে সত্য অবধারণ করিতে পারিতেন। অপরাবিদ্যায় পণ্ডিতগণ গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বনিচয় সম্যক্ বিদিত না থাকায়, ব্যাপ্ত, জটিল ও অপরিচ্ছন্ন উপায় দ্বারা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং এই সমস্ত বিশৃঙ্খল উপায়-উদ্ভাবনে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিধান করা বিবেচনা করেন। বিষয় যত ব্যাপ্ত হয়, বিস্মৃতিবশে ততই ইহা ভ্রমাবিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি গণিতের পূরণ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহাকে ৩২৫ জন লোকবিশিষ্ট পঞ্চবিংশতি-জনপদের লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে বলিলে, সে পঞ্চবিংশতিবার ৩২৫ সংখ্যা ক্রমনিম্ন পর্য্যায়ে রাখিয়া, তাহার সমষ্টি দ্বারা উহার সমাধান করিবার চেষ্টা

করিবে। এই সুদীর্ঘ সমষ্টিকরণ কার্য্যে,তাহার অনেক ভ্রম সংঘটিত হওয়ার সম্ভব। সুতরাং, ঐ ব্যক্তি হয় ৫।৬ বার চেষ্টার পর সত্যনির্দ্ধারণে পারক হইল, নতুবা, ভ্রম উপলব্ধ না হইলে, ভ্রমাত্মক সমষ্টিফলকেই সত্যসংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। পূরণনীতিবিদ্ কোনও ব্যক্তি সে স্থলে উপস্থিত থাকিলে, তিনি সমষ্টিপ্রক্রিয়ায় না গিয়া, ৩২৫ সংখ্যাকে ২৫ দিয়া গুণন করিয়া, উক্ত সত্য অবধারণের চেষ্টা করেন। ইহাতেও তাঁহার ভুল হইতে পারে; তথাপি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা ইনি অল্প সময়ে এবং সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে, প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে পারেন। কিন্তু, সাঙ্কেতিক পূরণতত্ত্বাভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি, ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে সে স্থলে উপনীত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে পারেন, ওরূপ পঞ্চবিংশতি গ্রামের জনসংখ্যা ৮১২৫। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি, যথাক্রমে, অপরাবিদ্যাবান অপরিপক্ক ও পরিপক্ক পণ্ডিতের এবং তৃতীয় ব্যক্তি পরাবিদ্যাবিদ্ জ্ঞানীর উদাহরণ তুল্য। কোনও সম্পন্ন বদান্য ব্যক্তি মাতৃশ্রাদ্ধে ২২৫০৲টাকা পরিমিতা রজতমুদ্রা কাঙ্গালীগণকে বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কাঙ্গালীবর্গের সংখ্যা-বাহুল্য-আশঙ্কায়, ঐ টাকার ১০০০৲ টাকা অখণ্ড রাখিয়া, ৮০০৲ টাকার আধলি, ৩০০৲ টাকার সিকি ও ১৫০৲ টাকার দুয়ানি ক্রয় এবং বিভিন্ন স্থলীতে প্রত্যেক প্রকারের মুদ্রা সংরক্ষিতা করা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে,মাত্র ১২০০ জন কাঙ্গালী সমবেত হইল। তখন, কর্ম্মকর্ত্তা সমবেত কাঙ্গালীগণকে সমস্ত মুদ্রা সমান ভাগে বিভাগ করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। মুদ্রাপূর্ণ স্থলীচতুষ্টয় সহ একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিতরণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং পরিবদ্ধ স্থানে কাঙ্গালীবর্গকে একশ্রেণীবদ্ধ করিয়া, একপ্রান্ত হইতে বিতরণ কার্য্য আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তঙ্কাধার হইতে প্রত্যেক কাঙ্গালীকে একমুদ্রা করিয়া দিয়া, উহা নিঃশেষিত হইলে, আধলী-স্থলী গ্রহণ করা হইল। সেইস্থান হইতে কাঙ্গালীশ্রেণীর অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেককে একমুদ্রা করিয়া দিয়া, বিতরণকারী পুনরায় আধল্যাধার সহ মূলপ্রান্তে আগমন করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক দরিদ্রকে একমুদ্রা করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে একমুদ্রাধার নিঃশেষে অপর মুদ্রাধার হইতে অর্থদান প্রক্রিয়ায়, কাঙ্গালীশ্রেণী চারিবার আদ্যন্ত মুদ্রাপ্রাপ্ত হইল। পঞ্চমবারে শ্রেণীর মূলপ্রান্তের ২০০ কাঙ্গালীর প্রত্যেকে এক দুয়ানি প্রাপ্ত হইল; বক্রী ১০০০ জন কিছুই পাইল না। প্রভুর আদেশ যথার্থরূপে প্রতিপালিত হইল, এই বিশ্বাসে, বিতরণকারী উক্তরূপে বিতরণকার্য্য শেষ করিয়া উল্লাস করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এইরূপ বিতরণে কাঙ্গালীশ্রেণীর

প্রথম ২০০ জনের প্রত্যেকে ২।৵০, শেষ ২০০ জনের প্রত্যেকে ১।৵০ এবং মধ্যভাগের ৮০০ জনের প্রত্যেকে ১৸৵০ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষদিকের কাঙ্গালীগণ প্রথমবার হইতেই সন্দেহ করিয়া আসিতেছিল। পঞ্চমবারে যখন ২০০ জন পর্য্যন্ত আসিয়া দুয়ানি বিতরণ বন্ধ হইল, তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বিতরণকারীর নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সে যে পক্ষপাতিত্ব সহকারে কাঙ্গালীগণকে মুদ্রাভাগ করিয়া দিয়া প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে রটনা করিতে লাগিল। কাঙ্গালীগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা স্বকীয় একজন কর্ম্মচারীকে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারীমহাশয় ঘটনাস্থলে আসিয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং মূর্খের ন্যায় কার্য্যকরার জন্য ভৃত্যকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কাঙ্গালীগণ অর্থপ্রত্যর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়া, সেইরূপ করিলে, ভৃত্য প্রত্যেক প্রকারের মুদ্রা পূর্ব্ববৎ স্থলী-নিবদ্ধ করিল। যাহাতে লজ্জা পাইতে না হয়, তজ্জন্য কর্ম্মচারীমহাশয় সতর্কতা সহকারে, প্রত্যেক কাঙ্গালী কত পাইবে, তাহা কাগজে কষিয়া লইলেন এবং সহজ উপায়ে কতশীঘ্র কার্য্যোদ্ধার করা যায়, ভৃত্যকে তাহার শিক্ষাপ্রদর্শনছলে, টাকা, আধলী ও দুয়ানির স্থলী হইতে তিন প্রকারের মুদ্রায় ১॥৵০ করিয়া, প্রত্যেক কাঙ্গালীকে দিবার জন্য ভৃত্যের হস্তে দিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারী ভৃত্যকে এরূপ আশ্বাস দিলেন যে প্রত্যেক কাঙালীকে একবার করিয়া যাহা দেওয়া হইবে, তাহাই শেষ, আর দিতে হইবে না। ১০০০ কাঙালী পর্য্যন্ত অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তঙ্কার স্থলী নিঃশেষিত হইল; অতঃপর কর্ম্মচারী মহাশয় আধলীর আধার হইতে ৩টী ও দুয়ানীর স্থলী হইতে একটী মুদ্রা লইয়া, প্রত্যেককে ১॥৵০ হিসাবে বক্রী ২০০ শত কাঙালীকেও অর্থদান করিলেন। টাকা, আধলি ও দুয়ানির আধার নিঃশেষিত হইল; কিন্তু সিকির স্থলীতে আদৌ হস্ত পড়িল না। তখন ভৃত্য কৌতুক সহকারে কর্ম্মচারীকে কহিল, সিকি গুলি কাঙালীগণকে দিতে কি প্রভুর নিষেধ আছে? কর্ম্মচারী অপ্রতিভ হইয়া, তাঁহার হিসাবে ভুল হওয়ার বিষয় স্বীকার করিলেন এবং পুনরায় নির্ভুলরূপে বিতরণ করিতে দেওয়ার জন্য, কাঙালীগণকে অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বার অর্থ প্রত্যর্পিত হওয়ার সময় যে কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই প্রত্যর্পিত মুদ্রা নিচয় পূর্ব্ববৎ বিভিন্ন স্থলীতে সংস্থাপিত হইয়াছিল। কর্ম্মকর্ত্তা ভৃত্য ও কর্ম্মচারী উভয়েরই বিদ্যাবুদ্ধির বহুব্যাজস্তুতি

করিলেন এবং অবশেষে স্বহস্তে স্থলীচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটী হইতে এক মুদ্রা লইয়া একত্রে ১৮/০ প্রত্যেক কাঙালীকে দিবার জন্য কর্ম্মচারীর হস্তে দিতে লাগিলেন। ১০০০ পর্য্যন্ত কাঙালীকে এইরূপ অর্থ বিতরণ করা হইলে, টাকার স্থলী নিঃশেষিত হইয়াছিল। অতঃপর কর্ম্মকর্ত্তা আধলির স্থলী হইতে একবারে ৩টী ও অপর দুইটী স্থলী হইতে পূর্ব্বের ন্যায় মুদ্রা তুলিয়া, বক্রী ২০০ কাঙালীর প্রত্যেককে ১৮/০ দিয়া, অর্থ বিতরণ কার্য্যশেষ এবং সমস্ত মুদ্রাধার শূন্য করিয়াছিলেন। এতৎ বিবরণ যদিও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও বিরক্তিজনক, তথাপি ইহা শিক্ষাপ্রদ এবং ইহার মূলবৃত্তান্ত সত্য বলিয়া, ইহা এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। ভৃত্য মিশ্রভাগ প্রণালী অবগত ছিল না; সুতরাং অতিশয় ব্যাপ্ত ও বিশৃঙ্খল কার্য্যকরণোপায় অবলম্বন করিয়াছিল। কর্ম্মচারী যদিও মিশ্রভাগ তত্ত্ব বিদিত ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তথাপি ব্যস্ততা বশতঃ অঙ্ক কষিতে ভুল হওয়ায়, তিনিও কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক কাঙালীর ১৮/০ পাওয়া স্থলে, তিনি প্রত্যেকের ১৷৷/০ পাওয়া স্থির করিয়াছিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা মিশ্র হরণ তত্ত্ব এত উত্তমরূপে বিদিত ছিলেন যে প্রত্যেক কাঙালীর ১৮/০ পাওয়া তিনি কাগজে না কষিয়াও নির্ণয় করিয়াছিলেন। পরন্তু, আধারগত তঙ্কা, আধলী, সিকি ও দুয়ানি দ্বারা, উক্ত হিসাবে কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়ে ও অল্প সময়ে সমবেত অর্থীগণকে অর্থ বিতরণ করা যাইতে পারে, তাহাও তিনি তৎক্ষণাৎ অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিত বিষয়ে, সর্ব্বাবস্থাপরিদর্শনে, কর্ম্মকর্ত্তার যে অভিজ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা পরাবিদ্যাজ্ঞানের ছায়া সদৃশ। কারণ, পরাবিদ্যা কেবল এক বিষয়ে নহে, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয়ে মানবকে উজ্জ্বলতর অভিজ্ঞান প্রদান করে।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভিষক্ বা ডাক্তারগণ, কোনও কোনও চিকিৎসাবিদ্যায় স্ব স্ব বিশেষ ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করিয়া, আপনাদিগকে তত্তৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) অভিহিত করেন। যাঁহারা বাস্তব এইরূপ বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন যে প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হইলে, রোগবিনাশে চিকিৎসাবিদ্যার আধুনিক অস্ত্র ও ঔষধাড়ম্বরের আবশ্যকতা হয় না। প্রত্যুত, অতি সহজ উপায়ে ব্যাধিশান্তি করা যায়। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীতে এক সমৃদ্ধ ব্যক্তির নাসিকাগহ্বরদ্বয়ে দুইটী রোম বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহার উদরে মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পাকস্থলীতে

কেশাবস্থিতি নিবন্ধন, তিনি কোনও খাদ্য পরিপাক করিতে পারিতেন না; পরন্তু যাহা ভক্ষণ করিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ উদ্‌গীর্ণ হইয়া যাইত। অল্পদিবস মধ্যে, তিনি স্ফীতোদর, রক্তহীন, কৃশ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। অর্থসামর্থ্য যোগে, তিনি একে একে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত রাজধানীর অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। ভিষক্‌গণ কেহ উদরী, কেহ প্লীহারোগ, কেহ যকৃৎরোগ ইত্যাদি ক্রমে রোগ নির্ণয় করিয়া নানা ঔষধ ও যন্ত্র প্রয়োগ এবং পথ্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহুকাল চিকিৎসায়ও রোগের উপশম হইল না এবং রোগী, ক্রমশঃ, অধিকতর দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। কলিকাতা নগরে তৎকালে এমন একজন চিকিৎসক ছিলেন, যিনি সাধারণ পন্থানুসরণ না করিয়া, বিশেষ ভাবে, তাঁহার নিজ প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করিতেন এবং এইরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য রোগের প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিত না। বহু প্রসিদ্ধ ভিষকের চিকিৎসায় ফল না পাইয়া, উল্লিখিত রোগী অবশেষে এই বিচিত্রচরিত্র চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসক মহাশয় আসিয়া রোগীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে বলিলেন। রোগী উঠিয়া বসিলে, চিকিৎসক তাঁহার কর্ণরন্ধ্র ও নাসিকাছিদ্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রোগী ভাবিলেন, লোকে এই চিকিৎসক সম্বন্ধে যাহা বলে, তাহা প্রকৃত, এ ব্যক্তি বাতুলবৎ, এবং কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে চিকিৎসককে কহিলেন, 'মহাশয়! আমার নাড়ী, উদর, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, রোগ নির্ণয় করুন।' চিকিৎসক গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, হইয়াছে।' রোগী অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তবে ঔষধের ব্যবস্থা করুন।' ভিষক্ কহিলেন, 'ছোট কাঁচি এবং সরু সন্না যদি ঘরে থাকে, এখানে আনিতে বলা হউক।' শুশ্রূষাকারীগণ, অগত্যা, একগাছি ক্ষুদ্র কাঁচি ও একটী সরু সন্না সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চিকিৎসকের হস্তে দিলেন। চিকিৎসক মহাশয় কাঁচি দ্বারা রোগীর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের একটী রোম কর্ত্তন করিয়া, সন্না সাহায্যে কর্ত্তিত রোম আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোম যত বহির্গত হইতে লাগিল, চিকিৎসকের মুখ তত প্রফুল্ল হইতে লাগিল। দুই হস্ত পরিমিত একগাছি কেশ যখন রোগীর নাসিকাভ্যন্তর হইতে বিনির্গত হইল, তখন রোগী ও শুশ্রূষাকারীগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া চিকিৎসকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 'এখনও কিছু কাজ বাকী আছে' এই বলিয়া চিকিৎসক, একই প্রকারে,

রোগীর বামনাসারন্ধ্র হইতে সমপরিমাণ আর একগাছি কেশ বহির্গত করিলেন। এই কার্য্যশেষে ভিষগ্‌রাজ রোগীকে কহিলেন, 'মহাশয়, আপনি নিরাময় হইলেন।' রোগী যে কিরূপ অন্তরে অনুতপ্ত ও চিকিৎসক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই ঘটনা বড় বহুদিন অতীতে সংঘটিত হয় নাই এবং সম্ভবতঃ, যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন। সুতরাং ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যাবিস্তারে, অধুনা যাঁহারা 'হাতুড়ে বৈদ্য' (quack) নামে অভিহিত হন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আভ্যন্তরীণ ব্রণাদি বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞানসম্পন্ন যে, বাহ্য শরীরে তৈলাদি প্রয়োগে তৎসকলের ব্যাপাদন করিতে পারেন। অনেকে দেখিয়াছেন, আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বিখ্যাত চিকিৎসকনিচয় অস্ত্র ও ঔষধ সাহায্যে এবং, এমন কি, নবাবিষ্কৃত অন্তর্ব্বীক্ষণ যন্ত্র (Rongten's x rays apparatus) ব্যবহার করিয়াও যে সকল আভ্যন্তরিক রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন নাই, যাঁহারা অশিক্ষিত বিবেচিত হন, এরূপ গ্রাম্যবৈদ্যগণ পুরাতন প্রথায় সহজে ও অল্প সময় মধ্যে, সেই সকল রোগের সম্যক্ প্রতিকার করিয়াছেন। কিন্তু অপরাবিদ্যার ঘনাড়ম্বরজলদে ইঁহাদের কীর্ত্তিচন্দ্রশালা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিতা রহিয়াছে।

স্থূলাবয়বে সূক্ষ্মের দৃষ্টান্তাঙ্কনে উপরোক্ত উদাহরণমালার প্রত্যেক উদাহরণগত সর্ব্বশেষোক্ত ব্যক্তিকে ভ্রমশূন্য কল্পনা করা হইয়াছে। যদিও বীজগণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রমাধীন, তথাপি, নিম্নে উদাহরণছলে তাঁহাদিগকে ভ্রমাতীত বিবেচনা করিতে হইবে। পাটীগণিতের কঠিন প্রশ্নসকল বীজগণিতের সমীকরণ নিয়মে (equation) অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে সমাহিত হইতে পারে। যাঁহারা পাটীগণিত জানেন, অথচ বীজগণিত জানেন না, ঐসকল প্রশ্নের সমাধান যে তাঁহাদের সকলেরই ক্ষমতাতীত, তাহা নহে। চেষ্টাদ্বারা তাঁহারা কেহ কেহ ঘূর্ণিত উপায়ে অনেক ভ্রমাদি করিয়া, কোনওরূপে, ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে পারেন এবং কেহ কেহ বহু চেষ্টা করিয়া, তাহাও পারেন না। আবার, বীজগণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণ, পাটীগণিতের নিয়মেও, কেবল পাটীগণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সহজভাবে ঐসকল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন। পরাবিদ্যায়, জ্ঞানীগণ সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বুদ্ধিস্তর সাধ্য কার্য্যনিচয় সম্পন্ন করিয়া, সংসারে অমিশ্র সুখোৎপাদন করিতে পারিতেন। অপরাবিদ্যায়, পণ্ডিতগণ জড়দ্রব্য সাহায্যে স্থূলশরীর দ্বারা তদনুরূপ কার্য্য সমাধান করিতে গিয়া, সংসারে সুখদুঃখ

উভয়ই উৎপন্ন করেন। জ্ঞানীগণ পরাবিদ্যা প্রভাবে বিশ্বের সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়-গোচর করিতে পারিতেন। সাধারণে তাঁহাদের দ্বারা নিমেষ মধ্যে দূরবর্ত্তী, এমন কি, পরলোকস্থিত আত্মীয় স্বজনগণের সংবাদ আহরণ এবং তাঁহাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিতেন। বৈজ্ঞানিকগণ, অপরাবিদ্যাপ্রভাবে বহুপরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে জড়বস্তু সংযোগে যে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে স্থূলগণনায় অল্প সময় মধ্যে, মানবগণ শুল্কদানে দূরদেশে সংবাদ প্রদান ও তথাকার সংবাদ আনয়ন করিতে পারে। কলি-মানব পক্ষে ইহা যে বিশেষ উপকারী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহাদ্বারা সংসারে প্রভূত অনিষ্টও সাধিত হয়। সংবাদ-প্রেরক বা গ্রাহক কর্ম্মচারীগণের ভ্রমাদির বিষয় বর্জ্জন করিলেও, তড়িৎবার্ত্তাবহ যন্ত্রে সুসংবাদ ও কুসংবাদ উভয়ই বাহিত হয়। দুষ্কৃতকারীগণ ইহাদ্বারা সহচরগণ সমীপে দুরভিসন্ধি চালনা করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে দুষ্কৃত সাধন করিতে পারে এবং ইহাতে সংসারে পাপস্রোত বর্দ্ধিত হইতেছে। পরাবিদ্যায়, সূক্ষ্মশরীর সাহায্যে বার্ত্তাচালনে, কোন অহিতকর সংবাদ চালিত হইত না। জ্ঞানীগণ স্বকীয় এবং পরকীয় সূক্ষ্ম শরীর যথেচ্ছ স্থানে চালিত করিতে পারিতেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে, সাধারণ ব্যক্তির যদি এমন কোনও স্থানে গমনাগমন করার আবশ্যকতা হইত, যথায়, পথদীর্ঘতা বা শৈলসাগরনদ্যাদি-ব্যবধানহেতু মানবের স্থূলশরীরে গমনা-গমন দুঃসাধ্য, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি জ্ঞানীগণের অনুকম্পায়, সূক্ষ্মশরীরে সে স্থানে যাতায়াত করিতেন। ইহাতে বিলাসিতার প্রশ্রয় ব্যতিরেকে, মানবের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। কলিযুগে বিজ্ঞান বলে বাষ্পীয় পোতশকটাদির আবিষ্কার এবং এই সকল যানযোগে মানবের ইতস্ততঃ গমনাগমন ও বাণিজ্যের ভূয়সী সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত সুবিধাজনক বাহনে, সংসারে অকল্যাণও যথেষ্ট সাধিত হইতেছে। বিলাসিতার পরিমাণ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমন কি, এই সকল বাহন প্রচলিত হওয়ায়, মনুষ্যগণ স্বাস্থ্যসম্মত শরীরচালনা করিতেও বিমুখ হয়। বিলাসিতাক্রয়করণে, মানব স্বীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া, অর্থব্যয় করে। রেলরথ্যাদির বিস্তারে, ভূমির জলাগমনিগমের পথরোধ হওয়ায়, দেশে নানাপ্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে। সংঘর্ষ, বিধ্বংস বা বিপর্য্যাস প্রভৃতি ঘটনায়, এই সকল বাহনে একবারে বহুসংখ্যক প্রাণীক্ষয় হয়। বাণিজ্যসুবিধাছলে, কোনও কোনও দেশের খাদ্য-শস্যাদি অত্যধিক পরিমাণে দেশান্তরে নীত হওয়ায়, অনেক দেশ নিরন্ন হইয়া পড়ে।

তড়িৎ ও বাষ্পীয়শক্তিপরিচালিত অপরাপর যানও বিপদসঙ্কুল। জ্ঞানীগণ মানবশরীরের বাহ্যাভ্যন্তর সমভাবে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেন। তাঁহারা প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া, উপযুক্ত ঔষধি প্রয়োগ করিতেন; তাহাতে মনুষ্য-শরীর উপদ্রুত না হইয়া, রোগের শান্তি হইত। অপরাবিদ্যায় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানবলে ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ ঔষধ ও অস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কোনও কোনও স্থলে এই সমস্ত ঔষধাস্ত্র উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইয়া, সংসারে প্রকৃত হিত সাধন করে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, এই সকল অস্ত্রৌষধির আনুমানিক ও অযথার্থ প্রয়োগে মানবশরীর বিশেষরূপে ক্লিষ্ট এবং সংসার অত্যাচারিত হইতেছে। জ্ঞানীগণ তিথিনক্ষত্রাদির অবস্থা এবং মনুষ্যশুভাশুভের সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্যক্ বিদিত থাকিয়া, মানবকার্য্য নিয়মিত করিতেন; তাহাতে সাংসারিক কার্য্যে মানবের কোনওরূপ অনিষ্টপাত হইত না। অপরা-বিদ্যায়, পণ্ডিতগণ বাহ্যাবস্থা গণনা করিয়া, তদনুযায়ী মানবকে কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন। ইহাতে স্থলবিশেষে মঙ্গল এবং অধিকাংশ স্থলেই অমঙ্গল সংঘটিত হয়।

অপরাবিদ্যায়, গণিত ও বিজ্ঞানের স্থূলাঙ্গভূতশিল্পপ্রসারের অনুপাতে, একদিকে বিলাসিতাস্রোতঃ এবং অন্যদিকে মানবের বাহ্যাভ্যন্তরিক বিকারজ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু এই আসুরীবিদ্যাপ্রভাবে, কলিযুগে তাহাই প্রকৃত সাংসারিক সম্পদ্ বিবেচিত হয়। তন্তুনির্ম্মাণযন্ত্র, বস্ত্র-বয়ন যন্ত্র, সীবন যন্ত্র, তৈলনিষ্ক্রাসণ যন্ত্র, শস্য বা ইষ্টকপেষণ যন্ত্র, কাচ বা কাচ-পাত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, লৌহাস্ত্রনির্ম্মাণ যন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ যন্ত্র, গণিত ও বিজ্ঞানবলে দৈত্যস্বরূপ আবির্ভূত হইয়া, বহুমানবের জীবিকা ও স্বাধীনতা হরণে, কতিপয় সম্পন্নব্যক্তির বিলাসিতা চরিতার্থ করিতেছে। ঈশ্বরদত্ত হস্তপদাদি অবয়ব ও শক্তি সহকারে, মানব স্বীয় রুচি অনুযায়ী যে উপজীব্য সংস্থান করিবে, এই সমস্ত দৈত্যগণ সে পথ সম্পূর্ণ রোধ করিয়াছে। দুর্বৃত্ত অসুরগণ যেমন মানবগণকে ঈশ্বরমহিমাবিস্মৃত করাইয়া স্ব স্ব করায়ত্ত করে, অপরাবিদ্যাপ্রসূত এই সকল যন্ত্রও সেইরূপ মনুষ্যগণকে স্বরুচিবৃত্তিত্যাগী করাইয়া, তাহাদিগকে আপনায়ত্তিগত করে। কারণ, দেশমধ্যে বিপুল যন্ত্র-নিচয়ের প্রাদুর্ভাবে, মনুষ্যগণ হস্তপদাদি দ্বারা কার্য্য করিয়া, কোনও ব্যবসায়েই যন্ত্রসমূহের প্রতিযোগিতা করিতে পারে না এবং অবশেষে যন্ত্রাধিকারীগণের ইচ্ছানুযায়ী, যন্ত্রাগারে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়া,

অপর্য্যাপ্ত উপজীব্যার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। বিধাতৃদত্ত ক্ষমতায়, যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বস্ত্রনির্ম্মাতা ছিল, সে যন্ত্রে তৈলপ্রদান কার্য্যে; যে ব্যক্তি সীবন কার্য্যে কারু ছিল, সে লৌহপরিষ্করণ কার্য্যে; যে ব্যক্তি মৃৎপাত্রনির্ম্মাণে দক্ষ ছিল, সে অগ্নিতে অঙ্গারক্ষেপণ কার্য্যে ইত্যাদিক্রমে, মনুষ্যগণ যন্ত্রাধিকারীনিচয়ের অভিলাষানুযায়ী, যন্ত্রাগারে কর্ম্মে নিয়োজিত হইল। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে স্বহস্তে, কার্পাস সূত্র, পশুলোম বা পশমাদি বিশুদ্ধোপকরণে মসৃণ মনোজ্ঞ দীর্ঘস্থায়ী বস্ত্রবয়ন করিয়া, তৃপ্তিসহকারে স্বয়ং ব্যবহার করিত এবং অপরাপর মানবকেও ব্যবহার করাইত, এক্ষণে সেই ব্যক্তি পট্টতন্তু, কদলীবৃক্ষতন্তু, কার্পাসতন্তু প্রভৃতির মিশ্রণে যন্ত্রপ্রসূত কর্কশ ক্ষণস্থায়ী বস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইল। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে স্বহস্তে বহুগুণবিশিষ্ট ধাতুপ্রস্তরাদি দ্বারা নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত পাত্রাদি প্রস্তুত করিয়া, আনন্দে স্বয়ং ব্যবহার করিত এবং অপর মানব-গণকে ব্যবহার করিতে দিত, এক্ষণে কাচসীসকাদিনির্ম্মিত বহুকৃত্রিমবর্ণে রঞ্জিত যন্ত্রোদ্গীরিত অলিঞ্জর পাত্রনিচয়ব্যবহার ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর রহিল না। পবিত্র দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অপরাবিদ্যাসম্ভূত এই সমস্ত অপবিত্র পদার্থের প্রচলনে, যন্ত্রাধিকারীগণের ধনলালসা ও মানবের বিলাসিতা পরিপুষ্টা হইতে লাগিল। যন্ত্রাধিকারীগণ দ্বিতল ত্রিতল ক্রমে ক্ষমতাসাধ্য বহুতল হর্ম্ম্যরাজী নির্ম্মাণ করি-লেন এবং মানবগণ প্রাতঃ-পরিচ্ছদ, মধ্যাহ্নপরিচ্ছদ, পরাহ্ণপরিচ্ছদ, সান্ধ্যপরিচ্ছদ, ভোজনপরিচ্ছদ, শয়নপরিচ্ছদ প্রভৃতি নানাপ্রকার সাজ ও চা-পান, দুগ্ধ-পান, সাধারণ খাদ্যগ্রহণ, সুগন্ধি ও অপরাপর দ্রব্যসংরক্ষণ, গৃহসজ্জা, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে নানাবিধ পাত্র বা উপকরণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। মানব যাহাতে নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিতে পারে, এজন্য জগতে পর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ দ্রব্য বিধাতা মানবকে প্রদান করিয়াছেন। মানবের এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করাই ধর্ম্মসঙ্গত। কারণ, এই সকল দ্রব্য ব্যবহারে, মানবের স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরেরই স্বাস্থ্যাধান হয়। কিন্তু অপরিমিত বিলাসচর্য্যায়, বিধাতার বিরাট ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডার অপরাবিদ্যা-কবলিত মানবের নিকট অপর্য্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়। ব্যবহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ প্রতি মানবের আদৌ লক্ষ্য নাই। মনুষ্য হস্তপদাদি দ্বারা স্বব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলে, সংসারে এত অপবিত্র দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত হয় না। কারণ, তাহা হইলে, ব্যবহার্য্য দ্রব্য নির্ম্মাণ-কল্পে, অপবিত্রোপকরণনিচয় সংগ্রহ করিতে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয় না এবং সময়েরও অকুলান হয়। যন্ত্রদৈত্যের শ্রমক্লান্তি

নাই। সহস্র মনুষ্যে একদিনে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারে, যন্ত্রে তাহা নিমিষে সমাহিত হয়। অপরাবিদ্যামন্ত্রে রুদ্ধবীর্য্য এবং যন্ত্রদানব কর্ত্তৃক বদ্ধহস্ত-পদ হইয়াও, কলিমানব এই সকল জঘন্য ঘটনকে দেশ ও সভ্যতার উন্নতি বিবেচনা করিয়া, পরম গর্ব্বানুভব করে।

ফলতঃ ঈশ্বরমহিমাবিস্মরণে জড় পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া, অপবিত্র দ্রব্য ব্যবহারে অশুচি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে বলিয়া, কলিমানব স্বল্পজীবী এবং সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত। আধুনিক রসায়ণ, উদ্ভিদ্ ও ওষধি বিদ্যায়, রোগ-প্রতিকার মানসে, যতঃ ঔষধের আবিষ্কার হইতেছে, ধরাধামে ততই নূতন নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইতেছে। পাপসলিলাবগাহনে পাপতাপনিবারণ কল্পনা করিয়া, মানবকুল পাপসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। বিজ্ঞান যাহা খাদ্য বা ঔষধ নামে প্রচার করিয়াছে, দেশ বা অবস্থাভেদে বিষতুল্য হইলেও, বিজ্ঞানান্ধ মানব তাহা গলাধঃকরণ করিয়া, বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তির সম্মাননা করিতেছে। পরমনিয়ন্তা যে সকল জীবোদ্ভিদ্ মানব-ভক্ষ্য স্বরূপ সৃজন না করিয়া, অন্য অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার পবিত্র বিধানে যাহা কোনও কোনও দেশে নর-খাদ্য এবং কোনও কোনও দেশে নরের অখাদ্য, অথবা যাহা এক অবস্থায় মনুষ্যের খাদ্যরূপে গ্রহণীয় হইলেও অবস্থান্তরে সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়, আসুরীবিদ্যাপ্রভাবে মানবকুল রসনাতৃপ্তি ও স্থূল শরীরের বলাধান কল্পে, দেশজাতি-নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বাবস্থায় তৎ সমস্ত উদরসাৎ করিতেছে। কলিযুগে, প্রত্যহ যত ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানব বুভুক্ষানলে ভস্মীভূত হইতেছে, তাহার সংখ্যা গণনসীমাতীত। যিনি মানব সৃজন করিয়াছেন, এই সমস্ত প্রাণী তাঁহারই সৃষ্ট; সুতরাং তাহারা মানবের সহানুভূতি পাইবার অধিকারী, এ শিক্ষা গণিত বা বিজ্ঞান কেহই প্রদান করে না এবং লোভোন্মত্ত উদরম্ভরি মানব ভ্রমেও তাহা আলোচনা করেনা। মানবোদরপূর্ত্তির সুবিধা-বিধানকল্পে, একবারে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুপশুব্যাপাদনোপযোগী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান গর্ব্ব প্রকাশ করে; কিন্তু হন্যমান পশুনিচয়ের একতমের রোমৈকগঠনে যে বিজ্ঞানের সামর্থ্য নাই, তজ্জন্য বিজ্ঞান লজ্জানুভব করে না। প্রান্তর-নিক্ষিপ্ত মৃতজীবদেহ যেমন গৃধ্রজম্বুকতোষণ করে, কলিযুগে হট্টাদিস্থানে দোলায়মান যন্ত্রাহত বহু পশুদেহ সেইরূপ মাংসলোলুপ মানবগণের তৃপ্তি বিধান করে।

অন্ধভাবে শিল্পবিজ্ঞানানুসরণ করিয়া, কলিনর তাহার তিক্তাস্বাদ ব্যতীত,

যথাসম্ভব মিষ্টরসাস্বাদন করিতে পারে না। অপরাবিদ্যাসম্ভূত অসম্পূর্ণ শিল্প বিজ্ঞান মানবকে পার্থিববিষয়ে কার্য্যাদি নিয়ামন করিবার যে সুযোগ প্রদান করে, মানসিক বিকারে সাধারণ মানব তাহাও গ্রহণ করিতে পারে না। সত্য-ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মানবগণ প্রকৃতির ধ্বনি বা চিহ্নানুসরণ করিয়া, দিবস-যামিনী-করণীয় যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে সময় নিরূপণ করিতেন। উপযুক্ত কালে সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করা নিবন্ধন, তাঁহারা সর্ব্বদা ক্ষিপ্রহস্ত, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। কলিযুগে শিল্পবিজ্ঞানবলে সূক্ষ্মসময়নিরূপণোদ্দেশ্যে ঘটীযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়া স্বত্বেও, অধিকাংশ লোক অলস ও অসময়ানুসারী হইয়া, যুগদোষগত স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে। বিলাসিতার উপাসনায়, অনেকে অলঙ্কার স্বরূপ ঘড়ি ব্যবহার করে। কিন্তু অপবিত্র দ্রব্যমিশ্রণে অসহজানুভাব্যভাবে সর্ব্ববিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যে কৃত্রিমতা ও অবিশুদ্ধতা নিষ্পাদন করা যায়, শিল্পবিজ্ঞানপ্রদর্শিত এ কৌশলে, কলিমানব বিশেষরূপে অভ্যস্ত ও সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। পাপচিত্রের পূর্ণাঙ্কনে, যন্ত্র যে অল্প পরিমাণ অবশেষ রাখে, যন্ত্রদাস মানব অর্থলিপ্সায় হস্তপদ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করে এবং এইরূপে কলিব্যবসায়ীকুল ঈশ্বরদত্ত হস্তপদের ব্যবহার করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে মানবের প্রত্যেক খাদ্যোপকরণ অখাদ্যদ্রব্যমিশ্রণে যেরূপ অপবিত্র হইয়াছে, তাহাতে অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট সম্পন্ন পরিবার ব্যতীত অপর কেহ বিশুদ্ধ দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন না। সাধারণাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ, ততোধিক, দরিদ্রসংজ্ঞাভিহিত লোক সকল পক্ষে, অমিশ্রিত দ্রব্যের ব্যবহার অসাধ্য। অপর্য্যাপ্ত এবং কখনও কখনও অপরিমিত অপবিত্র ভক্ষ্য উদরসাৎ করিয়া, মানবগণ যত পীড়াগ্রস্ত হইতেছে, বিশ্বহিতকামী ঔষধব্যবসায়ীগণ, শিল্পবিজ্ঞান-কৌশলে, ততই নানাবিধ নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিতেছেন। ইঁহাদের মুষ্টিযোগ পৃথিবীর সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বলোক প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং ফলোপধায়ক। সাংসারিক মানবগণের যাদৃশাচরণ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, আসুরীবিদ্যাপ্রভাবে, কলি সংসারে মানবকুল তাহার ব্যতিক্রম করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

অপরাবিদ্যামোহে, অপরিণতবুদ্ধি কলিনরনিচয়ের কেহ কেহ বিহঙ্গমবৎ ব্যোমবিহারপ্রয়াসী হইয়া, বিজ্ঞানকল্পিতযানাবলম্বনে, উপাখ্যানপ্রোক্ত ঈগলবাহিত কচ্ছপের ন্যায় নিহত হইতেছে; কোনও কোনও নীচাশয় শিল্পবিজ্ঞানাবিষ্কৃত উপকরণ সাহায্যে গোপনে নরহত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি ভীষণকলুষাচরণ

সমাধান করিয়া, সংসারে দারুণ অশান্তি সমুৎপাদন করিতেছে এবং অপর সকলে নানাবিধ বালোচিত অফলোদয় কর্ম্ম পরম্পরায় নিযুক্ত হইয়া, ঈশ্বরদত্ত সময়ের অপব্যবহার করিতেছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীদ্বারা জগতে অর্থনাশ ও মানবের প্রতি অহেতুক উপদ্রব-জনিত অনেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ধর্ম্মের লীলানিকেতন এবং সভ্যতার যুগচাতুষ্টয়িক কীর্ত্তি চিহ্ননিচয় বক্ষে ধারণ করিয়া স্বকীয় কর্ম্মভূমি নামের সার্থকতা-পাদন করে, তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে ধর্ম্ম ও সভ্যতা শিক্ষাদিবার জন্য একদল নব্যশিক্ষিত মানব অতিশয় ব্যস্ত। পুরাতত্ত্বাবিষ্কারচেষ্টায়, আর একদল মনুষ্য, আমেরিকা হইতে কোন্ সময়ে সার্ ওয়াল্টার র্যালে (Sir Walter Raleigh) কর্ত্তৃক গোল আলু ইংলণ্ডে আনীত হয় বা কাহাদ্বারা তাম্রকূট অন্যদেশে নীত হয়, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় অত্যন্ত আবিষ্ট। অপর এক সম্প্রদায় নূতন তত্ত্বের পক্ষপাতী। ইঁহারা, কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, তাহার কারণানুসন্ধান এবং ভবিষ্যতে মানব যাহাতে ঐরূপ ঘটনাজনিত বিপদ বর্জ্জন করিতে পারে, তাহার উপায় নিরূপণে ব্যাপৃত। সম্প্রতি, টাইটানিক পোত জলমগ্ন হইলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু অনুসন্ধান সমিতি গঠিতা হইয়াছিল। অনেক ব্যবহারজীবী, তথ্য-নির্ণয় বিষয়ে এই সকল সমিতির সহায়তা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমিতির অনুসন্ধানফলের ঐক্য হয় নাই। কোনও কোনও সমিতির মতে টাইটানিক্ অধ্যক্ষের অসতর্কতা এবং কাহারও কাহারও মতে অপরাপর পোতাধ্যক্ষগণের সাহায্যদানবিমুখতায় টাইটানিকের জলনিমজ্জন অবধারিত হইয়াছিল। তথাচ, অর্ণবযাননিমজ্জনে, যাত্রী ও কর্ম্মচারীগণের প্রাণরক্ষাকল্পে, প্রত্যেক পোতে যে বহু সংখ্যক ভাসনশীল যন্ত্র সঞ্চিত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সকল সমিতির ঐকমত্য ঘটিয়াছিল। এইরূপে, মহাসমারোহ সহকারে সমিতিনিচয় জলযাননিমজ্জনে মানব-প্রাণ-রক্ষার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা কৌতুকী ব্যক্তির মৎকুণবিনাশন-উপায়াবিষ্কার সদৃশ। এক আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি কৌতুক করিবার জন্য, ছদ্মনামাদি ব্যবহারে সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিল; 'ছারপোকা মারিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে ছারপোকা নির্ব্বংশ হয়। নাম ঠিকানাদিসহ অগ্রিম ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইলে, ডাকযোগে ঔষধ প্রেরণ করা যায়।' মৎকুণোৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায়, অনেক লোক বিজ্ঞাপন-দাতার নিকট বিজ্ঞাপন-লিখিত পাঁচ আনা প্রেরণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে, ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রদত্ত মূল্যের কি প্রকার ঔষধপ্রাপ্ত

হইলেন ? যাহাতে স্পষ্টাক্ষরে, 'যত পাইবে, তত মারিবে' এই উপদেশ লিখিত ছিল, এরূপ একখণ্ড কাগজ। স্থানাভাব বশতঃ, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সকল সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান বাঞ্ছনীয় না হইলেও, বিশেষত্ব হেতু, অপর একটী সম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ-যোগ্য। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ কোনও বিষয়ে প্রথমে মতপ্রকাশ করেন না। অন্যান্য সম্প্রদায় আপনাপন অভিমত ব্যক্ত করিলে, ইঁহারা কোনও একটীকে আক্রমণ করিয়া, তদ্বিরুদ্ধ মত প্রচার কিম্বা এক সম্প্রদায়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া, প্রতিযোগী অপর একটীর মত পোষণ করেন। সম্বাদ পত্রের কলেবর, প্রায়শঃ, ইঁহাদের দ্বারা নিম্নলিখিত রূপে পরিপুষ্ট হয়ঃ 'লেডি ম্যাণ্ডারিণার (Lady Mandarina) জর্ম্মণিযাত্রা সম্বন্ধে উস্কোভাইট্‌গণ যে জনরব প্রচার করিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও সত্য নাই। উক্তলেডী সম্প্রতি ফেসিপ্টা রোগাক্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার বারণ্ ক্লিফ্ তাঁহাকে গৃহ হইতে বহির্গতা না হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।' "মরকো সুলতানের প্রধান ঘোটক ওফিরের গলরোগে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ 'বিশ্বালোক' যে কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা উক্ত সংবাদপত্রপরিচালকগণই জানেন। 'প্রাতঃকালের' সহকারী সম্পাদক সুলতানের পশুচিকিৎসকের নিকট হইতে যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে ওফিরের রোগ বিবরণ ও মৃত্যু সময় নির্ভুলরূপে লিখিত আছে। পাকস্থলীরোগ ঐ ঘোটকের মৃত্যু-কারণ এবং বিগত ২৪শে জুলাই বেলা ৩টা ৩মিনিট ২ সেকেণ্ডের সময় উহার মৃত্যু হয়। ওফিরের মৃত্যু সংবাদ 'প্রাতঃকাল' যাহা দিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্য।" এইরূপে অপরাবিদ্যায়, বুদ্ধিহীন বা অপরিণত-বুদ্ধি মানবগণের অন্তঃকরণ সামান্য জড় পদার্থে ও তৎসম্পৃক্ত লঘু বিষয়-নিচয়ে অত্যাসক্ত থাকিয়া, আদৌ অন্তর্মুখ বা গুরুবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইবার অবকাশ ও সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। মোহবশে, প্রথম হইতেই যাহাতে মানবমন বহির্মুখ হইতে অভ্যস্ত হয়, এরূপ শিক্ষা কলিযুগে সমধিক প্রশংসনীয়া। বিদ্যালয়ে বালকগণকে বাহ্যাকারেঙ্গিত ও জড়দ্রব্যসংস্পর্শে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। শিশু-উদ্যান-শিক্ষা-প্রণালী (Kinder garten system) সমস্ত সভ্যজগতে পরিব্যাপ্তা হইয়াছে। অথকিং, অপরাবিদ্যামণ্ডিত কলিযুগে ইহাই যুক্ত। মানসিক অতিব্যাপ্তি নিবন্ধন যেমন মানবমনের দৌর্ব্বল্য সাধিত হইতেছে, তদনুপাতে বিষয়ের অতিব্যাপ্তি দ্বারা বিদ্যা মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এবম্বিধ আচারব্যবহারসম্পন্ন কলিমানবচরিত নিয়ামন কল্পে, অপরাবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ ন্যায় (Logic), মনোবিজ্ঞান (Psychology), নৈতিক দর্শন বা চরিত্রনীতিবিজ্ঞান (Ethics) প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্র মানবকে শুদ্ধরূপে বিচার করিবার নিয়ম বা উপায় উপদেশ দেয়। মনোবিজ্ঞান মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া, মানসিক অবস্থানিচয় যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করে। চরিত্র-নীতি-বিজ্ঞান (Ethics or Moral philosophy) মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার নৈতিক-বিচার-মীমাংসা (moral judgment) সমাধান করে এবং মনোবিজ্ঞানের ন্যায় কেবল মানসিক অবস্থা প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। এইরূপে মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং চরিত্র-নীতি-বিজ্ঞান (ethics) ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। বস্তুতঃ, প্লেতো (Plato) কোম্‌ত (Comte), স্পিনোজা (Spinoza) প্রমুখ কতিপয় দার্শনিক ব্যতীত, অধিকাংশ কলিদার্শনিকই মনোবিজ্ঞানকে চরিত্র-নীতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ বিবেচনা করেন। চরিত্রনীতিবিজ্ঞান মানবচরিত্র সমালোচনা করে বলিয়া, সমাজনীতিবিজ্ঞান (Sociology) এবং রাজনীতিবিজ্ঞানের (Politics) সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আবার, মানবচরিত্র সমালোচনায়, দৃশ্য বস্তুর প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে, দৃশ্যাতিরিক্ত অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের সমালোচনা করিতে হয় বলিয়া, চরিত্রনীতিবিজ্ঞানের, দর্শন-শাস্ত্র বা সূক্ষ্মতত্ত্ববিজ্ঞানের (Metaphysics, Philosophy or Ontology) সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ, দর্শন-শাস্ত্র বা সূক্ষ্মতত্ত্ববিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক থাকা নিবন্ধন, পণ্ডিতগণ চরিত্র-নীতি-বিজ্ঞানের দর্শন-শাস্ত্র (moral philoshopy) নাম প্রদান করেন। সূক্ষ্মতত্ত্ববিজ্ঞান (ontology) ও দর্শন-শাস্ত্রের (philosophy) পার্থক্য এই যে, সূক্ষ্মতত্ত্ববিজ্ঞান (ontology) কেবল দৃশ্য বস্তুর প্রকৃত সূক্ষ্ম কারণ (the real) আলোচনা করে; কিন্তু দর্শন-শাস্ত্র (philosophy) দৃশ্য বস্তুর প্রকৃত সূক্ষ্ম কারণ ও দৃশ্যবস্তু (the real and the phenomenal) উভয় বিষয়েরই সমালোচনা করে। অতএব শাস্ত্রবলে কলিমানবচরিত কিরূপে নিয়ামিত হইতেছে, তদুদ্দেশ্যমূলক সর্ব্বশাস্ত্রসংশ্লিষ্ট চরিত্রনীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় তাহা উপলব্ধি করা যায়। অপরাবিদ্যায় দার্শনিকগণ সাধারণতঃ যে মনের বুদ্ধিস্তর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করেন, স্মরণোদ্দীপন জন্য এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক। (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সাংসারিক মঙ্গল-বিচারে সর্ব্বোন্নত মঙ্গলের (the highest good)

স্বরূপাবধারণ করিয়া, কিরূপ বাসনাসঞ্চালনজ চেষ্টা বা কর্ম্মদ্বারা, মানব তাহা লাভ করিতে পারে, তন্নিরূপণই চরিত্রনীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। প্রথমোক্ত কার্য্যে, চরিত্র-নীতি-শাস্ত্র সত্যাশ্রিতন্যায় (right) ও নিয়মের (law) মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে এবং শেষোক্ত কার্য্যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় সকল নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য : (১) বাসনা বিশ্লেষণ ; (ক) বাসনার বুদ্ধি-উপাদান যাহা বাসনাকে লক্ষ্যাভিমুখে চালিতা করে, (খ) বাসনার অপচয়কারী উপাদান যাহাতে বাসনা অভাব বোধ করে, (গ) বাসনার কার্য্যকর উপাদান—অভিলাষ, অভিপ্রায়, সংকল্প ও কার্য্য। (২) কর্ম্মপ্রবৃত্তিভূতা বাসনার শ্রেণী বিভাগ। (৩) নৈতিক জীবনে সুখের স্থান। (৪) নৈতিক জীবনে যুক্তির স্থান। (৫) নৈতিক জীবনে অভিরুচির (will) স্থান। (৬) সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ। (৭) নৈতিক অনুভূতির বিশ্লেষণ। (৮) নৈতিক বিচার ; (ক) নৈতিক বিচারের বিষয়, (খ) ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড, (গ) নৈতিক বিচারের প্রণালী। (৯) নীতি-বোধ-শক্তি অর্থাৎ হিতাহিত-বিচার-বুদ্ধি বা বিবেক (conscience)। (১০) নৈতিক সংস্কার। (১১) কর্ত্তব্যতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি। (১২) নৈতিক-নিয়ম-প্রভুত্বের ভিত্তি। (১৩) অধিকার (right), পুণ্য, যোগ্যতা ও দায়িত্ব। (১৪) মঙ্গল এবং কর্ত্তব্যতা। (১৫) কর্ত্তব্যতা এবং পুণ্য।

কলিদার্শনিকগণ, সাংসারিক-ব্যাপার-নিয়ামনে, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। নিরীশ্বরবাদীগণের বিষয় আদৌ উল্লেখ-যোগ্য নহে। কিন্তু ঈশ্বরবাদীগণও, আন্তরিক ভাবে,মানব-কার্য্যে জগদীশ্বরের সর্ব্বময় প্রভুত্ব-বিশ্বাসে পরাঙ্মুখ। ইঁহাদের মতে, ঈশ্বর মানবকে যে হিতাহিত-বিচার-বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তৎসাহায্যে, স্বাধীন অভিরুচি (free will) পরিচালন দ্বারা মানব স্বীয় কর্ম্মকাণ্ড নির্ব্বাহ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সকল মানব সমবুদ্ধিবিশিষ্ট নহে। এজন্য, অধিক বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ, অল্প বুদ্ধিমান সাধারণ মানবগণের পথ-প্রদর্শন কল্পে, নৈতিকনিয়মাবলী বিরচন ও প্রচার করেন। সাধারণ নরগণ দার্শনিকগণকৃত নিয়মপালনে আপত্তি উত্থাপিত করিলে, দার্শনিকগণের কেহ কেহ, কেবল সেই সময়ে, ঈশ্বরদত্ত হিতাহিত বিচার বুদ্ধি বা বিবেক বলে যে সকল নৈতিক নিয়ম প্রস্তুত হইয়াছে,তাহা ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ অবশ্যপ্রতিপাল্য এই-রূপ বলিয়া, ঈশ্বর-প্রভুত্বের শরণ গ্রহণ করেন। নচেৎ, তাঁহারা অন্য কোনও সময়ে ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন না। আবার অধিক বুদ্ধিবিশিষ্ট দার্শনিকগণ-

মধ্যেও মতৈক্য নাই। যদিও, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরদত্ত বিবেক মানবকে যে পরামর্শ দেয়, তাহার দ্বৈত নাই, তথাপি ইঁহারা হিতাহিত বিচারবুদ্ধি সাহায্যে নৈতিকনিয়মগঠনে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহা অপরাবিদ্যার লীলা। ভোজন, শয়ন, বিহারাদি নিজ-দৈহিক আত্মগত সামান্য কার্য্যে, মানবের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, সত্য। কারণ, মানব বিস্মৃতিমণ্ডিত ঈশ্বরশক্তি। এতদ্ব্যতীত, সমাজ-গঠন, সমাজ-স্থিতি, সমাজ-রক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় মানবগণনীয় বৃহৎ বিষয়ে, মানবের প্রবৃত্তি, চেষ্টা ও কর্ম্ম সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। মঙ্গলময় ন্যায়বিচারে মানবের সাংসারিক কার্য্য নিয়ামন করিয়া, মানবগণকে রক্ষা করেন। সামান্য সামান্য ব্যাপারে মনুষ্যের যে স্বল্প স্বাধীনতা আছে, তাহাতেই মোহগ্রস্ত কলিমানব এতদূর উন্মার্গগামী যে, ন্যায়বান পরমপিতা মানবের সূক্ষ্মশরীরের পাবিত্র্যবিধানজন্য, সময়ে সময়ে ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা তাহার স্থূল শরীরের স্বাধীনতা হরণ করেন। যাহা হউক, এ স্থলে এবিষয়ের অধিক আলোচনা বাঞ্ছনীয় নহে। পরাবিদ্যায়, দার্শনিকগণ প্রত্যেক মানবীয় কার্য্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিয়া, মানবের মানসিক বৃত্তিপরিচালনপ্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতি নিরূপণ করিতেন এবং সাধারণে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পবিত্র নিয়ম ধর্ম্মস্বরূপ প্রতিপালন করিত। কারণ, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ এবং অকৃত্রিম; তাহাতে মতান্তর উপস্থিত হইতে পারে না কিম্বা সন্দেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। অপরাবিদ্যায়, দার্শনিকগণ যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন, তথাপি, প্রায়শঃ, মানবের সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুধাবন করিবার প্রয়াস করেন না।

কলিযুগে দার্শনিক পণ্ডিতগণ কিরূপে সাংসারিক মঙ্গল-বিচার ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের স্বরূপাবধারণ করেন, এক্ষণে তাহার অবতারণা করা আবশ্যক। লৌকিক কার্য্যে বাঞ্ছার বিষয় বা বাঞ্ছা যাহা অনুসরণ করে, তাহা মঙ্গল। ইহাই মঙ্গলের সাধারণ সংজ্ঞা। কারণ, সাধারণতঃ, মনুষ্য যাহা অনুসন্ধান করে তাহা মঙ্গল এবং যাহা পরিত্যাগ করে তাহা অমঙ্গল বা অশুভ বিবেচিত হয়। লোকে, মঙ্গল বলিয়া, স্বাস্থ্য, ধন, দয়া, সাহস প্রভৃতি বাঞ্ছা করে; কিন্তু অমঙ্গল বলিয়া, রোগ, দারিদ্র্য, নির্দ্দয়তা, কাপুরুষতা প্রভৃতি বর্জ্জন করে। অতএব শুদ্ধতররূপে মঙ্গলের এই প্রকার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায়: বাঞ্ছিত দ্রব্যের যে গুণে ঐ দ্রব্য মানবের অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা মঙ্গল। ঐ

গুণের প্রকৃতি যাহাই হউক, উহার তারতম্য আছে। কারণ, মানবগণনায়, ধন অপেক্ষা স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য অপেক্ষা দয়া উত্তম বা উৎকৃষ্ট। আবার, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত গুণ ভেদে মঙ্গলের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। স্বাস্থ্য, ধন প্রভৃতি স্থূল মঙ্গল; দয়া, সাহস প্রভৃতি সূক্ষ্ম মঙ্গল। মানব নিজের জন্য যে মঙ্গল বাঞ্ছা করে, তাহা ব্যক্তিগত মঙ্গল; যেমন, স্বাস্থ্য, ধন প্রভৃতি; কিন্তু অপরের জন্য যে মঙ্গল বাঞ্ছা করে, তাহা সাধারণ মঙ্গল; যেমন, দয়া, সাহস প্রভৃতি। অপিচ, উদ্দেশ্য বিধেয় ভেদে মঙ্গল দুই প্রকার। কোনও কোনও মঙ্গল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং কোনও কোনও মঙ্গল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মঙ্গল লাভের উপায় স্বরূপ। যদি স্বাস্থ্যপ্রাপ্তি কুশল হয়, তাহা হইলে, ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ হয় বলিয়া, ঔষধও কুশল। বিধেয়ে উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়া, বিধেয়কেও মঙ্গল বলা হয়। পরন্তু, ইহা দ্বারা সাপেক্ষ বা গৌণ মঙ্গল ও নিরপেক্ষ, মুখ্য বা সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের পার্থক্য পরিস্ফুত হয়। কোন চরমোদ্দেশ্যলাভজন্য, উপায় স্বরূপ যাহা বাঞ্ছা করা যায়, তাহা সাপেক্ষ, গৌণ বা অধীন মঙ্গল (Relative good)। কর্ত্তব্যতাসাধনের ক্ষমতা-লাভ জন্য স্বাস্থ্য এবং বিদ্যানুসরণ জন্য ধন মানবের বাঞ্ছনীয়। অপর কোনও মঙ্গলের অপেক্ষা না করিয়া, যাহা মুখ্যতঃ বাঞ্ছিত হয়, এবং যাহা কোনও চরম মঙ্গলের অধীন নহে, তাহা নিরপেক্ষ, মুখ্য বা সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল (the absolute or the highest good)। অনুসন্ধানে দেখা যায়, সাধারণতঃ যাহা মঙ্গল বিবেচিত হয়, তাহা সাপেক্ষ বা গৌণ মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না ঐ সকল মঙ্গল অপর মঙ্গল লাভের উপায় স্বরূপ, যাহা আবার উচ্চতর মঙ্গলের অপেক্ষা করে। সুতরাং এমন কোনও চরম উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে, মানবের অপরাপর যাবতীয় বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য যাহার সাপেক্ষ ও অধীন। নতুবা, মানব কেবল 'তাহার পর কিছু,' 'তাহার পর কিছু' ক্রমে সীমারহিত ভাবে মঙ্গল মনন করিয়া যাইত এবং অসীমলক্ষ্য মানবের কার্য্যোত্তেজিকা শক্তি উদ্দেশ্যহীন ও বিফল হইয়া যাইত। অতএব, নিরপেক্ষ বা চরম মঙ্গলের নিম্নলিখিত লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান আছে। (১) নিরপেক্ষ মঙ্গল একটী; কিম্বা একটী মাত্র নিরপেক্ষ, মুখ্য বা চরম মঙ্গল হইতে পারে। যেখানে চরম মঙ্গলের অনেকত্ব আছে, সেখানে হয় তাহারা যুগপৎ প্রাপ্তব্য বলিয়া সমপ্রকৃতি কিম্বা একের ভগ্নাংশ সমূহ; নচেৎ তাহারা এরূপ পরস্পরবিরোধী যে, ভিন্ন ভিন্ন বাঞ্ছার বিবাদে, অবশেষে যেটী মনোনীত হইবে, অপর সকলে তৎক্ষণাৎ তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে বা বিলুপ্ত হইবে। (২)

ইহা নিজস্ব ভাবে মঙ্গল অর্থাৎ নিজগুণে বাঞ্ছিত হয়, অপর কাহারও জন্য নহে। (৩) ইহা সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল, মানবকার্য্যকারিতার চরম উদ্দেশ্য; এক উদ্দেশ্য, যথায় মানবের যাবতীয় লক্ষ্য পর্য্যবসিত হয় এবং মানবের সমস্ত স্বার্থ-বাঞ্ছা ও কার্য্যানুসরণ যাহার অধীন। ইহা গৌণ বা সাপেক্ষ মঙ্গলের ন্যায় মানবান্তঃকরণের একাংশ তুষ্ট করে না; সমস্ত অন্তঃকরণ পরিতুষ্ট করে। (৪) ইহা ব্যক্তিগত ও সাধারণ মঙ্গল, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিজের জন্য ইহা বাঞ্ছা করে, তেমনি, সমদশাবিশিষ্ট অপর সকলের জন্যও ইহা বাঞ্ছা করে। সার্ব্বোচ্চ মঙ্গলের এই গুণ নৈতিক নিয়মাবলীর কঠোর সর্ব্বাঙ্গীনতা ও মানবীয় নৈতিক জীবনের মৌলিক সামাজিকতার সহিত সংশ্লিষ্ট।

স্বাভাবিক মঙ্গল ও নৈতিক মঙ্গল ভেদে, মঙ্গলসমূহ মধ্যে আর একটী গুরুতর পার্থক্য উপলব্ধ হয়। যাহা নিজ গুণে বা অপর বস্তু লাভোদ্দেশ্যে বাঞ্ছিত হয়, তাহা স্বাভাবিক মঙ্গল। সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল আয়ত্তীকরণ মানসে, স্বাভাবিক মঙ্গলের ন্যায্য বা উপযুক্ত ব্যবহার নৈতিক মঙ্গল। ধন স্বাভাবিক মঙ্গল। বিষয়বুদ্ধি (Prudence) যাহা মানুষের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল প্রাপনার্থ মানবকে ধনের ন্যায্য ব্যবহার করায়, তাহা নৈতিক মঙ্গল। উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, নৈতিক মঙ্গল কেবল মানবীয় আচরণে প্রযোজ্য; পরন্তু স্বাভাবিক মঙ্গল মানবের অনুসরণীয় বিষয়ে প্রযোজ্য। স্বাভাবিক মঙ্গ-লের সদসৎ বা ন্যায্যান্যায্য ব্যবহারের ক্রমানুসারে, মানবাচরণ সৎ বা অসৎ, ন্যায্য বা অন্যায্য, ভাল বা মন্দ বিবেচিত হয়। নৈতিক মঙ্গলালোচনায়, স্বাভাবিক মঙ্গল ও সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল ব্যতীত, ন্যায় ও নিয়মের বিষয় স্বতঃই উপস্থিত হয়। কারণ, ন্যায়ের অর্থ 'যাহা নিয়মানুযায়ী'। এ বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। প্রয়োগ এবং ব্যবহারে মঙ্গল শব্দের যে বিভিন্ন অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তদ্দ্বারা মঙ্গলের আরও একটী শ্রেণী-বিভাগ নিষ্পাদিত হয়। বাঞ্ছার বিষয় বা মানবকার্য্যকারিতার লক্ষ্য যে মঙ্গলের সংজ্ঞা, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ মঙ্গল মানবীয়, এবং অমানবীয় মঙ্গলের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, অমা-নবীয় মঙ্গল মানবের বাঞ্ছা বা যুক্তিযুক্ত কার্য্যদ্বারা লাভ করা যায় না। আমরা যে অর্থে মনুষ্যকে উত্তম বলি, সে অর্থে পুষ্পকে উত্তম বলি না। অধিকতর বিস্তৃত অর্থে মঙ্গলের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায়: 'বস্তুবিদ্যমানতার চরমো-দ্দেশ্য বা কারণ মঙ্গল।'

সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল বা মানবকার্য্যকারিতার চরমোদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিকগণের

তিন সর্ব্বপ্রধান সম্প্রদায় তিন প্রকার অভিমত ব্যক্ত করেন :—

১। উল্লাসবাদ (Hedonism, Gk Hedone=delight, enjoyment, pleasure)। সুখে বা হর্ষানুভূতির আপ্যায়নে সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল বিদ্যমান। চরমপন্থী উল্লাসবাদীগণ, হর্ষানুভবশক্তির মোদনে শাসন-নিয়মের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না; মধ্যপন্থী উল্লাসবাদীগণ, কিঞ্চিৎ পরিমাণে, তাহা করেন। সুখের যোগাত্মিকা ও বিয়োগাত্মিকা সংজ্ঞা প্রদান করে বলিয়া, প্রফুল্ল ও বিষণ্ণ-ভেদে উল্লাসবাদ দুই প্রকার। আত্মনীন উল্লাসবাদী আত্মসুখ নিজকার্য্য-কারিতার চরমলক্ষ্য বিবেচনা করেন। পরনীন বা সামাজিক উল্লাসবাদী অপরের বা সমাজের সুখবিধানোদ্দেশ্যে কার্য্য করেন। যে বিবর্ত্তবাদ দ্বারা সমাজের সহিত মানবের সম্বন্ধবিষয়ক পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা চরিত্র-নীতিবিজ্ঞানশাস্ত্রে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে হইতে যে উল্লাসবাদ প্রচলিত আছে তাহা অবিবর্ত্তবাদীয় উল্লাসবাদ। মনোবৈজ্ঞানিক উল্লাসবাদী মানসিক অনুভব শক্তি হইতে নীতিসূত্র সংগ্রহ করেন। যৌক্তিক উল্লাসবাদী নিজ যুক্তি দ্বারা নৈতিক নিয়ম গঠন করেন। অধিকাংশ মানবই উল্লাসবাদমতাবলম্বী।

২। কঠোরব্রতবাদ (Rigorism, Lat. rigor—inflexibility, severity from rigere to be stiff, to stand firm.)। সদিচ্ছা, ন্যায্য আচরণ ও শ্রদ্ধা সহকারে নৈতিক নিয়মের সম্পূর্ণ প্রতিপালনে, সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা, পূর্ব্বোক্ত বিধেয়ে উদ্দেশ্যের আরোপ নিয়মে, নৈতিক নিয়মকে চরমলক্ষ্য ধরিয়া, তৎপ্রতিপালনই সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল। নৈতিক নিয়ম-পালনে যতই কষ্ট উপস্থিত হউক, বা যে কোনও ফলপ্রাপ্ত হওয়া যাউক, তৎ-সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া, কেবল নৈতিকনিয়ম-পালনই সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল বিবেচ্য। চরমপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ আমোদানুভূতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন এবং স্বাভাবিক মঙ্গলের সত্তা স্বীকার করেন না। অর্থাৎ, তাঁহারা বাঞ্ছনীয় বিষয়কে মঙ্গল এবং বর্জ্জনীয় বিষয়কে অশুভ বলিতে চান না। তাঁহারা কেবল নৈতিক মঙ্গল ও সদিচ্ছাকেই মঙ্গল বলেন। মধ্যপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ কিয়ৎপরিমাণে হর্ষানুভূতির প্রার্থনা মোদন করেন এবং অকৃত্রিম স্বাভাবিক বাসনার বিষয়ে কিঞ্চিৎ মূল্য স্থাপন করেন। কিন্তু, যৎপ্রতিপালন সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল, ইঁহারা সর্ব্ববিধ বাসনাকে সেই নৈতিক নিয়মের বশীভূত করেন।

৩। সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদ (Eudæmonism. Gk. Eudæmonia—welfare, happiness, perfection)। নৈতিক বুদ্ধির উপদেশানুসারে,

যুক্তি ও আমোদানুভূতির প্রার্থনা যুগপৎ তুল্যভাবে পূর্ণ করিয়া, উভয়ের সমানয়নে যে আত্মোৎকর্ষ সমাহিত হয়, তাহাতে সর্ব্বোচ্চমঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদের প্রচারকর্ত্তা গ্রীকদার্শনিক আরিষ্টটল (Aristotle) তাঁহার নিজগত ব্যাখায়, সুখার্থক গ্রীক Eudæmonia শব্দের প্রয়োগ এবং উহার 'ভালরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা' বা 'নিজকার্য্যে ভালরূপে মনোযোগী হওয়া' এইরূপ বিস্তৃতার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নরজাতীয় প্রাণীস্বরূপ মানবের যে বিশেষ কার্য্য আছে, তৎসম্পাদনে ইহা সাধিত হয়। কেবল বাঁচিয়া থাকা মানবের বিশেষ কার্য্য নহে; কারণ উদ্ভিদ্ও বাঁচিয়া থাকে। কিম্বা ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি থাকা মানবের বিশেষ কার্য্য নহে; কারণ পশুদিগেরও ইহা আছে। যুক্তির শাসনাধীনে কর্ম্মজীবন যাপন করা মানবের বিশেষ কার্য্য। এ পর্য্যন্ত, আরিষ্টটল কঠোরব্রতবাদীর (Rigorist) ন্যায়, যৌক্তিক কার্য্যে সর্ব্বোচ্চমঙ্গল প্রাপ্তির উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু, তথাপি, তিনি হর্ষানুভূতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন না। তিনি আমোদকে যৌক্তিকক্রিয়াকারিতার সমমূল্যবান বিবেচনা করেন। আমোদ ক্রিয়াশক্তির অনুপূরক। ক্রিয়াশক্তি আমোদে ভার মোচন করে এবং আমোদে বিশ্রাম লাভ করে। সম্পূর্ণ শারীরিক বিকাশে সৌন্দর্য্য যেরূপ, ক্রিয়াশক্তিতে আমোদও সেইরূপ। আবার, কঠোরব্রত-বাদীগণ যেমন স্বাভাবিক মঙ্গলের সত্তা অস্বীকার করেন, আরিষ্টটল তাহা করেন না। প্রত্যুত, তিনি স্বাভাবিক মঙ্গলকেও বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে, যদিও, সর্ব্বোচ্চমঙ্গল সর্ব্বোচ্চ সৎকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, তথাপি, সম্পূর্ণ সুখের জন্য বাহ্যমঙ্গলের আরাধনা অতীব প্রয়োজনীয়।

নৈতিক মঙ্গল যে ন্যায় ও নিয়মের সহিত সম্বদ্ধ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ, ন্যায় ও মঙ্গল পৃথক্ বিচারিত হয়। লোকে সচরাচর স্বাস্থ্যকে উত্তম বলে; কিন্তু ন্যায্য বলে না। অপিচ স্বাস্থ্যপ্রাপ্তি বা স্বাস্থ্যরক্ষণ বিষয়ে মানবেব আচরণ ন্যায্য ও উত্তম কথিত হয়। সুতরাং, মঙ্গল মানবের আচরণ এবং আচরণের লক্ষ্য উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য; পরন্তু ন্যায় মানবাচরণে প্রযোজ্য। ফলতঃ, কঠোরব্রতবাদীগণ ব্যতীত, অপর সমস্ত দার্শনিক, যে আচরণে মানব সর্ব্বোচ্চমঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তাহা ন্যায্য আচরণের দার্শনিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে আচরণ মন্দ বা অন্যায্য। অথবা, উল্লাসবাদী (Hedonist) এবং সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদী (Eudæmonist)গণের মতে, ন্যায় সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের

অধীন। কঠোরব্রতবাদে ন্যায় ও সর্ব্বোচ্চমঙ্গল এক। এমন কি, চরমপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ (Extreme rigorists) ন্যায়কে কেবল সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল বলিয়া ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা ন্যায়কে একমাত্র মঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ন্যায়ের মুখ্যার্থ 'নিয়মানুযায়ী' ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং, ন্যায় এবং নিয়ম ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। দার্শনিকগণ, যে আচরণ নৈতিক-নিয়ম-সঙ্গত, তাহাকে ন্যায্য এবং যে আচরণ নৈতিক-নিয়ম-সঙ্গত নয়, তাহাকে অন্যায্য বলেন। অতএব, নৈতিক নিয়ম ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ডস্বরূপ। যে সুনীতি দ্বারা মানবাচরণের ন্যায়ান্যায় অবধারণ করা যায়, তাহাই নৈতিক নিয়ম। নৈতিক নিয়মের দুইটী লক্ষণা আছে। (১) সর্ব্বপ্রযোজ্যতা। নৈতিক নিয়মের উদ্দেশ্য সর্ব্বব্যাপী এবং সমস্ত যৌক্তিক প্রাণীতে ইহা প্রযোজ্য। [উল্লাসবাদীগণ ইহা স্বীকার করেন না।] (২) প্রভুত্ব। নৈতিক নিয়ম শাসন-কারিণী নীতি বিধায়, উহা অবর্জ্জনীয় ও অনতিক্রমনীয়। ইহার নিজগুণ বশতঃই হউক, [কঠোরব্রতবাদ] বা কোনও চরমোদ্দেশ্য লাভ কল্পেই হউক, মানবাচরণ ইহার অধীন। নৈতিক নিয়ম আচার-নিয়ামক আদেশ তুল্য; 'ইহা করিবে' বা 'ইহা করিবে না।' আবার, ইহাদ্বারা, কর্ত্তব্যতার (Duty) সহিত নৈতিক নিয়মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হয়। অযৌক্তিক ভাবে (mechanically) প্রাকৃতিক, ঐশ্বরিক বা সামাজিক দণ্ড হইতে নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব উদ্ভূত হওয়া কল্পিত হয়। [তথাপি, ইহাই উল্লাসবাদীগণের মত।] যৌক্তিক ভাবে (rationally). যাহা বিনাবাহুবল-প্রয়োগে মানবকে সদাচারে প্রবৃত্ত করায়, তাদৃশ যুক্তি হইতে নৈতিকনিয়মের প্রভুত্ব সঞ্জাত হওয়া বিবেচিত হয়। [ইহা কঠোরব্রতবাদী এবং সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদীগণের মত।]

প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত নৈতিক নিয়মের পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়ম বস্তুনিচয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ বা সম্পর্ক প্রদর্শন করে; পরন্তু নৈতিক নিয়ম বস্তুর মূল্য নির্ণয় করে। নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকারিণী নীতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহার আদেশ-পালন-কর্ত্তব্যতা উপদেশ দেয়। প্রাকৃতিক নিয়ম তাহা করে না। যেহেতু, বহুত্বের একত্বীকরণ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সুতরাং চরিত্রনীতিবিজ্ঞান (Moral philosophy) সেইরূপ চেষ্টা করে। চরিত্রনীতিবিজ্ঞান বা নৈতিকদর্শন সত্যশৃঙ্খল সদৃশ; ইহা অসংশ্লিষ্ট নিয়মপুঞ্জ নহে। নৈতিক নিয়মের কতকগুলি মৌলিক বা মুখ্য এবং অবশিষ্ট মৌলিক-নিয়মজাত বা গৌণ। অতএব, মুখ্য ও গৌণভেদে নৈতিক নিয়ম দুই প্রকার।

নিম্নলিখিত বচনাবলী মুখ্য নৈতিক নিয়মের উদাহরণ :—

(১) যৌক্তিক উল্লাসবাদ। 'তোমার নিজ অভিজ্ঞতা বা জাতীয় অভিজ্ঞতানুসারে যাহা বৃহত্তম সুখ-সমষ্টি বা যাহা সাকল্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ, তৎপ্রতি লক্ষ্য কর!' দার্শনিক সিজ্‌উইক্ (Sidgwick)।

(২) কঠোরব্রতবাদ। 'যাহা প্রকৃতিসঙ্গত অর্থাৎ যাহা প্রকৃতির গতির সহিত মিলিয়া যায় বা জগতের সকলের যুক্তি-সম্মত, তাহা কর।' Stoics বা অবিচল চরমপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ। (Stoic শব্দ 'যে ব্যক্তি সহজে বিচলিত হন না' এই অর্থ প্রকাশ করে। গ্রীকদার্শনিক জেনো Zeno একটী তোরণতলে ছাত্রবৃন্দকে দর্শন শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ ষ্টোইক্ Stoic নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অধুনাতন, চরমপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণও এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।)

'এরূপ ভাবে কার্য্য কর যে, তোমার কর্ম্মরীতি সার্ব্বভৌমিক বিধিবন্ধনগত নিয়মের ন্যায় সর্ব্বসময়ে দৃঢ়া হইতে পারে।' চরমপন্থী কঠোরব্রতবাদী ক্যাণ্ট্ (Kant)।

(৩) সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদ। 'স্বয়ং মনুষ্য হও এবং অপর সকলকে মানবের ন্যায় সম্মান কর।' দার্শনিক হিগেল্ (Hegel)।

মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বাসনা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া, দার্শনিকগণ নির্ণয় করেন যে, বাসনার বুদ্ধি-উপাদান বা যে উদ্দেশ্যে বাসনা কর্ম্মে প্রবৃত্তা হয়, তাহার অনুভূতি আছে। ফলতঃ ইহাই বাসনাকে কর্ম্মে চালিতা করে। ইহা কি? মনোবৈজ্ঞানিক উল্লাসবাদীগণ বলেন ইহা আমোদ বা সুখ। কারণ, মনুষ্য মাত্রেই যোগাত্মক আমোদ বা কষ্টবিতাড়ন-সম্ভূত বিয়োগাত্মক আমোদ পাইবার আশায়, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, অপরাপর দার্শনিকগণ বলেন, ইহা প্রকৃত নহে। প্রত্যেক সজীব প্রাণীমধ্যে এরূপ একটী শক্তি আছে, যাহা তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি নিরূপিতা করিয়া দেয়। এই উত্তেজিকা শক্তি দুই প্রকার : মুখ্যা ও গৌণা। মুখ্যাশক্তি প্রথমে আবির্ভূত হইয়া, করণীয় কর্ম্মের সুখ বা দুঃখ নির্ণয় করে। গৌণা শক্তি কেবল কর্ম্মের সুখে আমোদ অনুভব করে। এই মুখ্যা উত্তেজনা শক্তিই বাসনার বুদ্ধি-উপাদান। বুদ্ধি-উপাদান যোগাত্মক। কিন্তু বাসনার বিয়োগাত্মক বা অপচয়কারী উপাদানও আছে, যদ্দ্বারা বাসনা অভাব বোধ করে। যে জন্য বাসনা অভাব অনুভব করে, তাহার সমবায় না হওয়া পর্য্যন্ত

বাসনার ঐ অভাব বোধ থাকে। বাসনা ব্যক্তিগতভাবে অভাব বোধ করে বা এরূপ কোনও ব্যক্তির সত্তা ইচ্ছা করে যাহা হইতে অভাব বিদূরিত হইয়াছে। এজন্য প্রত্যেক বাসনাকে আত্মনীন বলা যায়। অসম্পূর্ণতা হইতে যেমন অভাব বোধ হয়, সম্পূর্ণতা হইতেও সেইরূপ অভাব বোধ হইতে পারে। নেত্ররোগ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, মেঘাচ্ছন্ন দিনের স্বল্পালোক পরিত্যাগ করিয়া, অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার তেজস্বীচক্ষুষ্মান্ মেঘাপসারণে পূর্ণসূর্য্যালোক বাঞ্ছা করে। সহজ ও জটিল ভেদে বাসনার কার্য্যকর উপাদান দুই প্রকার। মানবের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বাসনা বা অভিলাষ উদ্দেশ্য-বর্জ্জিত ক্ষণিক বাঞ্ছা কিম্বা যে বস্তু লাভ করা যায় না তাহার ইচ্ছা। যুবাবয়সে কখনও কখনও মনুষ্যের বিগত বাল্যজীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিলাষ (Desire) হয়। মানব অভিপ্রায় (Motive) দ্বারা কার্য্যপ্রণালীর উদ্ভাবন করে এবং সংকল্প (Intention) দ্বারা উদ্ভাবিত প্রণালীনিচয়ের মধ্যে একটীকে মনোনীত করে বা বিরুদ্ধ প্রণালীনিচয়ের প্রত্যাহার করে। সংকল্পের বাহ্যাকার কার্য্য।

বাসনা বা কর্ম্মপ্রবৃত্তির যে মুখ্যা ও গৌণা দ্বিবিধা উত্তেজিকা শক্তি আছে, তন্মূলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি বা বাসনাও মুখ্যা ও গৌণা ভেদে দুই প্রকার। মুখ্যা কর্ম্মপ্রবৃত্তি উপযোগী বিষয় লক্ষ্য করে। গৌণা কর্ম্মপ্রবৃত্তি, উক্তবিষয়ে যে সুখ বা আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করে। প্রত্যেক মুখ্যা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমোদপ্রিয়তাবশে গৌণা কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। দার্শনিক মার্টিনিউ (Martineau) নিম্নলিখিত রূপে কর্ম্মপ্রবৃত্তির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—

কর্ম্মপ্রবৃত্তি।

মুখ্যা	গৌণা
১। (স্থূল) শরীররক্ষা, বর্দ্ধন, বা বিস্তার সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তিনিচয় (Propensions)।	১। (স্থূল) শরীর সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তিনিচয় (Propensions)।
(ক) ক্ষুৎপিপাসা ও মৈথুনলিপ্সা।	(ক) স্থূলেন্দ্রিয়বিলাসপ্রিয়তা।
(খ) শ্রম এবং বিশ্রাম-স্পৃহা।	(খ) ক্ষমতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা।
২। বিরক্তি বা প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি। যাহা অনিষ্টকর বা বিরূপ তাহা দূরে	২। বিরক্তি বা প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি (Passions)।

নিক্ষেপ করা বা তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার ইচ্ছা (Passions)

(ক) ঘৃণা বা বর্ত্তমান অশুভে বিতৃষ্ণা।

(খ) ক্রোধ বা যাহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তৎপ্রতি আক্রোশ।

(গ) ভয় বা ভবিষ্যৎ অশুভে বিরক্তি।

৩। স্নেহ বা সমপ্রকার বিবেচনায় অপর মনুষ্য বা প্রাণীর প্রতি আনুরক্তি (Affections)।

(ক) বাৎসল্য অর্থাৎ যাহাতে পিতৃ-মাতৃজীবন বিস্তারিত হয় বা পিতৃমাতৃ-ছবি নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সন্তানের প্রতি স্নেহ।

(খ) সামাজিকতা বা আমাদের সমান কিম্বা সম্পূর্ণ সমান না হইলেও অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের প্রতি স্নেহ।

(গ) দয়া বা যাহারা অভাবগ্রস্ত তাহাদের প্রতি স্নেহ।

৪। সংস্কার যাহা চরম বা আদর্শ সম্বন্ধ লক্ষ্য করে এবং আমাদের অপেক্ষা যাহা উচ্চতর সেইরূপ হইবার আশা করে (Sentiments)।

(ক) বিস্ময় যাহা প্রকৃতি এবং বস্তুর কারণানুসন্ধানের অন্তর্নিহিত। (Wonder)

(খ) প্রশংসা যাহা প্রশংসনীয়ের অনুরূপ প্রদর্শন করিবার কৃত্রিম চেষ্টার অন্তর্গতা (Admiration)।

(গ) শ্রদ্ধা যাহা আমাদের যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ হওয়ার নৈতিক চেষ্টার অন্তর্ভুক্তা (Reverence)

(ক) মাৎসর্য্য, তিরস্কারকারিতা বা পরদোষ-প্রদর্শন এবং ঘৃণাকরণপ্রিয়তা।

(খ) অসূয়া বা ক্রোধপোষণ।

(গ) সন্দেহ, অবিশ্বাস বা ভয়-পোষণ।

৩। স্নেহ (হীনসংস্কারজ) [Affection or Sentimentality]।

(ক) আত্মামোদবর্দ্ধনকল্পে সন্তান বা বালক বালিকাগণ সহ ক্রীড়াপরতা।

(খ) সামাজিক মিলনামোদপ্রিয়তা।

(গ) দুঃখানুভূতি বা দুঃখ-কাতরতা (pity) উদ্রেক বা পোষণ করিবার রুচি।

৪। সংস্কার (Sentiments)

(ক) বুদ্ধিচর্চ্চামোদপ্রিয়তা।

(খ) শিল্পপ্রিয়তা বা রুচিবিলাসানুরক্তি।

(গ) আমোদলাভহেতু নৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে তর্কপ্রিয়তা।

এ পর্য্যন্ত যতদূর বলা হইয়াছে, তাহাতে নৈতিক জীবনে যথাক্রমে সুখ ও যুক্তির স্থান সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। মনোবৈজ্ঞানিক উল্লাসবাদীগণ, নৈতিকজীবনে, সুখের প্রথমস্থান এবং তৎপরে যুক্তির স্থান নির্দ্দেশ করেন। চরনপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ, নৈতিকজীবনে আদৌ সুখের স্থানের অস্তিত্ব স্বাকার করেন না। মধ্যপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ, প্রথমে যুক্তির স্থান এবং পরে সুখের স্থান নির্দ্দেশ করেন। সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদীগণ, নৈতিকজীবনে, সুখ ও যুক্তি উভয়কেই সমান আসন প্রদান করেন। এ পুস্তকে বিভিন্ন প্রধান ও অধীন দার্শনিকসম্প্রদায়ের মতামত বিবৃত করা বাঞ্ছনীয় নহে। নৈতিকজীবনে অভিরুচির স্থান নিরূপণ করিতে হইলে, অভিরুচির সহিত যুক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, বাসনা ও যৌক্তিকক্রিয়াকারিতাদ্বারা সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বাসনার অভিরুচি ক্রিয়াকারিতার মূল বা উৎস। যুক্তি (reason) ও অভিরুচি (will) পরস্পর পরস্পরের অধীন ইহা মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র। কার্য্যের উদ্দেশ্য না জানিলে, কোনও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার মনের ক্রিয়া বা মনোযোগ ব্যতীত কোনও বিষয় জানা যায় না। আমরা সর্ব্বোচ্চমঙ্গল না জানিয়া, তল্লাভের অভিরুচি করিতে পারি না। ক্ষণিক অন্ধ উত্তেজনা দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না। সুতরাং নৈতিকক্রিয়াকারিতা অন্ধ নহে; ইহা যৌক্তিক। নৈতিক বিচারে মনোযোগক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে। নৈতিকজীবনে যুক্তি অপেক্ষা অভিরুচি অধিক প্রভাবশালী। বাসনা (Desire) ও অভিরুচির (will) পার্থক্য প্রদর্শন জন্য, দার্শনিকগণ প্রাণীর নিজত্বের (self) সহিত তাহার ইচ্ছার অভেদকরণ অভিরুচির কার্য্য নির্দ্দেশ করেন। যে শক্তি পরস্পর বিরোধিনী স্পৃহানিচয়ের একটীকে মনোনীতা করিয়া, তাহাকে কার্য্যকরণসঙ্কল্পান্বিতা করে, তাহাই অভিরুচি। অতএব, মানবের আচরণ তাহার অভিরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মানবাচরণ তাহার অবস্থা ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে, এবাক্য যে অনেকাংশে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, অবস্থা আবার চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কারণ, এক অবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবান মানবনিচয়ে, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা সমুৎপাদন করে। স্বর্ণমুদ্রাস্থলী দর্শনে তস্করগণ প্রলুব্ধ হয়; কিন্তু সদ্ব্যক্তিগণ তাহাতে বিচলিত হন না। এ দৃষ্টান্তানুসারে, মানবাচরণ তাহার চরিত্রের উপর নির্ভর করে; অবস্থার উপর নহে। চরিত্র-বিশ্লেষণে দেখা যায়, আচরণ-পৌনঃপুন্যে চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্র আচরণ-সমষ্টি ভিন্ন

আর কিছুই নহে। সুতরাং, আচরণের কারণভূত অভিরুচি অবস্থা ও চরিত্র অপেক্ষা প্রশস্ত। মানবের নিজত্ব (self) ও অভিরুচি (will) মধ্যে ভেদ নাই। পুণ্যাচরণ অবস্থা বা চরিত্রের উপর নির্ভর করে না; ইহা মানবের নিজ নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করে। নিজ নির্দ্ধারণে অভিরুচির স্বাধীনতা সূচিত হয় অথবা মানবের নিজত্ব তাহার অবস্থার উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতে পারে। নৈতিকজীবনে, অভিরুচি অবস্থা ও চরিত্রের প্রবর্ত্তন ও নিয়ামন করে।

ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায়, সমাজের উল্লেখ না করিয়া, এ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত নৈতিকজীবনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যক্তিকে সমাজ হইতে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করা অসমীচীন; কারণ ব্যক্তি সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে, প্রচলিত মত এই যে, সমাজ যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট ভাবে কতকগুলি সুবিধা প্রদান করে, তেমনি তন্মূল্য স্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট, প্রকাশ্য ভাবে, তাহার সময় ও ক্রিয়াকারিতা দ্বারা প্রত্যুপকৃত হইবার দাবি করে। সমাজ প্রভুত্ব সহকারে এই দাবি উপস্থাপিত করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এই ন্যায্য দাবি পূরণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজগত বা সমাজের প্রত্যঙ্গীভূত হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করে। তথাপি, প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ ব্যক্তিগত জীবন আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানব স্বীয় অবস্থা ও কার্য্যের নিয়ামক। সমাজ মানবের ব্যক্তিগত জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে না কিম্বা ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করা সমাজের কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় ব্যক্তিগত জীবনে নিজ সুখের বিধাতা এবং নিজের প্রতি কর্ত্তব্যতা পালন করে। কিন্তু ইহা দ্বারা মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্পষ্টীকৃত হয় না। আদৌ, মনুষ্য সামাজিক প্রাণী। অল্প চিন্তা করিলেই দেখা যায়, সমাজ যত প্রাথমিক বা অনুন্নত হউক না কেন, সামাজিক-শৃঙ্খলাবিধান-বর্জ্জিত স্বতন্ত্র মানবের অস্তিত্ব অসম্ভব। যাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে সমাজ-গঠন-প্রণালীর সূত্রপাত হইয়াছে এবং পরনীন সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ সামাজিক জাতি হইতে মনুষ্য উদ্ভূত হয়। মানব-শিশু এরূপ অসহায় অবস্থায় এবং এরূপ অসম্পূর্ণ শরীরে জন্মগ্রহণ করে যে, কেবল তাহার শরীরের স্থিতি ও বর্দ্ধন বিষয়ে, সে সর্ব্বতোভাবে সামাজিক যত্ন, প্রীতি, কোমলতা, ভদ্রতা, অস্বার্থপরতা ও স্বার্থ-ত্যাগের পাত্র। ইহার জীবন-ধারণে যে সকল ভোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক বস্তু একান্ত

আবশ্যক, সে সমস্ত বহু লোকের সমবেত যত্ন ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব, এক ব্যক্তি বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি নিচয়কে, কোনও প্রকারে, সমাজের একক স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না। সম্প্রদায়গত দলবদ্ধ মানব সমূহ কিম্বা পরিবার, সমাজের একক গণিত হইতে পারে। সমাজ তুলনায়, ব্যক্তিগত জীবন-গণন যেমন সম্ভব, ব্যক্তিগত মন গণনও সেইরূপ সম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তি শরীর পুষ্টির জন্য যেমন সমাজের মুখাপেক্ষী, মানসিক উন্নতির জন্যও, তেমনি, সমাজের মুখাপেক্ষী। সুতরাং, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন কেবল তাহার নিজায়ত্ত নহে; সমাজেরও আয়ত্ত। অপিচ, ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল সাধারণ মঙ্গল। কারণ, তাহা সাধারণের সহিত বিভাজ্য এবং ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র নিজত্বকে যেরূপ পরিতুষ্ট করে, সমাজগত বৃহত্তর নিজত্বকেও সেইরূপ পরিতুষ্ট করে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ দ্বারা, এই সমাজগত বৃহত্তর নিজত্ব অনুভব করিতে পারেন। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজপ্রতি যে কর্ত্তব্যতা প্রদেয়, সমাজের প্রতিও, যুগপৎ, তাহা প্রদেয় এবং সামাজিক নিয়মে পরিবার, রাজ্য, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি সমাজাবয়বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির পুণ্য কর্ম্ম সার্থক হয়। মুখ্যভাবে অপরের প্রতি প্রদর্শিত আচরণে, মানবের সৎকার্য্য বিকাশপ্রাপ্ত না হইলেও, এই সমস্ত সমাজাবয়বে তাহা প্রতিফলিত হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যক্তি বিশেষের ধৈর্য্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক লক্ষ্যীকৃত না হইলেও, কোনও বৈজ্ঞানিক সমিতি বা সমাজে ঐ গুণ প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত সমাজাঙ্গ বিদ্যমান না থাকিলে, গুণ-গ্রহণাভাবে, মানবের পুণ্য কর্ম্ম অর্থশূন্য হইত। উল্লিখিতরূপে আলোচ্য বিষয়ের একদিক দৃষ্টি করা হইল। এক্ষণে অপর দিক দ্রষ্টব্য। সামাজিক ব্যক্তির নিজ সমাজের অধীন থাকা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে, সামাজিক ব্যক্তির নিজ সমাজের অনধীন থাকাও সঙ্গত হইতে পারে। এরূপ ব্যক্তি থাকিতে পারেন, যাঁহার নিজাদর্শ সামাজিক আদর্শ এবং চরম-মঙ্গল-লাভোদ্দেশ্যে স্বীয় চেষ্টা সম্পূর্ণ পরনীনা হইলেও, যিনি নিজ যুক্তিসিদ্ধান্তানুসারে, স্ব-সমাজের অনধীন। প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তির নিজোপায়ে বিচার করিবার যে অধিকার আছে, তাহার বলে, ঈদৃশ ব্যক্তি যে কোনও সমাজ-প্রচলিত-বিশ্বাস নিজ যুক্তিদ্বারা সাবধানে পরীক্ষা না করিয়া, তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হইতে পারেন। নিজ যুক্তিমীমাংসায়, তাঁহার সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের যে ধারণা আছে, তাহার সহিত কোনও সামাজিক নিয়মের ঐক্য না হইলে, তিনি তাহার অধী-

নতা অস্বীকার করিতে পারেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সর্ব্ব লোকাপেক্ষা জ্ঞানী মহাপুরুষ হইতে পারেন। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অসামান্যা চেষ্টার জন্য, হয়ত, সমাজ তাঁহাকে দারুণ অপমান ও অপকীর্ত্তিসহ জীবন্তাবস্থায় দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধন-স্তম্ভ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগার বা ক্রস্ নামক বধকাষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করিল। কিন্তু, তিনিই ন্যায়বান প্রমাণিত হন। কারণ, তিনি চক্ষুস্মান্ ও সমাজ হইতে বহুবিজ্ঞতর বলিয়া, সমাজের অদৃষ্ট অন্ধাশাভিলাষ সমস্তই দর্শন করেন এবং সমাজের প্রকৃত অভাব যাহা সমাজ স্বয়ং অনুভব করিতে পারে না, তাহা তিনি অনুভব করেন। সমাজোত্থিত ক্ষণিক প্রতিবন্ধ স্বত্বেও, তিনি সামাজিক বিবর্ত্তনে সমাজকে লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করেন। ভৌতিক দেহাবসানেও, তাঁহার মৃত্যু হয় না; কারণ, তৎসঞ্চারিতশক্তি সমাজানুপ্রবিষ্টা হইয়া, ঘোর অশান্তির উন্মোচন পূর্ব্বক, উচ্চতর সামাজিক অবস্থা প্রবর্ত্তন করে। অতএব, যে কোনও ভাবে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর করা যায়, তাহাতে ইহাই প্রমিত হয় যে, যৌক্তিক আত্ম-মীমাংসা সামাজিক মিলন বা সমাজের ভিত্তি। সম্প্রদায়-ভেদে, সমাজ বৈজ্ঞানিক নিয়মে গঠিত বা যন্ত্র স্বরূপ বিবেচিত হইলেও, সমাজ যে মানবচরিত্রের শৃঙ্খলা বিধান করে, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। মানবগণ যতকাল ব্যক্তিগত বা সাধারণ সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল লাভে আপনাদিগকে পরিচালিত করে, ততকাল সমাজভুক্ত থাকিতে পারে। সুতরাং, যৌক্তিক অভিরুচিই সামাজিক মিলনের মূল।

অতঃপর, নৈতিক অনুভূতির বিশ্লেষণ কিরূপে সমাহিত হয়, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। 'মানব জীবন নৈতিক নিয়মের অধীন' এই বোধ নৈতিক অনুভূতি। সুতরাং, এরূপ বিষয় নৈতিক অনুভূতির অন্তর্গত, যাহা সাধারণ অনুভূতির বহির্ভূত। ন্যায়ান্যায়ানুভূতি ব্যাখ্যা করাই চরিত্র-নীতি-বিজ্ঞান বা নৈতিক দর্শনের উদ্দেশ্য। নৈতিক বিচার (Moral judgment), নৈতিক ভাবাবেশ (Moral feelings) এবং নৈতিক উত্তেজনা (Moral impulse) এই ত্রিবিধোপায়ে, ন্যায়ান্যায়ানুভূতি নিষ্পন্না হয়। নৈতিকবিচার বুদ্ধিক্রিয়া-ফল। ইহা ভেদ দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করে। অন্যায় না জানিলে ন্যায় জানা যায় না; অথবা, মানবাচরণে ন্যায় ও অন্যায়ের অনুভূতি দ্বারা, যুগপৎ, উভয়ের অনুভূতি হয়। নৈতিকবিচার নীতি বা নিয়মের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে। কারণ, নীতি বা নিয়ম ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড। আবার

আমাদের বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া, ইহা নিজেই সম্পূর্ণ ও উত্তম। প্রথম প্রকারে, ইহা আমাদের মনোগত ভাবে (Subjectively) উত্তম। দ্বিতীয় প্রকারে, ইহা বস্তুগত ভাবে (Objectively) উত্তম। এইরূপ বিশ্লেষণে নৈতিকতার তিন প্রকার মানদণ্ড নির্দ্ধারিত হয়। (১) আকৃতিবিশিষ্ট মানদণ্ড বা নিয়ম ; (২) মনোগত মানদণ্ড বা সুখ ; (৩) বস্তুগত মানদণ্ড বা সাম্পূর্ণ্য। ইহাই যথাক্রমে কঠোরব্রতবাদী, উল্লাসবাদী এবং সাম্য ও সাম্পূর্ণ্য-বাদীগণের মত। এ বিষয় অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শন করিতে হইলে, এইরূপ বলা সঙ্গত :—কঠোরব্রতবাদ মতে, কর্ত্তব্যতা মঙ্গল নিরূপণ করে ; অর্থাৎ সেই কার্য্য উত্তম, যাহা কর্ত্তব্য স্বরূপ বিহিত হইয়াছে। উল্লাসবাদ মতে সুখ মঙ্গল নিরূপণ করে ; অর্থাৎ সেই কার্য্য উত্তম, যাহা সুখকর। সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদ মতে,সাম্পূর্ণ্য মঙ্গল নিরূপণ করে অর্থাৎ সেই কার্য্য উত্তম, যাহা মানবকে সাম্পূর্ণ্যে উপনীত বা সম্পূর্ণ করে। ব্যবসায়ীর পক্ষে, অপরিণতবুদ্ধি গ্রাহকের নিকট হইতে পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ না করা ন্যায্য কর্ম্ম, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কঠোরব্রতবাদীগণের মতে, ইহা ন্যায্য, কারণ, লাভ-ক্ষতির কোনও বিচার না করিয়া, অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঈদৃশী কর্ত্তব্যতায়, যদি ব্যবসায়ী গোপনে তাহার নিজের সুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া, অবশেষে কোনও কারণে উচিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যের মূল্য বিনষ্ট হয়। উচিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় যদি ব্যবসায়ী উচিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, কেবল তাহাতেই তাহার কার্য্য ন্যায্য হয়। উল্লাসবাদীগণের মতে, এই নিজ-সুবিধা-চিন্তা দ্বারাই কার্য্যের মূল্য নিরূপিত হয়। সততাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যপরিচালন-মন্ত্র। ইহার উপকারিতাই ইহার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে। সাম্য ও সাম্পূর্ণ্য-বাদীগণ কঠোরব্রতবাদীগণের ন্যায় সুবিধাসুবিধানির্ব্বিশেষে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, সুবিধাই হউক বা অসুবিধাই হউক, ব্যবসায়ীর সৎ হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত কার্য্যকর্ত্তার পক্ষে সততা সকল সময়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য-পরিচালন-মন্ত্র নহে। তথাপি, সততা-পালন বিধেয়। কারণ, সততা নৈতিকজীবনগতনীতিমালার একটী নীতি। এই সমস্ত নীতি পালনে, মানব লক্ষ্যে উপনীত বা সম্পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং এই নীতিমালার কোনও নীতি বর্জ্জনীয়া নহে।

দার্শনিকগণ, সম্প্রদায় ভেদে, উল্লিখিত রূপে নৈতিক মানদণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন

আকার নির্ণয় করেন বলিয়া, তাঁহারা নৈতিক বিচারপ্রণালী সম্বন্ধেও, ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারণ, নৈতিক মানদণ্ড দ্বারাই নৈতিক বিচার সমাহিত হয়। উল্লাসবাদীগণ বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মোৎপন্ন ফলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, কার্য্যাবলোকন করেন। বেন্থাম (Bentham) বলেন সুখই একমাত্র মঙ্গল এবং দুঃখই একমাত্র অশুভ। মিল (Mill) বলেন, কার্য্য সুখোৎপাদন করার অনুপাতে শুভ এবং দুঃখোৎপাদন করার অনুপাতে অশুভ। কার্য্যের ন্যায্যান্যায্যত্ববিচার সম্বন্ধে বেন্থামের মত :—'কার্য্যজাত সুখ ও দুঃখ উভয়েরই পরিমাণ নির্ণয় কর। যাহার পরিমাণ অধিক হইবে, কার্য্য তদনুসারে ন্যায্যা-ন্যায্য অভিধা প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সুখের পরিমাণ অধিক হইলে, কার্য্য ন্যায্য এবং দুঃখের পরিমাণ অধিক হইলে, কার্য্য অন্যায্য হইবে।' কঠোরব্রতবাদী-গণ বলেন, স্থূলভবুদ্ধি সহকারে (Intuitively) নৈতিক পার্থক্য অনুভব করা যায়। বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ সুখদুঃখবিলিপ্ততায় কার্য্য ন্যায্য বা অন্যায্য হয় না। কার্য্য, বস্তুতঃ যাহা তাহাই। যে অভিপ্রায়ে কার্য্য করা হয়, তদ্দ্বারা সেই কার্য্যের মূল্য নিরূপিত হয়। কঠোরব্রতবাদের অন্তর্ভুক্ত স্থূলভবুদ্ধিবাদে (Intuitive theory) দুই প্রকার নৈতিকবিচারপ্রণালী আছে। প্রথমতঃ, মার্টিনিউর (Martineau) মতে, যাবৎ কোনও কার্য্যোত্তেজিকা শক্তি বা কর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বিরুদ্ধা কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতিযোগিতা না হয়, তাবৎ তাহার নৈতিক মূল্য অবধারণ করা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অনুভবক্ষেত্রে, অসমঞ্জসা দুইটী কর্ম্মপ্রবৃত্তি আবির্ভূতা হইয়া, সমরে প্রবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ আমরা তাহাদের পার্থক্যানুভূতি করিতে পারি না, কিম্বা তাহাদের বিচারে অগ্রসর হইতে পারি না। কিন্তু, এরূপ অবস্থা সংঘটিত হইবা মাত্র, আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি, উভয়া-মধ্যে কোন্‌টী উচ্চতরা ও অধিক মূল্যবতী এবং আমাদের উপর অধিকার-স্থাপন-ক্ষমা। তাহাদের যুগপৎ আবির্ভাব ও বিরোধে, স্থূলভবুদ্ধিদ্বারা তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এইরূপ আলোড়নে কর্ম্ম-প্রবৃত্তিনিচয়, স্ব স্ব মূল্যানুযায়ী, আপনা হইতে পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায় এবং তাহাতে, ক্রমোচ্চমূল্যানুসারে, কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

১। গৌণা বিরক্তি বা প্রতিরোধপ্রবৃত্তিনিচয়।

২। গৌণা ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনিচয়।

৩। মুখ্যা ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনিচয়—বুভুক্ষা ইত্যাদি।

৪। মুখ্য পাশবিক প্রবৃত্তি—লক্ষ্যহীন স্বাভাবিক ক্রিয়াকারিতা ;

৫। অর্জ্জনপ্রিয়তা।

৬। গৌণ স্নেহ।

৭। মুখ্য বিরক্তি বা প্রতিরোধপ্রবৃত্তি।

৮। হেতুমান্ উদ্যম—ক্ষমতাপ্রিয়তা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ইত্যাদি ;

৯। গৌণ সংস্কার সমূহ।

১০। বিস্ময় এবং প্রশংসা বিষয়ক মুখ্য সংস্কার।

১১। বাৎসল্য এবং সামাজিকতা মূলক মুখ্য সংস্কার।

১২। দয়ামূলক মুখ্য সংস্কার।

১৩। শ্রদ্ধামূলক মুখ্য সংস্কার।

এই তালিকায় সর্ব্বনিম্নস্থ কর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বোপরিস্থ কর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাধম গৃহীত হইলে, অবশিষ্ট কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিচয় মধ্যে প্রত্যেকটী পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা উচ্চতর ও তাহার সহিত তুলনায় ন্যায্য এবং পরবর্ত্তী অপেক্ষা নিম্নতর ও তাহার সহিত তুলনায় অন্যায্য। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিগামী নৈতিক গণের (Rational moralists) মতে, বিভিন্ন বস্তুর পারম্পরিক তুলনায়, নৈতিক বিচার সমাহিত হয় না। যাহা যৌক্তিক জীবনে আদেশ স্বরূপ গৃহীত হয়, এরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত সত্যের সহিত কার্য্য বা কার্য্য-পরম্পরার তুলনায়, নৈতিক বিচার নিষ্পন্ন হয়। ইঁহারা বিশ্বাস করেন, এরূপ চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় নৈতিক নিয়ম সকল বিদ্যমান আছে, যাহা চরম, সর্ব্বত্রপ্রযোজ্য, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, স্বতঃ-প্রত্যক্ষ এবং অবিকথনীয় বা সংশয়াতীত। নির্ম্মলান্তঃকরণে, হিতাহিত-বিচার-বুদ্ধি (Conscience) দ্বারা, এই সকল পবিত্র নিয়ম উপলব্ধি করা যায়। হিতাহিতবিচারবুদ্ধির কখনও ভ্রম হয় না এবং ইহাকে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় না। দার্শনিক ক্যাণ্ট্ (Kant) বলেন, ভ্রমকারী বিবেক (erring conscience) স্বরূপ কোনও বস্তু নাই। নৈতিক বিচারে মানবের যে মতভেদ হয়, তাহা নিয়ম সম্বন্ধে নহে ; কেবল নিয়মের প্রয়োগ সম্বন্ধে। এইরূপে মধ্যপন্থী কঠোরব্রতবাদীগণ—যাঁহারা স্বাভাবিক উত্তেজিকা শক্তির কিঞ্চিৎ মূল্য থাকা স্বীকার করেন—নৈতিক বিচার নিষ্পাদন করেন। ইঁহাদের নৈতিক-বিচার-প্রণালী আলোচনায়, বিবেক-ব্যাখ্যা কল্পে, ক্যাণ্টের উক্তি সন্নিবেশিত হইলেও, ক্যাণ্ট্ মধ্যপন্থী কঠোরব্রতবাদী নহেন। তিনি একজন চরমপন্থী কঠোরব্রতবাদী

(Extreme rigorist)। নৈতিক জীবন সম্বন্ধে, তাঁহার মত আরও গুরুতর। প্রথমতঃ, কর্ত্তব্যতা-পালন স্বরূপ যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, কেবল সেই কার্য্যই ন্যায্য। দয়া বা প্রীতি হেতু রোগীর পরিচর্য্যা করা, ক্যাণ্ট্ মানসিক দুর্ব্বলতা বিবেচনা করেন। নৈতিক নিয়ম ব্যবহারিক ভাবে মানবের উপকার করা শিক্ষাদেয় এবং নৈতিক নিয়মে মানবের যে উপকার সাধন করা হয়, ক্যাণ্টের মতে, কেবল তাহাই প্রশংসাযোগ্য। ক্যাণ্ট্ অভিরুচির স্বায়ত্ত-শাসন (Autonomy) ও পরকীয় শাসন (Heteronomy) এই দুই প্রকার শাসন-প্রথা নির্ণয় করেন। যখন অভিরুচি আপনার প্রতি আপনার নিয়ম প্রবর্ত্তন করে, অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়ভূত কোনও পদার্থ লক্ষ্য না করিয়া, কেবল কর্ত্তব্যতা-বোধে কার্য্য করে, তখন অভিরুচি স্বায়ত্তশাসিত (Autonomous)। দ্বিতীয়তঃ,যাবতীয় নৈতিক নিয়ম একমাত্র-সঙ্কেত-নিবদ্ধ :—'এমন এক অবধারিত মতে কার্য্য কর, যাহা বিশ্বব্যাপী নিয়ম হইতে পারে।' সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদীগণ বলেন, কৃতকার্য্য দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার সমগ্রনিজত্ব (Entire self) যেরূপে বিকশিত বা অপলাপিত হয়, তাহা গ্রহণ না করিলে, কার্য্যের নৈতিক গুণ অবধারণ করা যায় না। কার্য্যকালে কর্ম্মকর্ত্তা যে বাসনায় চালিত হইয়া, কর্ম্ম করেন, তিনি তাহার সহিত একীভূত হইয়া যান। ইহা তাঁহার আংশিক নিজত্ব (Partial self)। তাঁহাতে তাঁহার যাহা হইতে হইবে, তাহা তাঁহার সমগ্রনিজত্ব (Entire or total self)। যদি আংশিক নিজত্বের স্বার্থে, সমগ্র নিজত্বের স্বার্থ পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে কার্য্য ন্যায্য। আর যদি ক্ষুদ্র নিজত্বের স্বার্থে বৃহৎ নিজত্বের স্বার্থ অপচিত হয়, তাহা হইলে কার্য্য অন্যায্য।

নৈতিক দার্শনিকগণ হিতাহিত-বিচার-বুদ্ধি বা বিবেকের (Conscience) স্বরূপ সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উল্লাসবাদীগণের মতে বিবেক (Conscience) ও বিষয়বুদ্ধি (Prudence) মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। নীতিবোধশক্তি (the moral faculty) গণনাকারিণী। ইহার অন্যায় হইতে ন্যায় পৃথক্ করিবার কোন আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক ক্ষমতা বা গুণ নাই। কিন্তু আমাদের কার্য্যফল-সমষ্টি-জাতা বহুদর্শিতা দ্বারা ইহা গণনা আরম্ভ করে। কার্য্যনিচয়ের সুখ বা দুঃখদায়ক ভাব বিবেচনায়, আনুমানিক নিয়ম-ভিত্তির উপর এই গণন-কার্য্য সমাহিত হয়। স্থূলভবোধপন্থী দার্শনিকগণ (Intuitional thinkers) মধ্যে, দুই সম্প্রদায় বিবেকের দুই প্রকার আকার নির্দ্দেশ করেন। এক সম্প্রদায়ের মতে, ইহা নৈতিক বোধ। হিতাহিত অনু-

ভূতি করে বলিয়া, ইহা অনুভূতি সদৃশ। অন্য সম্প্রদায়ের মতে, বিবেক নৈতিক যুক্তি। যুক্তিগামী নৈতিক গণের মতে, বিবেক নৈতিক-নিয়ম-বোধিকা শক্তি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ক্যাণ্ট্ হিতাহিতবুদ্ধি বা বিবেকের এইরূপ সংজ্ঞা নির্ণয় করেন: 'যে কার্য্যকরী যুক্তি, প্রত্যেক নৈতিক নিয়মে, মানব সমক্ষে তাহার কর্ত্তব্যতা উপস্থাপিত করিয়া, মানবকে দোষী বা নির্দ্দোষী অবধারিত করায়, তাহা বিবেক।' সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদীগণের মতে, যাহা ব্যক্তিগত মনুষ্যকে সাম্পূর্ণ্য-পথে চালিত করে, সেই সকল নৈতিক নিয়মের দৃঢ় ধারণা বিবেক।

উক্তরূপ মতভেদে, নৈতিক সংস্কার (Moral sentiment) সম্বন্ধেও যে দার্শনিকগণের মতের অনৈক্য হইবে, তাহা সহজেই অনুভবযোগ্য। চরম-পন্থী কঠোরব্রতবাদী ক্যাণ্ট্ নৈতিক সংস্কারের এইরূপ অভিধা প্রদান করিয়াছেন: 'কেবল কর্ত্তব্যতা-নিয়মের সহিত আমাদের কার্য্যের মিলনামিলনানুভূতিজাত সুখ বা দুঃখের ধারণা নৈতিক ভাবাবেশ বা সংস্কার।' উল্লাস-বাদীগণের মতে, সমাজ প্রত্যেক মানবের প্রতি যে প্রভুত্ব-শক্তি পরিচালনা করে, তাহাল ফল নৈতিক সংস্কার।

মানবগণ ক্রিয়াকর্ত্তাস্বরূপ নৈতিক নিয়মের সহিত যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, কর্ত্তব্যতা (Duty) বা দায়িত্ব (Obligation) দ্বারা তাহা সূচিত হয়। বিশদভাবে বলিতে হইলে, এই সম্পর্কানুভূতি ও নিয়মানুগমনপ্রবৃত্তিমূলক সংস্কার দ্বারা কর্ত্তব্যতা-বোধ গঠিত হয়। সুতরাং, এই সম্পর্ক আবশ্যকতা-ভাবাপ্লুত। ইহা যৌক্তিক বা সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ক্যাণ্টের মতে, নিয়মসম্মাননাহেতু নিয়মানুবর্ত্তনের আবশ্যকতাই কর্ত্তব্যতা। উল্লাস-বাদী স্পেন্সার (Spencer) বলেন, উদ্দেশ্য বা সুখলাভকল্পে, উপায়াবল-ম্বনানিবার্য্যতা কর্ত্তব্যতা। সুলভবোধপন্থী বা যুক্তিগামী দার্শনিকগণ নৈতিক নিয়মকে চরম নিশ্চিতাদেশ স্বরূপ বোধ করিয়া, ইহাকে বাসনার অনধীন বিবেচনা করেন। নিয়মপালনে অনিচ্ছা হইতে পারে, তথাপি আমাদের অভিরুচির উপর নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব থাকা অনুভূত হয়। কারণ, কোনও বিষয় সর্ব্বদা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিপাল্য এরূপ অনুভূতি না হইলে, ন্যায়ের বোধ জন্মে না। নৈতিকনিয়মের শাসনবল বা প্রভুত্বে কোনও বশীকরণোপাদান নাই। ইহা সকলকে আদেশ করে; কিন্তু কাহাকেও বাধ্য করে না। পক্ষান্তরে, উল্লাসবাদীগণ নৈতিক নিয়মকে আনুমানিক আদেশ স্বরূপ বিবেচনা

করেন। ইঁহাদের মতে, ন্যায়ের নিজের কোনও মূল্য নাই। ন্যায় সুখ-লাভের উপায় মাত্র। এজন্য, নিয়ম পালনে সুখলাভ হইতে পারে বলিয়া, নিয়মের প্রভুত্ব অনুমান করা হয়। কোনও কোনও উল্লাসবাদী কর্ত্তব্যতাকে অর্থহীন শব্দ স্বরূপ গণ্য করেন। বেন্থাম (Bentham) বলেন, কর্ত্তব্যতার গল্প করা বৃথা। যাহা হউক, উল্লাসবাদীগণ কতিপয় 'নৈতিক অনুমোদন' (Sanctions of Morality) হইতে কর্ত্তব্যতার অর্থগ্রহ করেন। কারণ, নৈতিকতার এই সকল অনুমোদন মানবকে সদাচরণে প্রবর্ত্তিত করায়। নৈতিক অনুমোদন পাঁচটী : (ক) শারীরিক অনুমোদন (Physical sanction)। সুখ, দুঃখ, স্বাস্থ্য, ব্যাধি প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারে, মানব শরীর-সম্বন্ধীয় নৈতিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়। (খ) রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনুমোদন (the legal sanction) অর্থাৎ রাষ্ট্র-নিয়ম-ব্যতিক্রমে রাষ্ট্র-শাসন-পদ্ধতি কর্ত্তৃক যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে। (গ) সামাজিক বা লৌকিক অনুমোদন (The social or popular sanction) অর্থাৎ সাধারণের মত হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির যে সুখ বা দুঃখ সম্ভূত হয়। (ঘ) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুমোদন (The religious sanction) অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা বা পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ধর্ম্মমন্দির (church) দ্বারা ধর্ম্মক্রিয়ার যে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ ও দুঃখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (ঙ) আভ্যন্তরিক বা নৈতিক অনুমোদন (The internal or moral sanction) অর্থাৎ সুকার্য্যে আত্মসন্তোষজনিত সুখ এবং মন্দকার্য্যে অনুতাপজনিত বেদন।

নৈতিকনিয়মপ্রভুত্বের ভিত্তি সম্বন্ধে উল্লাসবাদীগণের মত পূর্ব্বানুচ্ছেদ হইতে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। সুলভবোধপন্থী ও যুক্তিগামী দার্শনিকগণ উল্লাসবাদীগণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, নৈতিক নিয়ম চরম এবং নিশ্চিত আদেশ। ইহা অবর্জ্জনীয়, অব্যতিক্রমনীয় এবং অবশ্য প্রতিপাল্য। নৈতিক নিয়মরা[illegible] কর্ত্তৃক গঠিত হইয়া, মনুষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিয়া, যিনি সর্ব্বোচ্চ, পবিত্রতম এবং সম্পূর্ণ, এ সমস্ত তাঁহার আদেশ, ইহা ধারণা করিতে হইবে। বিবেকবাক্যই ঈশ্বরবাণী।

অধিকার (Right) সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে উহার এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় : যাহা একব্যক্তি [স্বযোগ্যতায়] অপরের নিকট হইতে আদায় করিবার দাবি করিতে পারে, তাহা অধিকার (By right is meant 'that which one has a claim to exact from another')।

ভূতি করে বলিয়া, ইহা অনুভূতি সদৃশ। অন্য সম্প্রদায়ের মতে, বিবেক নৈতিক যুক্তি। যুক্তিগামী নৈতিক গণের মতে, বিবেক নৈতিক-নিয়ম-বোধিকা শক্তি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ক্যাণ্ট্ হিতাহিতবুদ্ধি বা বিবেকের এইরূপ সংজ্ঞা নির্ণয় করেন: 'যে কার্য্যকরী যুক্তি, প্রত্যেক নৈতিক নিয়মে, মানব সমক্ষে তাহার কর্ত্তব্যতা উপস্থাপিত করিয়া, মানবকে দোষী বা নির্দ্দোষী অবধারিত করায়, তাহা বিবেক।' সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদীগণের মতে, যাহা ব্যক্তিগত মনুষ্যকে সাম্পূর্ণ্য-পথে চালিত করে, সেই সকল নৈতিক নিয়মের দৃঢ় ধারণা বিবেক।

উক্তরূপ মতভেদে, নৈতিক সংস্কার (Moral sentiment) সম্বন্ধেও যে দার্শনিকগণের মতের অনৈক্য হইবে, তাহা সহজেই অনুভবযোগ্য। চরম-পন্থী কঠোরব্রতবাদী ক্যাণ্ট্ নৈতিক সংস্কারের এইরূপ অভিধা প্রদান করিয়াছেন: 'কেবল কর্ত্তব্যতা-নিয়মের সহিত আমাদের কার্য্যের মিলনামিলনানুভূতিজাত সুখ বা দুঃখের ধারণা নৈতিক ভাবাবেশ বা সংস্কার।' উল্লাসবাদীগণের মতে, সমাজ প্রত্যেক মানবের প্রতি যে প্রভুত্ব-শক্তি পরিচালনা করে, তাহার ফল নৈতিক সংস্কার।

মানবগণ ক্রিয়াকর্ত্তাস্বরূপ নৈতিক নিয়মের সহিত যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, কর্ত্তব্যতা (Duty) বা দায়িত্ব (Obligation) দ্বারা তাহা সূচিত হয়। বিশদভাবে বলিতে হইলে, এই সম্পর্কানুভূতি ও নিয়মানুগমনপ্রবৃত্তিমূলক সংস্কার দ্বারা কর্ত্তব্যতা-বোধ গঠিত হয়। সুতরাং, এই সম্পর্ক আবশ্যকতা-ভাবাপ্লুত। ইহা যৌক্তিক বা সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ক্যাণ্টের মতে, নিয়মসম্মাননাহেতু নিয়মানুবর্ত্তনের আবশ্যকতাই কর্ত্তব্যতা। উল্লাসবাদী স্পেন্সার (Spencer) বলেন, উদ্দেশ্য বা সুখলাভকল্পে, উপায়াবলম্বনানিবার্য্যতা কর্ত্তব্যতা। স্থূলভবোধপন্থী বা যুক্তিগামী দার্শনিকগণ নৈতিক নিয়মকে চরম নিশ্চিতাদেশ স্বরূপ বোধ করিয়া, ইহাকে বাসনার অনধীন বিবেচনা করেন। নিয়মপালনে অনিচ্ছা হইতে পারে, তথাপি আমাদের অভিরুচির উপর নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব থাকা অনুভূত হয়। কারণ, কোনও বিষয় সর্ব্বদা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিপাল্য এরূপ অনুভূতি না হইলে, ন্যায়ের বোধ জন্মে না। নৈতিকনিয়মের শাসনবল বা প্রভুত্বে কোনও বশীকরণোপাদান নাই। ইহা সকলকে আদেশ করে; কিন্তু কাহাকেও বাধ্য করে না। পক্ষান্তরে, উল্লাসবাদীগণ নৈতিক নিয়মকে আনুমানিক আদেশ স্বরূপ বিবেচনা

করেন। ইঁহাদের মতে, ন্যায়ের নিজের কোনও মূল্য নাই। ন্যায় সুখ-লাভের উপায় মাত্র। এজন্য, নিয়ম পালনে সুখলাভ হইতে পারে বলিয়া, নিয়মের প্রভুত্ব অনুমান করা হয়। কোনও কোনও উল্লাসবাদী কর্ত্তব্যতাকে অর্থহীন শব্দ স্বরূপ গণ্য করেন। বেন্থাম (Bentham) বলেন, কর্ত্তব্যতার গল্প করা বৃথা। যাহা হউক, উল্লাসবাদীগণ কতিপয় 'নৈতিক অনুমোদন' (Sanctions of Morality) হইতে কর্ত্তব্যতার অর্থগ্রহ করেন। কারণ, নৈতিকতার এই সকল অনুমোদন মানবকে সদাচরণে প্রবর্ত্তিত করায়। নৈতিক অনুমোদন পাঁচটী : (ক) শারীরিক অনুমোদন (Physical sanction)। সুখ, দুঃখ, স্বাস্থ্য, ব্যাধি প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারে, মানব শরীর-সম্বন্ধীয় নৈতিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়। (খ) রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনুমোদন (the legal sanction) অর্থাৎ রাষ্ট্র-নিয়ম-ব্যতিক্রমে রাষ্ট্র-শাসন-পদ্ধতি কর্ত্তৃক যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে। (গ) সামাজিক বা লৌকিক অনুমোদন (The social or popular sanction) অর্থাৎ সাধারণের মত হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির যে সুখ বা দুঃখ সম্ভূত হয়। (ঘ) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুমোদন (The religious sanction) অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা বা পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ধর্ম্মমন্দির (church) দ্বারা ধর্ম্মক্রিয়ায় যে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ ও দুঃখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (ঙ) আভ্যন্তরিক বা নৈতিক অনুমোদন (The internal or moral sanction) অর্থাৎ সুকার্য্যে আত্মসন্তোষজনিত সুখ এবং মন্দকার্য্যে অনুতাপজনিত বেদন।

নৈতিকনিয়মপ্রভুত্বের ভিত্তি সম্বন্ধে উল্লাসবাদীগণের মত পূর্ব্বানুচ্ছেদ হইতে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। সুলভবোধপন্থী ও যুক্তিগামী দার্শনিকগণ উল্লাসবাদীগণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, নৈতিক নিয়ম চরম এবং নিশ্চিত আদেশ। ইহা অবর্জ্জনীয়, অব্যতিক্রমনীয় এবং অবশ্য প্রতিপাল্য। নৈতিক নিয়মরাজী মনুষ্য কর্ত্তৃক গঠিত হইয়া, মনুষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিয়া, যিনি সর্ব্বোচ্চ, পবিত্রতম এবং সম্পূর্ণ, এ সমস্ত তাঁহার আদেশ, ইহা ধারণা করিতে হইবে। বিবেকবাক্যই ঈশ্বরবাণী।

অধিকার (Right) সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে উহার এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় : যাহা একব্যক্তি [স্বযোগ্যতায়] অপরের নিকট হইতে আদায় করিবার দাবি করিতে পারে, তাহা অধিকার (By right is meant 'that which one has a claim to exact from another')।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যেখানে অধিকারেরর বিদ্যমানতা আছে, সেখানে কর্ত্তব্যতারও বিদ্যমানতা আছে। যদি ক'কে কিছু দেওয়া খ'র কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ক'র উহা খ'র নিকট প্রভুত্ব সহযোগে দাবি করিবার অধিকার আছে। এই উদাহরণে অধিকার কর্ত্তব্যতার অন্তর্নিহিত। আবার কর্ত্তব্যতা অধিকারের অন্তর্ভুক্তা হইতে পারে। খ'র যাহা ক'কে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে ক'র যে কেবল অধিকার আছে, তাহা নহে; পরন্ত সাধারণমঙ্গল জন্য ইহ ব্যবহার করা ক'র কর্ত্তব্য। আরিষ্টটল্ (Aristotle) পুণ্যের (virtue) যে সংজ্ঞা প্রদান করেন, তাহাই সর্ব্বোত্তম। অভিরুচির সহ মিলনে, বাস্তব জীবনে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এরূপ আদর্শ ভিত্তির উপর মনের যে চির্স্থায়ী অবস্থা গঠিত হয়, তাহাই পুণ্য। সদ্ব্যক্তি নৈতিক অনুভূতি দ্বারা যুক্তির আবেদন নির্ণয় করিয়া, এই আদর্শ নির্দ্ধারিত করেন। অতএব পুণ্য অভ্যাসজাত এবং ইহা অর্জ্জিত হয়। ঐহিক জীবনে পুণ্যলাভ করা যায়; সুতরাং ইহা স্বপ্নবৎ নহে। পুণ্য যৌক্তিক; কারণ, ইহা যুক্তিনির্দ্ধারিত আদর্শ ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। অনেক প্রকারে পুণ্যের অনুষ্ঠান হয়, যাহা সদ্ব্যক্তির যুক্তির উপর নির্ভর করে। যোগ্যতা (merit) প্রশংসাভাজন হওয়ার গুণ বা ক্ষমতা। যে বিয়োগাত্মক গুণ বা দোষে নিন্দাভাজন হইতে হয়, তাহা অপরাধ (Demerit)। যে কোনও আকারে প্রশংসা ও নিন্দা প্রদান করিতে হয়, তাহা, যথাক্রমে, যোগ্যতা ও অপরাধের প্রকৃত অনুপাতে প্রদান করা বিধেয়। দুষ্কৃতহেতু দণ্ডগ্রহণ-প্রবণতা দায়িত্ব। দায়িত্বের দুইটী উপাদান আছে: (১) স্বেচ্ছাকৃত দুষ্কার্য্য এবং (২) দুষ্কর্ম্মের জন্য শাস্তিদান করিবার অধিকারবিশিষ্ট উচ্চতর ব্যক্তির সত্তা।

মঙ্গল এবং কর্ত্তব্যতার বিষয় আলোচনায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: আমরা কর্ত্তব্যতার অতিক্রম করিতে পারি কি না? এরূপ কোনও যোগ্যতা-প্রসূত (meritorious) কার্য্য সম্ভাবিত কি না, যাহা কর্ত্তব্য স্বরূপ বিহিত নয়? মঙ্গল এবং কর্ত্তব্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীত হয়, সমস্ত যৌক্তিক দার্শনিকগণের মতে বন্ধন (obligation) অনতিক্রমনীয়। কোনও দ্রব্য বন্ধনজনক (obligatory) বলিয়া, উত্তম নহে; উত্তম বলিয়া, দ্রব্য বন্ধনজনক হয়। যদি বন্ধন-জনক বলিয়া, দ্রব্য উত্তম হইত, তাহা হইলে মঙ্গলের অধিকারসীমা, কর্ত্তব্যতার অধিকারসীমা অপেক্ষা বহুবিস্তৃততর হইত এবং আমরা কর্ত্তব্যতার

সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াও, উত্তম হইতে পারিতাম। কিন্তু, প্রকৃত ব্যাপারে তাহা হয় না। তথাপি, মনে যে মঙ্গল এবং কর্ত্তব্যতার অনুভূতি পৃথকরূপে করা যায়, ইঁহারা তাহা স্বীকার করেন। অবন্ধনজনক উত্তম বস্তুর কল্পনা সম্ভাবিতা হইলেও, তাহা বাহ্যজগতে প্রতিফলিতা হয় না। উল্লাসবাদীদিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্পেন্‌সার (Spencer) বিবেচনা করেন, জাতীয় নৈতিক শিক্ষাসমাধানে, বন্ধনের (obligation) লাঘব হইবে।

কর্ত্তব্যতা এবং পুণ্য ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক পুণ্য কর্ষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং, যতগুলি পুণ্য আছে, ততগুলি কর্ত্তব্যতাও আছে। তথাপি, কর্ত্তব্যতা ও পুণ্য পরস্পর পরস্পরের অনধীন এবং কর্ত্তব্যতা বা পুণ্যের শ্রেণী-বিভাগে ইহাই প্রথমে প্রণিধান-যোগ্য। এই শ্রেণী-বিভাগে দ্বিতীয়তঃ অবহিতব্য বিষয় এই যে, কর্ত্তব্যতা কিম্বা পুণ্যের পর্য্যাপ্ত পর্য্যায়-প্রদান অসম্ভব। কারণ, মানবপ্রকৃতি ঈদৃশী জটিলা যে, ইহা সম্যক্ বিশ্লেষণের অতীত। স্থূলতঃ, তিন প্রকারের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করা যায় :—(ক) ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যতা ; (খ) নিজের প্রতি কর্ত্তব্যতা ; (গ) সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যতা। প্লেটোক্ত পুণ্যবিভাগ, সাংস্কৃক পরিবর্ত্তন ও শাখাবর্দ্ধন সহ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উহা এইরূপ :— (ক) মিতাচার বা সংযম (Temperance) ; (খ) সাহস বা ওজস্বিতা (courage) ; (গ) জ্ঞান (wisdom) ; (ঘ) ন্যায়-পরতা (justice) ; (ঙ) জনহিতৈষণা বা পরোপকারিতা (Benevolence)। প্লেটোর মৌলিক পুণ্যবিভাগে পরোপকারিতা নাই ; উহা পরে যুক্ত হইয়াছে।

অপরাবিদ্যারঙ্গমঞ্চে গ্রীক দার্শনিকমণ্ডলী যৎকালে অভিনয় করিয়াছিলেন, আধুনিক দার্শনিকগণ সেই সময়কেই কলিদর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাবকাল বিবেচনা করেন। গ্রীকদার্শনিকগণ যে ভারতীয়-দার্শনিকগণের নিকট অভিনয়-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা আদৌ লক্ষ্য করেন না। যাহা হউক, গ্রীকদার্শনিক-গণের সময় হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া, আধুনিক দার্শনিকগণ কলিদর্শনবিদ্যার পুরাতন ও নূতন যুগভেদ করেন। ইঁহাদের মতে, পুরাতন যুগে, মঙ্গল চরিত্রনীতিবিজ্ঞান বা নৈতিক দর্শনের মূল সূত্র ছিল। এক্ষণে, নূতন যুগে, নিয়ম ইহার মূল সূত্র। ঈশ্বরের অলিখিত ভ্রান্তিরহিত নিয়ম গ্রীকদার্শনিকগণের নৈতিক-চিন্তা-বহির্ভূত ছিলনা, সত্য। কিন্তু, দার্শনিক জেনোর (Zeno) মতাবলম্বী ষ্টোইক্‌গণ (Stoics) ব্যতীত, অপর সকলেই, সর্ব্বোচ্চমঙ্গল-লাভে

আত্মার চরমোন্নতি সমাধানের আশা করিতেন। এমন কি, কেহ কেহ, ঐহিক জীবনেও ইহা সম্ভাবিত মনে করিতেন। . নিয়ম এই সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল লাভের উপায় স্বরূপ পরিগণিত ও প্রদর্শিত হইত। এক পক্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব এবং অন্য পক্ষে রোমীয় রাজবিধি-বিজ্ঞানের (Roman jurisprudence) পুনরুদ্দীপিত অধ্যয়ন দ্বারা, নিয়ম নবযুগে চরিত্রনীতিবিজ্ঞানের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পাপ ও ঐশ্বরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের গভীরানুভূতি জাগরিতা করিয়া, আজ্ঞাপালনধারণা পরিপুষ্টা করিয়াছে। যাহা দ্বারা মানবের অধিকার এবং কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে মানবের ধারণা, রোমের রাজবিধিপাঠে বলবতী হইয়াছে।

উল্লিখিতরূপে, অতি সংক্ষেপে, চরিত্রনীতিবিজ্ঞান বা নৈতিকদর্শনশাস্ত্র (Ethics or Moral Philosophy) আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইল। তথাপি ইহা হইতে এই জটিল শাস্ত্রের মূল বিষয় উপলব্ধ হইবে। কারণ, পরস্পর বিরোধী মতখণ্ডন জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের ঘোর বিতণ্ডাজাল বর্জ্জন করিলে, শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের ইহাই অবশিষ্ট থাকে। এই চরিত্রনীতিবিজ্ঞানই, অপরা-বিদ্যাগত কলিযুগচলিত দর্শনশাস্ত্র। ইহা কোনও দেশ বা জাতিবিশেষের দর্শনশাস্ত্র, এরূপ বলা অনুচিত। কারণ, ইহা সর্ব্বদেশে অধীত এবং সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব অনুভূত হইতেছে। প্রথমে, পৃথিবীর যে দেশেই উদ্ভূত হউক না কেন, উপরোক্তরূপে, ইহা এক্ষণে ধরাপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছে। ইহার এখন যৌবন কাল। বাল্যে এবং কৈশোরে, হয়ত, ইহার রূপে কিঞ্চিৎ লাবণ্য ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, নিয়ম-গঠন-চিন্তায়, ক্রমশঃ ইহা বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। অপরাবিদ্যাপ্রভাবে মানবমনের জড়ানুরক্তি এবং নৈতিকনিয়মপ্রবর্ত্তনকল্পে ঈশ্বরপ্রভুত্বের শরণগ্রহণরূপ দার্শনিকগণের কৌশল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, অভিনিবেশ সহকারে নৈতিকদর্শনপাঠে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণী-কৃত হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রভাবে, নৈতিক নিয়মের প্রতি মানবমন আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তাহা হওয়াও সঙ্গত। কিন্তু, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধি বা যুক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া, আপনাদের জন্য নৈতিকনিয়ম গঠন করিতে, মানবগণকে উপদেশ দেন নাই। কারণ, বিস্মৃতি-কবলিতা মানববুদ্ধি বা যুক্তি ভ্রমবিযুক্তা হইতে পারে না। নিসর্গনিহিত পরমপবিত্র ঐশ্বরিক নিয়মের অনুসন্ধান ও প্রতিপালন করিতে, শ্রীমৈত্রেয়বুদ্ধ মনুষ্যগণকে আদেশ করিয়াছেন। আবার রোমীয় রাজবিধিবিজ্ঞানানুকরণে, মানবচরিত্রশাসন জন্য, সর্ব্বত্রপ্রযোজ্য

(universal) নৈতিক নিয়মাবলী গঠন করাও সঙ্গত নহে। রাজা ঈশ্বর-প্রেরিত, সুতরাং রাজবিধি ঈশ্বরানুমোদিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজবিধি মানবের স্থূল বাহ্যক্রিয়ানিয়ামন জন্য প্রণীত হয়; মনুষ্যের সূক্ষ্ম ক্রিয়ার সহিত উহার কোনও সংশ্রব নাই এবং উহা মানবচরিত্রের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতে পারে না। পুনশ্চ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির রাজবিধি প্রচলিত আছে। ভেদবৈষম্যে মানবশিক্ষাপ্রদান জন্য, ইহা সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত এবং এজন্যই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক দেশের রাজবিধি সর্ব্বদেশে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তদুপরি, বিস্মৃতির গাঢ় আবরণে, কলিযুগে রাজবিধি সর্ব্বত্র কুটীকা ও কদর্থসমন্বিত হইয়াছে। অতএব, সর্ব্বত্রপ্রযোজ্য নৈতিকনিয়মগঠন জন্য, রোমীয় রাজবিধিবিজ্ঞান আশ্রয় করিয়া, তাহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করা অসমীচীন। ফলতঃ, বিস্মৃতি প্রভাবে কলিমানব, বিনাসাধনে, রাজক্ষমতা ও ঐশ্বরিকক্ষমতা উভয়ই আত্মসাৎ-করণ-প্রয়াসী। রাজক্ষমতা স্থূল বলিয়া, উহা কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু, উপযুক্ত সাধনা ব্যতীত, সহস্র বৃথা চেষ্টায়ও, ঐশ্বরিক ক্ষমতা আয়ত্তীকৃতা হয় না।

জীব যাঁহার, তিনিই তাহাদের শিক্ষাবিধান করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি জীবচরিত্রের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে। চিরজীবন পুঞ্জীকৃত কৃত্রিম নৈতিক নিয়ম আলোড়ন করিয়া, মানব যে শিক্ষা লাভ করিতে না পারে, হয় ত শুভ-মুহূর্ত্তে কোনও শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বা সামাজিক ব্যাপারে মনুষ্য-বিশেষের সে শিক্ষা সমাহিত হয়। সাধারণে এরূপ ব্যাপার অতিতুচ্ছ বিবেচনা করিতে পারে; কিন্তু যিনি শিক্ষালাভ করেন, তিনিই জানিতে পারেন, ইহার নৈতিক মূল্য কত। ঈশ্বর কি স্বয়ং মানবচরিত্র-নিয়ামনের কোনও ব্যবস্থা না করিয়া, মানবগণ ভ্রান্তযুক্তিবলে কার্য্যোদাহরণস্থাপন বা নৈতিকনিয়ম-গঠনে তাহা সম্পাদন করিবে বলিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? যাঁহার স্বকার্য্য ভ্রান্তিরহিত ও সম্পূর্ণ শুদ্ধ, তিনি কি সংসারে একমাত্র ভ্রান্তি দ্বারা সমস্ত কার্য্য পরিচালিত করাইতেছেন? বিমলযুক্তির নিকট এ সমস্ত বিষয় আদৌ সঙ্গত বোধ হয় না। জ্ঞানপন্থীগণ, সতত ঈদৃশী শুচিন্তালহরী হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুলকানুভব করেন। বিস্মৃতিবশে, এবম্বিধচিন্তারাজী যাঁহাদের অন্তঃকরণে জাগরূক না হয়, অথচ যাঁহারা কার্য্যোদাহরণস্থাপন বা নৈতিকনিয়মগঠন দ্বারা মানবগণকে সুবুদ্ধিশিক্ষাপ্রদানে লালসাপোষণ করেন, স্ব স্ব ভ্রান্তযুক্তি বা প্রতিপত্তিবান ব্যক্তির মতের আরাধনা না করিয়া, তাঁহাদের ঈশ্বরের নিকট

একান্ত মনে লোকশিক্ষাদানক্ষমতা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, মঙ্গলময় কামনাশীল মানবগণের সাংসারিক সুপ্রার্থনা পরিপূরণ করেন। এইরূপে সাধন দ্বারা স্বয়ং সুবুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করা, শিক্ষকপদবাচ্য ব্যক্তির বিধেয়। এইরূপ সাধনাবলে যে সুবুদ্ধি অর্জ্জিতা হন, তাঁহার যুক্তি ঈশ্বরাদেশ সদৃশ। কার্য্যোদাহরণস্থাপন বা নৈতিক নিয়মগঠন কিম্বা অন্য কোন্ উপায়ে মানবগণকে শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহা সুবুদ্ধি শিক্ষাদাতাকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন। সুবুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য্য ঈশ্বরসংশোধনাধীন হইলেও মানবগণনায় উহা শুদ্ধ। মানবগণ কোনও ক্রমে তাহাতে ভ্রমপ্রদর্শন করিতে পারে না এবং তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ, এইরূপে সিদ্ধ হওয়া ব্যতীত, কেহ মানবশিক্ষাদান করিতে পারেন না। অপরাবিদ্যায়, অধিকাংশ কলিদার্শনিক ইহার বিপরীত উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব অপরিক্কতা বুদ্ধির ভ্রান্তযুক্তি অনুযায়ী, উদাহরণ স্থাপনোদ্দেশ্যে কার্য্য এবং মানবচরিত্রনিয়ামনকল্পে নৈতিক নিয়মাদি গঠন করিয়া, মানবগণকে তৎসমস্ত ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ অনুসরণ করিতে বলেন। ঈশ্বরাদেশ এরূপ সামান্য বস্তু নয় বা এরূপ সহজ উপায়ে তাহা লাভ করা যায় না। ভগবানের আদেশ-প্রতীক্ষায় সাধনা করিয়া, যাঁহারা ভাগ্যবলে উহা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, উহা কি মহৎ ও মূল্যবান বস্তু। মানবশিক্ষাদানক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া, যাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কেহ কেহ আবার সুবুদ্ধির আলোকে উচ্চতরমার্গগামী হইবার আশা পোষণ করেন। তখন তাঁহারা মানবশিক্ষাদানক্ষমতাকেও তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, পরমপিতার নিকট সাগ্রহে পরাবিদ্যা ও পরমজ্ঞান যাচ্ঞা করেন।

যাহা বিপরীত উপায় উক্ত হইল, তাহাদ্বারাই কলিদার্শনিকগণ বুদ্ধিচর্চ্চা-যোগে ভাবগ্রাহী ভগবানের নিকট লোকশিক্ষাদানক্ষমতা প্রার্থনা করেন বা যুক্তির আরাধনায় তাঁহাদের সাধনসমাধান হয়, এরূপ বলিবার হেতু নাই। প্রকৃত ঘটনা যে তাহা নয়, ইহা তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্যফল হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্ক ও বিদ্যাবত্তা দ্বারা স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। সাধনার অবস্থা এরূপ নহে। ইহা বাস্তব সাধনা হইলে, দার্শনিকগণের মতবিরোধ বা মতবিকথন সংঘটিত হইত না। সাধনালব্ধ ঈশ্বরাদেশ মানবসমালোচনার অতীত। কলিদার্শনিকগণ মধ্যে, কেহ যুক্তি বা তর্ক দ্বারা কোনও মত প্রচার করিবামাত্র, অপরকেহ তৎক্ষণাৎ

বিরুদ্ধ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা, তুল্যবাহুবলশালী বিপরীত মতের প্রবর্ত্তন করেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও, ক্রমশঃ, ইঁহাদের পন্থানুসরণ করিয়া, অপরাবিদ্যাবলে নানাবিধ অসমঞ্জস দার্শনিক মতের আবিষ্কার করেন। পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়বর্গ, যত আপনাপন মত উত্তম ও অপরাপর মত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া, স্ব স্ব মতের মূল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, ততই প্রত্যেক মতের অসারতা প্রতিপাদিতা হয়।

পরাবিদ্যাধিকারকালে, জ্ঞানীগণ মধুর সংক্ষিপ্ত ভাষায় পরমতত্ত্বরাজি সাধারণে প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষাবলে, সাধারণ মানবগণ এই সকল সারগর্ভ রচনার প্রত্যেক শব্দে জগৎব্যাপী অর্থানুভব করিতে পারিতেন। ঋষিপ্রোক্ত বচনাবলীর যে সকল ভগ্নকণা কলিযুগে বিক্ষিপ্তা হইয়া, অবকর-মিশ্রিতা হইয়াছে, তৎসমস্তও এরূপ গভীরভাবসম্পন্না যে, বহু বিস্তারিত বর্ণন ভিন্ন এক একটী শব্দের অর্থপরিচয় নিষ্পন্ন হয় না। উপনিষদ্‌গত চারি শব্দযুক্ত একটী সূত্র কলিমানবের বোধগম্য করিবার জন্য, আচার্য্যচূড়ামণি শঙ্কর, বৃহৎ পৃষ্ঠাচতুষ্টয়ে উহার ভাষ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গাঢ়বিস্মৃতিগ্রস্ত মানবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকরণ জন্য অপরাবিদ্যানুমত বিষয়ব্যাপ্তি বর্জ্জন করিলেও, কলিদর্শন-শাস্ত্র অতিশয় ব্যাপ্ত এবং মানবচরিত্রনিয়ামকশাস্ত্রের ঈদৃশ অসংলগ্না বিস্তার অধিকতর বিসদৃশ প্রতিভাত হয়। দার্শনিক সম্প্রদায়বর্গের মতানৈক্য এ বিস্তৃতির মূল কারণ। বৃহৎ বৃহৎ কলিদর্শনগ্রন্থ মন্থন করিয়া, অত্যল্প সার বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা অবতারোপদেশ বা জ্ঞানীবাক্যরত্নের বিকীর্ণ ছটাজাল সদৃশ। কলিদার্শনিকগণ প্রকাণ্ড পুস্তকনিচয় বিরচন করিয়া, যে মঙ্গল, ন্যায়, নিয়ম, কর্ম্মপ্রবৃত্তিরগতি, কর্ত্তব্যতা, অধিকার, পুণ্য, যোগ্যতা, দায়িত্ব, সংযম, ওজস্বিতা, জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও পরোপকারিতা শিক্ষা প্রদান করিবার প্রয়াস করেন, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট, শ্রীমোহম্মদ প্রভৃতি অবতারগণের একটীমাত্র উপদেশ-বাণী হইতে, মানবগণ তৎসমস্ত ও ততোধিক, উৎকৃষ্টতররূপে শিক্ষা করিতে পারে। তথাপি, এই সমস্ত গুরুতত্ত্বান্তঃসত্ব বলিয়া বহু দোষ স্বত্বেও চরিত্রনীতি-বিজ্ঞান বা নৈতিক দর্শন বিশেষ মূল্যবান। সর্ব্বদেশে সমভাবে প্রযোজ্য না হইলেও, নৈতিক-বিজ্ঞাননীতির সম্পূর্ণ অনুসরণে, কোনও কোনও দেশের লোক সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অপিচ, ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, এতদধ্যয়নে, অপর কোনও কোনও দেশের মানবগণ প্রাথমিকনীতিচর্চ্চা করিতে পারেন।

প্রকৃত তথ্য এই যে, কৌশলমূলক ঈশ্বরপ্রভুত্বস্বীকার নিবন্ধন, চরিত্রনীতি-বিজ্ঞান বা নৈতিক দর্শন মানবচরিত্রজগতে অভীপ্সিত ফলোৎপাদন করিতে পারে না। দার্শনিকগণ নৈতিকনিয়মরাজী ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া প্রচার করিলেও, সাধারণ মানব উহা মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া গণনা করে এবং এজন্য, উহার প্রতি তাদৃশ আস্থা স্থাপন করে না। স্বভাবজাত মুক্তা ও কৃত্রিম মুক্তার যে পার্থক্য, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা কিম্বা পূর্ণজ্ঞানী অবতারোপদেশ ও কলি-দার্শনিকগণগঠিত নৈতিক নিয়মের প্রভেদ তৎসদৃশ। কলিমানব পরাবিদ্যার আস্বাদ গ্রহণ না করিলেও, অবতারোপদেশের সুবাস ও মধুর রস সম্ভোগ করিয়াছে। সুতরাং দার্শনিকগণের নৈতিক নিয়মের কৃত্রিমতা কলিমানবগণ সহজে অনুভব করিতে পারে। জ্ঞানীগণ বা অবতারপ্রচারিত ঈশ্বরোপদেশ-পালনে, লোকের অন্তঃকরণে আনন্দঝঙ্কার ও শিরায় শিরায় পুলকস্রোতঃ প্রবাহিত হয়। সাংসারিক লাভ, ভীতি বা ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় মনুষ্য কৃত্রিম নৈতিক নিয়ম পালন করে। যেখানে, মানবগণ যুক্তিমার্গে নৈতিক নিয়ম পালন করেন, এরূপ বিবেচনা করেন, সেখানে, তাঁহাদের যুক্তিও ঐ কল্পনায় পরিচালিত হয়। এক দিকে মানবচরিত্রনিয়ামক শাস্ত্রের ঈদৃশী অবস্থা এবং অন্যদিকে মানবচরিত্রের গাঢ়বিস্মৃতিলিপ্ততা পর্য্যালোচনা করিলে, পূর্ব্বাধ্যায়ে কলিমানবচরিত্রবিশ্লেষণে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। ফলতঃ, নীতিপ্রবর্ত্তনচেষ্টার অনুপাতে, কলিমানবচরিত্রের বিশৃঙ্খলতা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যেমন রাশি রাশি নিয়ম প্রণীত ও প্রচারিত হইতেছে, তেমনি নিয়মলঙ্ঘনদোষ ও দুষ্কর্ম্মের স্রোতঃ প্রবল হইতেছে। শাসনোদ্দেশ্যে যত দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে, ততই পাপাচরণসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিল্প অপেক্ষা বিজ্ঞান যেরূপ উচ্চ, বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শন ততোধিক উচ্চ। বস্তুতঃ, কোনও শাস্ত্র, গুণে, দর্শনশাস্ত্রের সমকক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোত্তম বস্তু দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বরপ্রভুত্বস্বীকারে কলিদার্শনিকগণের শৈথিল্যজনিত দর্শনশাস্ত্রের শ্লথমূলতায়, অপরাবিদ্যাক্ষেত্রে, বিজ্ঞান এবং, এমন কি, শিল্প দর্শনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, এবং দর্শনাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী কার্য্যতৎপর ও উপকারী এবং দার্শনিক কল্পনাপ্রিয় ও অনুষ্ঠানশূন্য বিবেচিত হওয়ায়, বিজ্ঞানবিদ্ ও শিল্পী দার্শনিক অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হন। অথকিং, মানবচরিত্রনিয়ামক

দর্শনশাস্ত্রের দৌর্ব্বল্য, কলিযুগে যাবতীয় সাংসারিক বিভ্রাটের একমাত্র হেতু। জড় পদার্থে মানবগণের অত্যাসক্তি বশতঃ, পরলোক অপেক্ষা ইহলোক, সূক্ষ্ম-শরীর অপেক্ষা স্থূল শরীর এবং মানসিক বল অপেক্ষা বাহ্যশারীরিক বল অধিক মূল্যবান গণিত হয়। এমন কি, অধিকাংশ ব্যক্তির মনে পরলোকবিষয়ক চিন্তা আদৌ উদিত হয় না। কলিমানব স্থূল শরীরের পারিপাট্যবিধানে যেরূপ তৎপর, সূক্ষ্ম শরীরের উৎকর্ষসাধনে তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও মনোযোগী নহে। অপরাবিদ্যায় বুদ্ধিস্তর পর্য্যন্ত মানসিক উন্নতি সাধন করা যায়; কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই, মনের উন্নতিসাধনকল্পে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ, বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, যদ্দ্বারা স্থূলশরীরপারিপাট্য সমাহিত হইতে পারে। এরূপ বিদ্যাভ্যাসে, মন উন্নত হওয়া দূরে থাক্, প্রত্যুত অবনত ও জড়পদার্থে নিতরাং আসক্ত হয়। এজন্য, কলিযুগে মানসিক বল শারীরিক বলের আয়ত্তিগত। বিলাসিতাপ্রভাবে, মানব নিজের, সুতরাং, অপরের মানসিক বলের গৌরব অনুভব করিতে পারে না। বিলাসোপকরণ এবং যদ্দ্বারা তাহা সংগৃহীত হয়, তাদৃশ অর্থ বা সম্পদ্ মানবের ইষ্টপদার্থ। দৃশ্যতঃ, শারীরিক বলে এই সমস্ত পদার্থ লব্ধ হয় বলিয়া, সমাজে শারীরিক বলই অধিকতর শ্লাঘনীয় বিবেচিত হয়। অধুনাতন, সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী এবং নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীভুক্ত শিল্পী বা কৃষকগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এ বিষয়ের সত্য সহজে উপলব্ধ হয়। সহায়হীন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াও, বহুকষ্টে মাসিক ৩০ কি ৪০ টাকা বেতনের লেখক বা শিক্ষকের কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারেন। নিরক্ষর ভাস্কর, সূত্রধর বা অন্য কোনও শিল্পী কিম্বা কৃষক অনায়াসে ইঁহাদের চতুর্গুণ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। যাঁহারা এক্ষণে 'ভদ্রলোক' অভিহিত হন, তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যোদ্ধার জন্য, কৃষক ও শ্রমজীবী গণের তোষামোদ করিয়া চলেন। কৃষক ও শ্রমজীবীকুল তথাকথিত ভদ্রলোকগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সমাজের ঈদৃশী অবস্থা নৈসর্গিক নিয়মের বিপরীত। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

ঈশ্বর মানবের সাংসারিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক, মুখ্যতঃ এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, মানবগণ ধর্ম্মশ্রদ্ধাভরে, মানসিক বলের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে। সকল মানব সমক্ষমতাবিশিষ্ট নহে, মানসিক বল দ্বারাই প্রত্যেক মানবের ক্ষমতা পরিমিতা হয়, ক্ষমতার তারতম্যানুসারে মানবগণ সমাজে আদর ও সম্মান

পাইবার যোগ্য, ইত্যাদি বিষয় উক্তরূপ শিক্ষাদ্বারা সুস্পষ্টরূপে মানবের হৃদয়ঙ্গম হয়। এবম্বিধ শিক্ষাবলে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যোগ্যতানুসারে সমাজের অপর সকল ব্যক্তির প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায্যাচরণ করিতে পারে এবং অপরাপরের তুলনায়, সমাজে স্বকীয় স্থানও নির্ণয় করিতে পারে। মানবকৃত নৈতিক-নিয়মবলে, মনুষ্যগণ যেরূপে মঙ্গল, ন্যায়, অধিকার, কর্ত্তব্যতা, দায়িত্ব, সংযম, সাহস, জ্ঞান, পরোপকারিতা, প্রভৃতি বিষয়ের ধারণা করিতে পারে, ধর্ম্মভাব-বশে তদপেক্ষা অতি সহজে, অথচ, বিশুদ্ধভাবে ঐ সমস্ত বিষয় বোধগম্য করিতে ক্ষমবান হয়। কারণ, ধর্ম্মভাব যেরূপ মানবান্তঃকরণের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে, নিয়মবন্ধন সেরূপ করিতে পারে না। যদিও, ঈশ্বর রাজাগণকে মানবের বাহ্যচরিত্র নিয়ামনে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তথাপি মানবের আভ্যন্তরিক চরিত্রনিয়ামন সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন এবং তাঁহার আদেশ ব্যতীত মনুষ্যের আভ্যন্তরীণ চরিত্রনিয়ামন কল্পে মানব কর্ত্তৃক নৈতিক নিয়ম প্রণীত হওয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। ফলতঃ, নরের আভ্যন্তরিক চরিত্রসংশোধন জন্যই, ঈশ্বর সময়ানুসারে অবতাররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার-বাদে আস্থা স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা অন্ততঃ, এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন যে, শতশত বৎসর মানবকৃত নৈতিক নিয়মে লোকচরিত্রে যে ফলাধান করিতে না পরে, মধ্যে মধ্যে একজন মহাপুরুষ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অত্যল্প কাল মধ্যে মানবমনে সেই ফল উৎপাদন করিয়া যান। ইঁহারা অবতার বা মহাপুরুষ যে নামেই অভিহিত হউন, কার্য্যদ্বারা ইঁহাদের অসাধারণত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। মানবের আভ্যন্তরিক চরিত্র-নিয়ামন যে মুখ্যতঃ ঈশ্বরাধীন, ইঁহারাও লোকে সেই শিক্ষা বিধান করেন। পরাবিদ্যায়, দার্শনিকগণ মানবগণকে একই শিক্ষা প্রদান করিতেন।

অপরাবিদ্যাগত দর্শন-শাস্ত্র-প্রভাবে, অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধীয় ভ্রান্তধারণা মানবান্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়াছে। অদৃষ্টবাদ জড়তার প্রশ্রয় প্রদান করে, এই অন্ধ বিশ্বাসে, সাধারণ মানবগণ উহার মর্ম্মানুসন্ধান করিবার প্রয়াস করেন না। কলিযুগে মানবোচ্ছৃঙ্খলচারিতার ইহাও অন্যতম লক্ষণ। অদৃষ্ট দ্বারা পুরুষকার নিয়ামিত হয়, এই পবিত্র বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন ও সহজ ভাবে ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, সংসারচারী মানবগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সুনিয়মে কার্য্য পরিচালন করিয়া মঙ্গললাভ করিতে পারেন। সংসারে ঈশ্বরাভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করাই মানবের কর্ত্তব্য। অথবা মানবক্রিয়াকারিতা বিধাত্রিচ্ছাধীনা। কিন্তু,

বিস্মৃতিবশে, ঈশ্বরাভিপ্রায় সাধারণের অদৃষ্ট বা অবিদিত। জ্ঞানীগণ জ্ঞান-যোগে ভগবদভিপ্রায় দর্শন করিয়া ও সম্যক্ বিদিত হইয়া, সাধারণের হিতার্থ উহা প্রকট করেন। সুতরাং জ্ঞানীগণপ্রদর্শিত উপায় বা নিয়মে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, ঈশ্বরাভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করা হয় এবং তাহাতে অদৃষ্ট কর্ত্তৃক মানবচেষ্টিত নিয়ামিত হয়। অপিচ, ইহাদ্বারা দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি, অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যাহা হউক, সময়াভাব প্রযুক্ত, এ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ এক্ষণে বাঞ্ছনীয় নহে। ভবিষ্যতে, এই সমস্ত ও আনুষঙ্গিক অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল এবং তদুদ্দেশ্যে, উপক্রমণিকা স্বরূপ, বর্ত্তমান পুস্তক বিরচিত হইল। অতএব, এস্থলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপসংহার করা গেল।

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত সমন্বয় গ্রন্থে
অন্ধচেষ্টিত নামা পঞ্চম অধ্যায়।
আদ্যভাগ সমাপ্ত।